Barcode - 99999990341257
Title - Amar Katha O Anyanya Rachana
Subject - Literature
Author - Binodini Dasi
Language - bengali
Pages - 226
Publication Year - 1969
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13

আমার কথা

ও অন্যান্য রচনা

—

বিনোদিনী দাসী

সম্পাদক

নির্মাল্য আচার্য

—

১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

সুবর্ণরেখা। কলিকাতা ৯

Amar Katha O Anyanya Rachana

by

Binodini Dasi

প্রকাশক : শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার

সুবর্ণরেখা । ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড । কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীগোপাল কুণ্ডু । জার্নাল প্রেস

৫১।১ রাণী হর্ষমুখী রোড । কলিকাতা ২

সূচিপত্র

—

সম্পাদকের নিবেদন

—

আমার কথা । বিনোদিনী দাসী ।

—

অন্যান্য রচনা

আমার অভিনেত্রী জীবন । বিনোদিনী দাসী । ৭৯

বাসনা । বিনোদিনী দাসী । ১১০

কনক ও নলিনী । বিনোদিনী দাসী । ১৩২

—

গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত

কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় । ১৩৭

বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী । ১৪০

—

বিনোদিনীর অভিনয় । বিনোদিনীর রচনাবলি

স্থান-কাল-পাত্র

বিষয়সূচি

আমার কথা
ও অন্যান্য রচনা।

করতে পারি না। আমাদের পরম সৌভাগ্য, বিনোদিনী নিজ জীবনের এই চমকপ্রদ কাহিনী তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা'য় অন্তত কিছুটা লিখে যেতে পেরেছেন।

শুধু নিজের জীবনের কথাই নয়, বিনোদিনী কবিতা লিখেছেন অনেক এবং সাময়িক পত্রিকায় নাটক ও রঙ্গালয় সম্পর্কে পত্রাকারে একদা তিনি ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাতও করেছিলেন। নিজ জীবনকথাকেও নানা সময়ে তিনি নানাভাবে লিখতে চেষ্টা করেছেন—তাতে কখনো তথ্যের সমাবেশে, কখনো অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির রূপায়ণে মনোযোগী হয়েছেন। একটি কাব্যোপন্যাসের রচয়িত্রী রূপেও আমরা তাঁকে পাচ্ছি। বঙ্গ নাট্যমঞ্চে তিনি অভিনয় করেছিলেন মাত্র ১২ বছর, তাঁর যেসব রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তাতে দেখি, লেখিকা হিসাবে তাঁর চর্চার ব্যাপ্তি ৪০ বছর।

বিনোদিনীর জীবনকথার মধ্যে বাংলাদেশের পেশাদার রঙ্গালয়ের যে ইতিহাসটুকু আছে তা অত্যন্ত মূল্যবান। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবন। 'আমার কথা'য় এই সময়ের কথাই আছে। অর্থাৎ পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আদিযুগের বিবরণ তথা এই কালের নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস বিনোদিনীর এই রচনার সাক্ষ্য ব্যতীত অসম্পূর্ণ। গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেছিলেন। এই ষ্টার থিয়েটার (তখন ৬২ বিডন স্ট্রীটে, এর উপর এখন সেণ্ট্রাল এভিনিউ তৈরি হয়েছে) তো তাঁর নিজের হাতে তৈরি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ সেকালের প্রধান নাট্যকারদের বিভিন্ন নাটকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বহু বিচিত্র ধরনের চরিত্রে, অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী চরিত্রে একই সঙ্গে, তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং চরিত্রের গভীরে প্রবেশ ক'রে তাকে নতুন আলোকে তুলে ধরতে পেরেছেন।

এইসব নানা কারণে সে সময়ে নাটক ও নাট্যশালার বহু তথ্য ও ইতিহাসের উপকরণ তাঁর আত্মজীবনী থেকে পাওয়া সম্ভব। সেকালের অভিনয়ের ধারা কেমন ছিল, দর্শকেরা কি ধরনের নাটক পছন্দ করতেন, গিরিশচন্দ্র কত বড় নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতা ছিলেন, অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখ সেকালের অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেমন অভিনয় করতেন, বিভিন্ন রঙ্গালয়ের উত্থান-পতনের কাহিনী, অভিনয়ের নানা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি, এক কথায় সেকালের

নাট্যসংসারের সামগ্রিক রূপ, এই রচনার সহায়তায় অনেকখানি জানা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে সেকালের অনেক নাট্যরথীর পরিচয় প্রায় প্রত্যক্ষবৎ সত্য ক'রে তুলেছেন বিনোদিনী। তাই ক্ষুদ্র হলেও এই বইখানি সেকালের নাট্যসমাজের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল।

২

আশ্চর্যের কথা, বাংলা নাটক বা সাহিত্যের ইতিহাসে সচরাচব বিনোদিনীর নামোল্লেখ হতে দেখা যায় না। তাঁর থিয়েটার থেকে অবসরগ্রহণের (১৮৮৬) পর আজ পর্যন্ত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস কম রচিত হয় নি। বলা চলে, ইতিহাস রচনা যা কিছু, তা এই সময়ের মধ্যেই হয়েছে। কিন্তু বিনোদিনী সেখানে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে রইলেন। এ বিপত্তির একটা কারণ অনুমান করা সহজ— নাটকের সাহিত্যিক ইতিহাস ও আভিনয়িক ইতিহাসের মিলন না হলে যে নাটকের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয় না, এ জ্ঞানের অভাব।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য তাঁদের নাট্যশালা-বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে বিনোদিনীর কথা অনেকখানি গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া, আর যাঁরা বিনোদিনীর জীবনকথা নিয়ে নানা কাহিনী রচনা করেছেন তাঁরা আমাদের চিরপরিচিত রম্যসাহিত্য ব্যবসায়ী। কিন্তু আমাদের 'অ্যাকাডেমিক' নাট্য-ইতিহাসে তাঁর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না এবং আরো পরিতাপের কথা, সাহিত্যের ইতিহাসে বিনোদিনীর 'আমার কথা' আত্মজীবনী হিসেবে ও তাঁর কবিতাগুলি বাংলাসাহিত্যের মহিলা-কবিদের কবিতার সঙ্গে উল্লিখিত হয় না। মূল্যবিচারের প্রশ্ন পরে, উল্লেখ পযন্ত হয় না, এতে আমাদের ইতিহাসের বিশেষ ক্ষতি। হয়তো ঐতিহাসিকেরা এই মহিলার জীবন, অভিনয়কলার বিবরণ ও বিভিন্ন রচনা থেকে বিস্তর তথ্য ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারতেন। এমন কি, বিনোদিনীর 'আমার কথা'কে বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী রূপে এবং তাঁর কবিতাকে বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবিদের কাব্যের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে স্থান দিতে পারতেন। তাতে বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পেত, ইতিহাস আরো কিছু পূর্ণাঙ্গ হতো। বিনোদিনী বারবার নিজেকে হীন 'বারাঙ্গনা' বলে উল্লেখ করেছেন বলেই কি তাঁকে এভাবে 'ভদ্রলোকের সাহিত্য' থেকে বর্জন করা হয়েছে? ইসাডোরা ডানকানের 'আমার জীবন' পাঠে আমাদের মুগ্ধতার সীমা থাকে না— অথচ আমাদের ভাষায় বিনোদিনীর এমন অত্যাশ্চর্য একটি আত্মকথা

সম্পাদকের নিবেদন

আমাদের সম্পাদনায় বাংলা ১৩৭১ সালে বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা'-র একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। ঐ সংস্করণে মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়াও কিছু অন্যান্য ভুলভ্রান্তি ক্রমশ আমাদের নজরে আসে যেগুলি সংশোধিত না হলে পরবর্তী সময়ে তার অনিবার্য জের চলতেই থাকবে বলে আশঙ্কা হতে থাকে। বাংলাদেশে নাটক ও রঙ্গালয় সম্পর্কে উৎসাহ বেশ স্থায়িত্ব পেয়েছে বলেই মনে হয়। এইসব নানা কারণে 'আমার কথা'র আর একটি সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিল। গিরিশচন্দ্র ঠিকই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "যদি বঙ্গ রঙ্গালয় স্থায়ী হয়, বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী আগ্রহের সহিত অন্বেষিত ও পঠিত হইবে।"

১

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বের প্রতিভাশালিনী ও সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বিনোদিনীর নাম আজ আমাদের অনেকেরই মনে পড়ে না। অবশ্য তিনি তাঁর জীবনকালের মধ্যেই জনমানসের কাছে বিস্মৃত হয়ে এসেছিলেন। রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের পরেও দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন তিনি। অভিনেতা-অভিনেত্রীর স্মৃতি চিরদিনই তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনের পরে ম্লান হয়ে আসে। তাই সেকালের এই অভিনেত্রীর কথা বিস্মরণে হয়তো বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই।

এদেশে পাব্‌লিক থিয়েটার গঠনে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিনোদিনী অন্যতমা। তাঁর অতুলনীয় অভিনয়প্রতিভা, ব্যক্তিগত ত্যাগ-স্বীকার এবং অভিনেত্রী জীবনের নিষ্ঠা ও সাধনা সেকালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য আন্দোলনের শক্তিশালী প্রেরণা হয়েছিল।

সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বিনোদিনীর অভিনয়ের কিছু সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। সে-অভিনয় দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় সেকালীন দর্শক-সমালোচকের মতামতের উপর নির্ভর করা ছাড়া এখন কোনো উপায় নেই। অভিনয় ছাড়া আর একটি কারণেও বিনোদিনীকে স্মরণ করা যায়। তিনি সুলেখিকা। তাঁর

রচনা পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি তাঁর অন্তঃকরণে কতখানি সৃজনীশক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর আত্মকথায় যেমন তাঁর অভিনয়প্রতিভার অনেক পরিচয় আছে, তেমনি রচনাশক্তির পরিচয়ও আছে। আমরা যাঁরা একালের নাট্যানুরাগী তাঁরা এ-কারণেই তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে পারি।

বিনোদিনী যদি লেখনী ধারণ না করতেন তাহলে বাংলা রঙ্গালয়ের বহু শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো তাঁর নামটিও আজ নিছক কিংবদন্তিতে পর্যবসিত হয়ে তথ্যসন্ধানী গবেষণার বিষয়রূপে থেকে যেত। অভিনয়কে যাঁরা নিজ প্রতিভাস্ফুরণের একতম অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এ ট্রাজেডি অনিবার্য। এ ক্ষেত্রে খুব বড় প্রতিভাও সাময়িকতার সীমা পার হয়ে দূর কালের মানুষের চিত্ত স্পর্শ করতে পারেন না। অভিনয়কারী যে কত বড় নট সে কথা বিচার বা তুলনা পরবর্তীকালে নিতান্তই অসম্ভব। একমাত্র যদি অভিনেতা নিজ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে কোনো অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আধারে, যেমন রচনায়, সঞ্চিত রাখতে পারেন অথবা প্রত্যক্ষদর্শী কোনো প্রতিভাবান সমালোচক কিছু বিবরণ রেখে যান তবেই তাঁর প্রতিভার প্রকৃতি নিরূপণের একটা প্রয়াস পাওয়া যায়। দুঃখের কথা, এই উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। অথচ আমাদের রঙ্গালয় ও তার অভিনয়-ইতিহাস নিয়ে আমাদের রীতিমতো গর্বিত হওয়ার কারণ রয়েছে।

বিনোদিনী যে লেখনীচর্চা করেছিলেন, সেজন্য তিনি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্রী। এই অসামান্যা অভিনেত্রী সেকালে বঙ্গীয় নাট্যদর্শকদের আপন অভিনয়ে যেভাবে দিনের পর দিন মুগ্ধ করেছিলেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁর অভিনয় দর্শনে স্বদেশের ও বিদেশের বহু মনীষী ও বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, তাতে বেশ বুঝতে পারা যায়, তিনি সামান্য প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন না। তাঁর কিছু কিছু অভিনয় তো বাংলাদেশের রসিক ও ভাবুক সমাজে একটা আলোড়নই এনেছিল। যিনি এতবড় অভিনয়শক্তির অধিকারিণী সেই অভিনেত্রীর জীবন ও মনোজগৎটি জানার কৌতূহল আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কোথায় কোন্ পরিবেশে তাঁর জন্ম, কেন ও কেমনভাবে তিনি রঙ্গালয়ের দিকে আকৃষ্ট হলেন, তাঁর মধ্যে কতখানি প্রস্তুতি ও সাধনা ছিল, কার কাছে ও কেমনভাবে তিনি শিক্ষালাভ করলেন, বিভিন্ন দুরূহ চরিত্রগুলি কেমন করেই বা তিনি মঞ্চে পরিস্ফুট করতেন, তাঁর ভাবজীবনটি কীভাবে এতখানি উন্নত হতে পারল ইত্যাদি বিষয়ে জানবার যে-কোনো সুযোগকে আমরা উপেক্ষা

একদা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন : "তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকট আমি সম্পূর্ণ ঋণী, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকাব করিতে বাধ্য। আমার 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব', 'বিল্বমঙ্গল', 'নল দময়ন্তী' প্রভৃতি নাটক যে সর্ব্বসাধারণের নিকট আশাতীত আদর লাভ করিয়াছিল, তাহার আংশিক কারণ, আমার প্রত্যেক নাটকে শ্রীমতী বিনোদিনীর প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ও সেই সেই চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন।"

৪

বিনোদিনীব জন্ম আনুমানিক ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় (দ্র. 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী', উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ১৩২৬)। মাত্র ১১/১২ বছর বয়সে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম রঙ্গালয়ে (গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার) প্রবেশ করেন 'শত্রু-সংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারে সেকালীন যাবতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রধান নারীচরিত্রে অভিনয় ক'রে চূড়ান্ত যশ লাভ করেন। মাত্র ২৩/২৪ বছর বযসে তিনি তাঁর খ্যাতি ও ক্ষমতাব চবম সিদ্ধিব লগ্নে রঙ্গালয়েব সংস্রব চিবতরে ত্যাগ করেন।

বিনোদিনী মাত্র ১২ বছর অভিনয় করেছেন—প্রায় ৫০টি নাটকে ৬০টির অধিক ভূমিকায়। কত বিচিত্র ধরনের চবিত্র তিনি অভিনয়ে মূর্ত ক'রে তুলেছেন তাব কিছুটা আমরা তাঁর আত্মকথায় জানতে পারি। একদিকে সীতা, প্রমীলা, দ্রৌপদী, রাধিকা, কৈকেয়ী, উত্তরা, দময়ন্তী, গোপা, সত্যভামা, চিন্তামণি প্রভৃতি এবং অন্যদিকে কাঞ্চন, কামিনী, আয়েসা, তিলোত্তমা, আসমানি, মনোরমা, কপালকুণ্ডলা, মতি বিবি, কুন্দনন্দিনী, বিলাসিনী কারফরমা, রঙ্গিনী প্রভৃতি। একই নাটকে অনেকগুলি ভূমিকাভিনয়ের বিস্ময়কর আদর্শও তিনি সৃষ্টি করেছেন, যেমন 'মেঘনাদ বধ'-এর নাট্যরূপে তিনি একই সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, বারুণী, রতি, মায়া, মহামায়া, ও সীতা—এই সাতটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অনেক সময় একই রাত্রে বা কাছাকাছি ব্যবধানে সম্পূর্ণ বিপরীত বা পরস্পরবিরোধী চরিত্রে অসামান্য সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন, যেমন 'বিষবৃক্ষ'তে কুন্দ ও 'সধবার একাদশী'তে কাঞ্চন, 'চৈতন্যলীলা'য় চৈতন্য ও 'বিবাহবিভ্রাট'-এ বিলাসিনী কারফরমা এবং 'বিল্বমঙ্গল'-এ চিন্তামণি ও 'বেল্লিক বাজার'-এ রঙ্গিনী। সাধারণ দর্শকের তো কথাই নেই, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ফাদার লাফোঁ,

এডুইন আর্নল্ড, কর্নেল অলকট প্রমুখ স্বদেশের ও বিদেশের মনীষীবৃন্দ তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সমসাময়িক কাগজপত্রের সমগ্র বিবরণ এখনো উদ্ধারের অপেক্ষায় আছে। অনেক পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায় না, বহু তথ্য আমাদের চিরন্তন আত্মবিস্মরণপ্রবণতায় লুপ্ত হয়েছে।

৫

খ্যাতি ও উন্নতির শিখরে উঠে, সম্মুখের সমস্ত মহৎ সম্ভাবনার প্রলোভন ত্যাগ ক'রে বিনোদিনী অভিনেত্রী জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন কেন, তা বেশ রহস্যজনক। এই বিদায়ের কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোবাদ অথবা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনো অভিপ্রায়, তা সঠিক জানার উপায় নেই। বিনোদিনী অবশ্য নিজে এই অবসর গ্রহণের কথা যেভাবে উল্লেখ করেছেন (দ্র. বর্তমান সংস্করণ, পৃ ৪১-৪৪, ৪৯) তাতে থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর নানাপ্রকার মনোভঙ্গ, ষ্টার থিয়েটার গঠনে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতারণা ও ক্ষমতাগত বিসংবাদই প্রধান বলে মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ষ্টার থিয়েটারের নাম বিনোদিনীর নিজের নাম অনুসারে 'বি' থিয়েটার না হওয়ায় বা উক্ত থিয়েটারে তাঁর স্বত্ব গ্রাহ্য না হওয়ায় বিনোদিনী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যে-কোনো মনোযোগী পাঠকই লক্ষ করবেন, ষ্টার থিয়েটারের গঠনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে দিয়ে কার্যসিদ্ধি ক'রে কিছুটা প্রতারণা অবশ্যই করেছিলেন। শুধু নামের প্রতি মোহ ছিল বলে তাঁকে দোষ দিলে অবিচার হবে—প্রত্যাশা সৃষ্টি ক'রে উক্ত ব্যক্তিবর্গ তা পূরণ করেন নি এবং তাঁকে সবকিছু থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টাই করেছিলেন। থিয়েটারের প্রতি বিনোদিনীর যে দায়িত্ববোধ ও আদর্শবাদ জন্মেছিল সেটা তখন যথেষ্টই উপেক্ষিত হয়েছিল সন্দেহ নেই এবং এতদিন সর্বপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির পথ ত্যাগ ক'রে বঙ্গভূমির সেবায় নিজেকে তিনি যেভাবে সমর্পণ ও দুঃখবরণ করেছিলেন তার মর্যাদা না পেয়ে বিনোদিনী অভিমানভরে রঙ্গালয় ত্যাগ করেন। তাঁর মতো শিল্পীর এ অভিমানকে সকলে মূল্য দিতে পারে নি।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (২য় খণ্ড, ১৯৪৭) গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু নতুন কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে চিন্তামণির ভূমিকায় অভিনয়ের পরে "...বিনোদিনীর কোন কোন বিষয়ে অভিমানে গিরিশ-চন্দ্রকেও উত্ত্যক্ত হইতে হইল। তারপরে চিন্তার ভূমিকায় তাহার অভিনয় খুব ভাবসম্মত এবং প্রকৃষ্ট হইলেও, সঙ্গীত এবং অভিনয়ে গঙ্গারই প্রশংসা হইল বেশী।

থাকা সত্ত্বেও সে-সম্পর্কে আমাদের বিস্মৃতি ও উদাসীনতা বিস্ময়জনক। সুখের কথা, সম্প্রতি এই অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

৩

ইতিহাসগত তথ্যের জন্যই নয়, নিছক একটি জীবনের কাহিনী হিসাবেও এই রচনা আমাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। কেমন ক'রে এক সহায়সম্বলহীনা বালিকা সমাজের অন্ধকার স্তর থেকে আপন চেষ্টায় ও যত্নে সেকালের অগণ্য লোকের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী হতে পেরেছিলেন, কত বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের নিষ্ঠুর সত্যগুলির জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তন্ময় সাধনায় দুরূহ সিদ্ধি কেমন করেই বা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল, এবং সর্বোপরি, কেমন ক'রে তিনি সেকালের নাট্যজগতের মহারথীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়ী পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় নিজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করেছিলেন ও একদিন খ্যাতির চরম শিখরে উঠেও নীরবে রঙ্গশালার পাদপ্রদীপের আড়ালে বিদায় নিয়েছিলেন,—এসব কথা চিন্তা ও অনুভব করলে বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। বিনোদিনীর এই আত্মকথা পড়লে মনে হয় কোনো এক মহৎ উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করছি। যে সরলতা ও আন্তরিকতা, গভীর দুঃখবরণের মধ্য থেকে যে সত্য জীবনবোধ ও গাঢ় ভাবুকতা এই ক্ষুদ্র রচনাটির মধ্য থেকে ফুটে উঠতে দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে বিনোদিনীর প্রতিভারই সার্থক প্রতিফলন। বর্তমান সংস্করণের মূল 'আমার কথা' এবং পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এর পাতায় পাতায় বিনোদিনীর সংবেদনশীল মন, স্বচ্ছ বর্ণন-ক্ষমতা, ও সুন্দর পর্যবেক্ষণশক্তির নিদর্শন ছড়ানো আছে। আর আছে জীবন সম্পর্কে একটা বড় বেদনাবোধ—যা এর মধ্যে এনে দিয়েছে এক অনিবার্য গভীরতা। তাই এর আত্মবিলাপ ও পরিতাপের সুরটি স্থায়ী হতে পারে না।

এই রচনাটি থেকে পাঠক কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক তথ্য বা তৎকালীন রঙ্গজগতের নেপথ্যলোকের কী বিবরণ লাভ করবেন সে আলোচনার এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, পাঠকের দায়িত্ববোধ ও অভিপ্রায়ের উপরই তা নির্ভর করছে। একটা কথা এখানে বলা দরকার যে এটি ইতিহাস নয়, আত্মস্মৃতি-মূলক রচনা। তাই এ-জাতীয় রচনার স্বভাব অনুযায়ী ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতি হয়তো অলভ্য নয়। অতএব খুঁটিনাটি তথ্য বিনা পরীক্ষায় সর্বদা গ্রাহ্য নয়। কিন্তু

সেকালের থিয়েটারের একটি সমগ্র পরিমণ্ডল এতে এমনভাবে বয়ে গেছে যা শত শত 'বিশুদ্ধ' তথ্যের জঙ্গল ঘেঁটেও লাভ করা দুঃসাধ্য।

'আমার কথা' যেকালে প্রকাশিত হয়েছিল সেকালে বিনোদিনীর কথা নাট্য-প্রেমিকদের একেবারে বিস্মরণ হয় নি—যদিও তিনি অভিনয়জীবন থেকে দীর্ঘ দিন বিদায় নিয়েছিলেন, তবু তাঁর কাহিনী লোকের মনে এক অতি কৌতূহল-জনক সামগ্রীরূপে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। হতে পারে, 'চৈতন্যলীলা' নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদ লাভ বিনোদিনী সম্পর্কে অনেকের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। অভিনয় থেকে অবসর গ্রহণ করলেও বিনোদিনীর অভিনয়ক্ষমতা একটা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

বিনোদিনীর 'আমার কথা' বইটির পর পর দু-বছরে দুটি সংস্করণের (১৩১৯, ১৩২০) সন্ধান পাওয়া যায়। এই বইয়ের এক যুগ পরে (অর্থাৎ ১৩৩১-৩২ সাল) বিনোদিনী পুনরায় নিজ স্মৃতিকথা রচনা আরম্ভ করেছিলেন এমন একটি পত্রিকায় যা সেকালের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক। সে পত্রিকার নাম 'রূপ ও রঙ্গ' (সম্পাদক : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র)। এতে বিনোদিনীর অনেক-গুলি অভিনয়-চিত্রও ছাপা হয়েছিল (তার কয়েকটি বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে)। এ থেকে পাঠকসমাজের দাবীপূরণের ও বিনোদিনীর জনপ্রিয়তার নিদর্শন নতুন ক'রে পাই। তবে এই জনপ্রিয়তাকে অনেক নাট্যবিশারদ সুনজরে দেখতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। এ সংশয়ের কারণ যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

যাই হোক, 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় বিনোদিনীর অসম্পূর্ণ স্মৃতিকথাটিই তাঁর শেষ রচনা। এর পরও তিনি পনের বছর জীবিত ছিলেন। শেষ জীবনটি তাঁর খুবই অনাদর ও উপেক্ষার মধ্যে কেটেছে। ১৩৪৭ সালে (১৯৪১ ফেব্রুয়ারি) বিনোদিনী লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। তারও পর অনেক দিন পার হতে চললো। ইতিমধ্যে নানাকথায় নানা আন্দোলনে বিনোদিনীর কথা একেবারেই ভুল হয়ে গেছে। যে-অভিনেত্রীর অভিনয়গুণে গিরিশচন্দ্রের বহুব্যাপ্ত নাট্যখ্যাতি কিয়দংশে নির্ভর করেছে এবং বাংলা রঙ্গালয়ের আদিপর্বের বহু নাট্যকার ও নাটকের কথা ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, যাঁর রচিত গদ্য ও পদ্য বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, সেই মহীয়সী নারীর কাছে বাংলা রঙ্গালয় ও বাঙালির অনেক ঋণ।

ব্যক্তির কাছে এ-বিষয়ে আরো কিছু বেশি প্রত্যাশা আমাদের ছিল। কারণ তিনি ছিলেন রঙ্গালয় ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরম সুহৃদ। গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল বসু, সুকুমারী দত্ত, তারাসুন্দরী, ধর্মদাস সুর, তিনকড়ি, সুশীলাবালা, দানীবাবু, নরীসুন্দরী, কুসুমকুমারী, বনবিহারিণী, রানীসুন্দরী, হরিসুন্দরী প্রমুখ সকলের কথাই আছে, অথচ বিনোদিনীর গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান হয় নি।

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী'-তে বিনোদিনীর কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু সেখানে লেখক বিনোদিনীর 'আমার কথা'র সারাংশ ও উদ্ধৃতির বাইরে নতুন কোনো মূল্যায়নের প্রয়াস দেখাতে পারেন নি। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে বিনোদিনী শুধু ভূমিকা-লিপিতে উল্লিখিত – পৃথক একটি কথাও নেই। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও তাঁর গ্রন্থ-গুলিতে গিরিশ-প্রতিভার বিশ্লেষণেই সবটা শক্তি নিয়োগ করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিনোদিনীর রচনার সাক্ষ্য মাঝে মাঝে গ্রহণ করেছেন। বিশ্বকোষ-এর "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" অধ্যায়ে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বিনোদিনীর কথা অনুপস্থিত।

একমাত্র গিরিশচন্দ্র 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় 'কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়' নামে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা এবং বিনোদিনীর অনুরোধে তাঁর 'আমার কথা' বইয়ের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন। বর্তমান সংস্করণের প্রারম্ভে মুদ্রিত 'অধীনার নিবেদন' থেকে জানা যায়, সে-ভূমিকা বিনোদিনীর মনঃপূত হয় নি এবং তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণে সেটিকে তিনি গ্রহণও করেন নি। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয় এবং আপন শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার চিহ্ন-স্বরূপ 'নব' সংস্করণে সেটি বিনোদিনী ছেপেছিলেন [সম্ভবত 'আমার কথা'-র দু-বার মুদ্রণ হয় নি – নিজের ভূমিকা অংশে কিছু পরিবর্তন ক'রে ও গিরিশচন্দ্রের ভূমিকাটি সংযোজন ক'রে মূল মুদ্রণটিই 'নব' রূপে প্রচার করা হয়]।

নাটক ও রঙ্গালয় বিষয়ক সেকালের এতগুলি পত্রিকায় আমরা বিনোদিনী সম্পর্কে নীরবতাই লক্ষ করেছি। এমন কি তাঁর মৃত্যুসংবাদও নজরে পড়ে না। তাই মৃত্যুর সঠিক তারিখ অনুসন্ধানে আমাদের বহু বেগ পেতে হয়েছে এবং এ ব্যাপারে একেবারে সুনিশ্চিত হতে পেরেছি বললে ভুল করা হবে। গিরিশচন্দ্র বা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয়ের ইতিহাসগত আলোচনার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটেছে। গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গে 'চৈতন্যলীলা' নিয়ে বিরাট উদ্দীপনার ইতিহাস আছে, অথচ যিনি চৈতন্যের ভূমিকায় সেই নাটকের মূল ভাবকে প্রতিষ্ঠা দিলেন সেই বিনোদিনীর উল্লেখও হয় না।

এই সমস্ত কারণে ও 'আমার কথা' পাঠের পর নানা অনুমানের অবকাশ মিলিয়ে মনে হয় বিনোদিনীর সঠিক মূল্যায়ন সেকালে হয়ে ওঠে নি এবং তাঁকে অস্বীকার করার একটা মনোভাব যে-কারণেই হোক তখনকার নাট্যরথীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

বাংলার সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় যাঁদের উদ্যম প্রভূত পরিমাণে দায়ী তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিনোদিনী দাসীর নামও স্মরণীয়। তাঁর অভিনেত্রী জীবনের প্রথম দু-বছর বাদ দিলেও অবশিষ্ট দশ বছরে বেঙ্গল ও ন্যাশনাল থিয়েটারের খ্যাতি ও সম্পদে তাঁর দানের পরিমাণ সামান্য নয়। 'ষ্টার' থিয়েটার প্রতিষ্ঠাও তাঁর সহায়তা ছাড়া নিতান্ত অসম্ভব ছিল। 'আমার কথা'য় ঐ পর্বের ইতিহাস বর্ণিত আছে (দ্র. বর্তমানে সংস্করণ, 'ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা কথা', পৃ ৩৫-৪৯) – তা যেমন আত্মত্যাগে উজ্জ্বল, তেমনি বঞ্চনায় মর্মস্পর্শী।

৭

সেকালের উপেক্ষা একালে বিস্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। এখনকার পত্র-পত্রিকায় বিনোদিনী সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ কোথায়? বইপত্রেও তাঁর স্থান সচরাচর হয় না ইতিহাসের খাতিরেও। অধিকন্তু একালীন রম্যসাহিত্যে ও জীবনীমূলক নাটকে বা চলচ্চিত্রে গুরুতর তথ্যবিকৃতির নজীর আছে।

সব থেকে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে লেখিকা হিসেবে আজও বিনোদিনীর স্থান বাংলা সাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নি। আমাদের অনুমান, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত বিনোদিনীর আত্মকথা তাঁর নিজের রচনা কিনা এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। সে-সন্দেহ নিরসনের সুযোগ সহজেই পাওয়া যেতে পারতো। 'ভারতবাসী' পত্রিকার সন্ধান অবশ্য আমরা পাই নি, যাতে বিনোদিনীর রঙ্গালয় বিষয়ক পত্রাবলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বলে গিরিশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন (দ্র. পৃ ১৩৮)। তখনো (১৮৮৫) তিনি অভিনেত্রীরূপে 'ষ্টার' থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। অতঃপর 'সৌরভ' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল (১৩০২ সাল)। শুধু বিনোদিনীর নয়, তারাসুন্দরীর কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকরূপে গিরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন: "...অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে, আমার পুত্রকন্যার মত সন্দেহ নাই!

বিনোদিনীর ক্ষোভ এবং অভিমান বাড়িল। সে মনে করিল গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই তাহার ভূমিকার রূপ এইভাবে দিয়াছেন। অভিমানে বিনোদিনী থিয়েটার ছাড়িয়া দিল। এসময়ে তাহার অভিভাবক জনৈক 'রাজা' উপাধিধারী ধনশালী ব্যক্তিরও ইচ্ছা ছিল না যে বিনোদিনী থিয়েটারে অভিনয় করে।...গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বেই বিনোদিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভিতরে ভিতরে কিরণবালা নাম্নী অভিনেত্রীকে তাহার পার্টগুলি তৈয়ার করাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং বিনোদিনীর অভাব রঙ্গমঞ্চের পক্ষে অপূর্ণ থাকিলেও, ষ্টার থিয়েটার চালাইবার পক্ষে কর্তৃপক্ষের আর অসুবিধা হইল না" (পৃ ১২৭-২৮)।

দেখা যাচ্ছে, গিরিশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারের জন্য বিনোদিনীকে আর অপরিহার্য মনে করছেন না। তা না হলে তিনি বিনোদিনীর উপর নিজের জোর খাটাতে পারতেন, যেমন ইতিপূর্বেও পেরেছেন, এবং তার অভিমান সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করতেন। বিশেষত সে "অভিমান" শুধু "গঙ্গার প্রশংসা"র জন্য, বা "তাহার ভূমিকার রূপ"-এর জন্য – এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর কোনো "ধনশালী ব্যক্তির ইচ্ছা" যে বিনোদিনীর সংকল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তার প্রমাণ এ গ্রন্থে একাধিকবার পাওয়া গেছে। এখানে এ-কথাও স্মরণীয় যে বিনোদিনীর শেষ অভিনয় 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে চিন্তামণির ভূমিকায় নয় – তাঁর শেষ অভিনয় 'বেল্লিক বাজার' নাটকে রঙ্গিনীর ভূমিকায় (২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৬)।

আর একটা কথা। 'আমার কথা' রচনায় থিয়েটার থেকে বিদায় গ্রহণ প্রসঙ্গে বিনোদিনীর নিজের মনোভাব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা হেমেন্দ্রনাথ একবারও উল্লেখ করেন নি। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও এর সমালোচনায় (দ্র. বর্তমান সংস্করণ, পরিশিষ্ট : ৬) অনেক ভুলভ্রান্তির কথা তুললেও এই ব্যাপারে নীরবই থেকেছেন। রঙ্গালয় ও নাটক পরিচালনা কঠিন কাজ। গিরিশচন্দ্র আজীবন রঙ্গালয়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং রঙ্গালয়ের স্বার্থে (ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে নয়) তাঁর সকল উদ্যম নিযুক্ত ছিল। কার কোমল হৃদয় তাঁর আদর্শের চাপে নিষ্পেষিত হল স্বাভাবিকভাবেই সেদিকে তিনি মন দিতে পারেন নি। হয়তো বিনোদিনীর বিদায়ে তখন রঙ্গালয়ের মঙ্গলই হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। গিরিশ-ভক্ত হেমেন্দ্রনাথ এই সহজ সত্যটির উল্লেখ করতে পারেন নি, পাছে এ ব্যাপারে লোকে গিরিশচন্দ্রকে ভুল বোঝে ! তাই সবটা দায়িত্ব বিনোদিনীর উপরই তিনি ন্যস্ত করেছেন – বোধহয় কিছুটা অবিচারই করেছেন।

'আমার কথা'য় নিজের অভিনেত্রী জীবন বর্ণনার শেষাংশে বিনোদিনীর মধ্যে

যে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ ও অনুতাপের বিস্তার দেখি তাতে তাঁর মনো-জগতের এক বিরাট পরিবর্তনের আভাসও পাওয়া যায়। 'চৈতন্যলীলা'-র দ্বিতীয় খণ্ডের অভিনয়-প্রস্তুতি থেকেই তাঁর মানসিক পরিবর্তন তীব্র আকার গ্রহণ করছিল। ১৮৮৬-তে রামকৃষ্ণদেব পরলোক গমন করেন। এই বছরই বিনোদিনীর থিয়েটার ত্যাগ। এ-দুই ঘটনার যোগসূত্র থাকাও বিচিত্র নয়। মোট কথা, বহু মিশ্র মানসিক ও বাস্তবিক কারণে বিনোদিনী রঙ্গালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর জীবনের অবশিষ্ট ৫৫ বছর তিনি রঙ্গালয়ে মাঝে মাঝে পদার্পণ করতেন, তবে দর্শকরূপে।

৬

একটা কথা আমাদের কাছে বেশ বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। বঙ্গ রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর প্রসঙ্গ তাঁর জীবনকালের মধ্যেই নাট্যপত্রিকা ও নাট্যবিষয়ক বইপত্রের সম্পাদক ও লেখকরা যেন কিছুটা উপেক্ষা করেছেন! কদাচিৎ তাঁর নামটি মাত্র উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর সত্যিকার অবদান সম্পর্কে কোনো যথাযথ আলোচনা দেখা যায় না। অনেক প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রেও তাঁর নামটি বাদ পড়েছে বা অবহেলিত হয়েছে।

'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় বাংলা ১৩১৭ সালে 'অভিনেত্রীর আত্মকথা' নামে বিনোদিনীর আত্মজীবনীর সামান্য একটু অংশ দুটি সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু রচনাটি শেষও হয় না এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে তাঁর নামও উচ্চারিত হয় না। একই ব্যাপার ঘটে 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৩১-৩২ সালে। ঐ পত্রিকায় বিনোদিনীর ধারাবাহিক রচনা 'আমার অভিনেত্রী জীবন' অসমাপ্ত থেকে যায়—পরবর্তী সংখ্যা থেকে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' লিখতে থাকেন—কিন্তু পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এর কোনো কৈফিয়ৎ দেন নি। অপরেশচন্দ্রও তাঁর উক্ত রচনায় বিনোদিনীকে সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলে উল্লেখ করেই নিজের দায়িত্ব শেষ করেছেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সেকালের অভিনয়-শিল্পীদের একটি জীবনীগ্রন্থ 'অভিনেতৃ কাহিনী'-তে অনেকেরই জীবনী আলোচনা করেছিলেন—কিন্তু সেখানে বিনোদিনীর একটি ছবি মাত্র ছাপা হয়েছিল, তার নিচে লেখা ছিল : "বিনোদিনী 'ষ্টার' থিয়েটারে অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক সময় ইঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যে নাট্যজগতে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিয়াছিল। বিনোদিনী এক্ষণে রঙ্গালয়ের সংস্রবশূন্য।" অমরেন্দ্রনাথের মতো

কথা'য় অভিনয় প্রসঙ্গে বিনোদিনী শুধু তাঁর শিক্ষা ও সাধনার কথা বলেছেন (দ্র. পৃ ২৮-৩২, ৪২-৪৮, ৫০-৫৫)। তা থেকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিনয়ক্ষমতা ও গ্রহণশীলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর সিদ্ধির কথা জানতে হলে অন্যের কথার উপর নির্ভর করতে হয়।

স্বভাবতই সেকালের সাময়িকপত্রে নাট্যসমালোচনার মান উঁচু ছিল না। তা ছাড়া অভিনয় প্রসঙ্গে স্ত্রীভূমিকাভিনেত্রীর কথা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতো। কিছু ব্যতিক্রম দেখিয়েছিল 'সাধারণী' ও 'রিজ অ্যাণ্ড রায়ত' পত্রিকাদ্বয়। বলা বাহুল্য, এগুলিতে বিনোদিনীর উচ্চ প্রশংসা হয়েছিল। শেষোক্ত পত্রিকার প্রশংসা বিনোদিনী নিজেই কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন।

এ-ছাড়া তৎকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নানা উচ্ছ্বসিত উল্লেখের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর অভিনয়বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের দুটি আলোচনাই (দ্র. বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্ট : ঘ এবং পরিশিষ্ট ঙ) সর্বাধিক মূল্যবান। গিরিশের শিক্ষা-গুণেই বিনোদিনীর অভিনয়-উৎকর্ষ চরম রূপ পেয়েছিল। তার আগে তাঁর অভিনয়ে "পড়া পাখীর চতুরতা" ছিল, পরে তিনি গিরিশচন্দ্রের "নিজের হাতের প্রস্তুত, সজীব প্রতিমায়" পরিণত হতে পেরেছিলেন। অবশ্য বেঙ্গল থিয়েটারে শিক্ষকরূপে তিনি শরৎচন্দ্র ঘোষের নামও বিশেষভাবে করেছেন।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর অনেকদিন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীভূমিকায় পুরুষ অভিনেতাই অংশ গ্রহণ করতো। মাইকেল মধুসূদনের প্রেরণায় ও পরামর্শে 'বেঙ্গল থিয়েটার' অভিনেত্রী গ্রহণ করতে আরম্ভ করে (শর্মিষ্ঠা, ১৬ আগস্ট ১৮৭৩)। সেই আদর্শে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'ও কয়েকজন অভিনেত্রী নিয়োগ করে (সতী কি কলঙ্কিনী ?, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)। ঐ বছরের শেষে গ্রেট ন্যাশনালে বালিকা বিনোদিনী একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অবতীর্ণা হন (২ বা ১২ ডিসেম্বর, শত্রুসংহার)। তখন পর্যন্ত উভয় থিয়েটারে অভিনেত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকেরই অভিনয়ক্ষমতা উচ্চস্তরের ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বিনোদিনী সকলের শীর্ষস্থান গ্রহণ করেন।

বিনোদিনী ১২ বছরের অভিনেত্রী জীবনে মোট চারটি রঙ্গালয়ের সঙ্গে কাজ করেছিলেন : ক. গ্রেট ন্যাশনাল (ডিসেম্বর ১৮৭৪ – ডিসেম্বর ১৮৭৬), খ. বেঙ্গল (ডিসেম্বর ১৮৭৬ – জুলাই ১৮৭৭); গ. ন্যাশনাল (জুলাই ১৮৭৭ – জুলাই ১৮৮৩) এবং ঘ. ষ্টার (জুলাই ১৮৮৩ – ডিসেম্বর ১৮৮৬)।

গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর অভিনয়ে তন্ময়তা, গভীর ধ্যান ও ভাবুকতার সমাবেশ

দেখেছেন। তিনি বলেছেন: "· আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে, রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক।" গিরিশচন্দ্র তাঁর পূর্বোল্লিখিত ভূমিকায় বিনোদিনীর 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব', 'দক্ষযজ্ঞ', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'সধবার একাদশী', 'কপালকুণ্ডলা', 'হীরার ফুল', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন অভিনয়ের বিশেষ আলোচনা করেছেন। সে-আলোচনা নানাদিক থেকে খুবই মূল্যবান।

শুধু অভিনয় নয়, রঙ্গালয়ে রূপসজ্জা ও পোষাক সম্পর্কে বিনোদিনীর বিশেষ শিল্পদৃষ্টির উল্লেখ করা যায়। গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধ 'রঙ্গালয়ে নেপেন' (১৩১৫) থেকে জানা যায় বিনোদিনী ক্ষেত্রবিশেষে "নিম্নশ্রেণীর অভিনেত্রীগণের শিক্ষা-প্রদানে" সহায়তা করতেন এবং তিনি ছিলেন নৃত্যপটীয়সী। সব মিলিয়ে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে কেন বিনোদিনীকে তখনকার সাময়িকপত্রগুলি 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ', 'প্রাইমা ডোনা অব দি বেঙ্গলি স্টেজ', 'মুন অব ষ্টার কোম্পানি' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছিল।

পরিশেষে 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকার (১১শ সংখ্যা, ১৩৩১ সাল) সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার টানতে চাই:

"· গিরিশচন্দ্র বলিতেন, বিনোদিনীর মত প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী সর্ব্ব-দেশেই বিরল। ইনি বহু নাটক, গীতিনাটক ও প্রহসনে বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। ইহার পর অনেক শক্তিশালিনী অভিনেত্রী সেই সকল ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে বহুবার দেখা দিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে তাঁহার অভিনীত ভূমিকায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাও যে কেবল মহাকবি গিরিশচন্দ্র বা নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের মুখে শুনিয়াছি তাহা নহে, প্রত্যক্ষ দর্শন বহু দর্শকের মুখেও এখনও সে কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহার চৈতন্য, গোপা, দময়ন্তী, কপালকুণ্ডলা, মনোরমা, আয়েষা বা তিলোত্তমা—সবই অপূর্ব্ব, সবই অননুকরণীয়।

"এ দেশে অভিনেত্রীদের যে সাজিবার ধরন চলিয়া আসিতেছে, তাহাও এই আদর্শ অভিনেত্রীর অনুকরণে। প্রসাধন বিদ্যায় ইঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য এবং অধিকার ছিল। অভিনেত্রীদের মধ্যে সাজিবার অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার, এমন কি, 'পিনটি' আঁটিবার ইতর বিশেষ, শুনিয়াছি তাহাও ইঁহার নিকট হইতে ধার করিয়া শেখা। যখন বিনোদিনী অভিনেত্রী জীবন লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, তখন, এদেশে অনুকরণ করিবার মত তাঁহাদের আদর্শ কেহ

তাহাদের গুণগ্রাম, অপ্রকাশিত থাকে, আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত কবিতা দুইটী, পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।”

এর পর ‘বাসনা’ (১৩০৩) এবং ‘কনক ও নলিনী’ (১৩১২) নামে দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আন্তরিক প্রেরণা না থাকলে শুধু কবি-খ্যাতির জন্য সহসা অভিনেত্রী বিনোদিনীর উৎসাহের কারণ কী থাকতে পারে! এর পর ১৩১৭ সালে ‘নাট্যমন্দির’ পত্রিকায় আত্মকথা রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল।

রঙ্গালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করার ২৬ বছর পর ও তাঁর নিজের ৪৯ বছর বয়সে গ্রন্থাকারে ‘আমার কথা’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—কিন্তু তার আগে ২৭ বছর ও পরে ১২ বছর লেখিকারূপে তাঁর চর্চা অব্যাহত ছিল। অবশ্য এই দীর্ঘকালে তাঁর রচনার পরিমাণ সামান্যই। ৬১/৬২ বছর বয়সে বিনোদিনী শেষবারের মতো ‘রূপ ও রঙ্গ’ পত্রিকায় আত্মস্মৃতি রচনা করেছেন। অসম্পূর্ণ হলেও এতে তাঁর রচনাশৈলীর পরিণতি সহজেই লক্ষ করা যায়। অতএব মানতেই হবে যে বিনোদিনী দীর্ঘকালব্যাপী লেখনীচর্চা করেছেন এবং তার ফলে তাঁর রচনারীতি সার্থক পরিণতি লাভ করেছে। অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর হয়ে প্রায় ৪০ বছর লেখনী চালিয়ে গেছেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তা ছাড়া বিনোদিনীর আত্মজীবনকথাকে গিরিশচন্দ্র “তাহার স্বরচিত নাট্যজীবন” বলে উল্লেখ করেছেন (দ্র. পৃ ১৩৯)। গিরিশচন্দ্রের অনুরোধেই বিনোদিনী এই রচনায় হস্তক্ষেপ করেন (দ্র. পৃ ১৪১) এবং তিনি ‘বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী’ (দ্র. পরিশিষ্ট : ঙ)-তে ‘আমার কথা’র সমালোচনামূলক ভূমিকা রচনা করেছিলেন। বিনোদিনীর মূল রচনায় তিনি বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নি এবং এ বিষয়ে বিনোদিনীর অনুরোধে তিনি জানিয়েছিলেন : “…তোমার সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে। তুমি যেমন লিখিয়াছ, তেমনি ছাপাইয়া দাও। আমি তোমার পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব” (দ্র. ‘অধীনার নিবেদন’)।

কেমন ক’রে বিনোদিনী এতখানি মার্জিত ও উন্নত মনের অধিকারিণী হলেন? সম্ভবত “নীচকুলোদ্ভবা” বলেই এ-প্রশ্ন কারো কারো মনে উদিত হতে পারে। নিজের জন্মগত হীনতা, কঠিন দারিদ্র্য ও জীবনের নিষ্করুণ অভিজ্ঞতাই বোধ হয় তাঁর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মহত্ত্ব ও সংবেদনশীল কবিচিত্তের জন্ম দিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে অভিনয় ও রচনার ঐকান্তিক সাধনা তাঁর মধ্যে সৃজনীশক্তির দ্বিমুখী আত্মপ্রকাশ সম্ভব ক’রে তুলেছিল।

তাঁর জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি বাল্যকালে কিছুদিন বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। সবকিছু জানা ও পড়ার জন্য তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। চলনসই ইংরেজি তিনি শিখেছিলেন। নিজ কন্যা শকুন্তলাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন, অবশ্য সে চেষ্টা সফল হয় নি (দ্র. পরিশিষ্ট : ঙ, গিরিশচন্দ্র-লিখিত ভূমিকা)। শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণীদের সান্নিধ্য তিনি চিরদিন পছন্দ করতেন। দেশবিদেশের নানা কাহিনী, সাহিত্য, বিখ্যাত ব্যক্তিদের ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনী তিনি সাগ্রহে জানা ও পড়ার চেষ্টা করতেন। এ-বিষয়ে তাঁব শিক্ষাগুরু গিরিশচন্দ্রের দান বোধ হয় সর্বাধিক। গিরিশচন্দ্রের কাছে শিক্ষালাভের সময় তিনি বহু বিষযে জানবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, একথা তিনি নিজেব রচনার বহু স্থলে বার বার উল্লেখ করেছেন। আব অনুমান করতে পারি, 'রাজা' উপাধিধারী যে ব্যক্তির সংস্পর্শে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দীর্ঘ "৩১ বৎসরের সুখ-স্বপ্ন" জড়িত ছিল তাঁর সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের দানও সামান্য ছিল না।

বিনোদিনীর ভাবজীবনের সমুন্নতি ও পরবর্তী জীবনের আত্ম ও অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা অনেকখানি নির্ভর করেছে রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ লাভের উপর। বিনোদিনী মনে করতেন এটিই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এই আশীর্বাদ লাভের ফলে তাঁব জন্মগত হীনমন্যতা থেকে অনেখানি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন তিনি।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার, রঙ্গালযে বামকৃষ্ণেব আগমন সে সময়ে একটি বড ঘটনা। রঙ্গালয় ও অভিনেতা-অভিনেত্রীকে লোকে তখন সুনজরে দেখতো না, সমাজে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ছিল — অভিনেতারা দুশ্চরিত্র, আর অভিনেত্রীরা বারাঙ্গনা বলে ঘৃণার পাত্র ছিল। গিবিশচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে কবিতা লিখেছিলেন : "লোকে কয় অভিনয়, / কভু নিন্দনীয় নয়, / নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।" অথচ এই 'নিন্দাভাজন' ব্যক্তিবা সমাজের একটি মহৎ ভূমিকায় অশেষ ত্যাগ ও কষ্টের জীবনকে ববণ ক'বে নিয়েছিল। অভিনয়-জীবন তখন অপবিসীম কঠিন ছিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রঙ্গালয় থেকে লাভবান হওয়া দূরে থাক, কোনোক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে উঠতো। এই অবস্থায় সামাজিক অসম্মান ছিল মর্মান্তিক। রামকৃষ্ণের পদার্পণ তাই রঙ্গালয়ের একটা সামাজিক মর্যাদা এনে দিয়েছিল বলেই মনে হয়।

৮

অভিনেত্রী হিসেবে বিনোদিনীর পরিচয় তুলে ধরা আজ খুবই কঠিন। 'আমার

ছিল না। তিনি ও তাঁহারই উল্লেখযোগ্য দু-একজন সঙ্গিনী নিজেদের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে সাজঘরের উন্নতি করিয়াছিলেন। বিলাতী থিয়েটারের বই এবং নানা দেশীয় চিত্রকলা হইতে বিনোদিনী প্রসাধন বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রচলন করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বেকার বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নহে!

" নায়িকা বা উপনায়িকা সাজিবার উপযোগী অবয়ব, গঠন এবং কণ্ঠস্বরের সমাবেশ, একই পাত্রীতে এখন আর কোন রঙ্গমঞ্চেই দেখিতে পাওয়া যায় না এ কথা বলিলেও কিছু বাড়াইয়া বলা হয় না। তবে আধুনিক দর্শক তাহাদিগের নিকট বর্ত্তমানই যথেষ্ট, কারণ তুলনা করিয়া অভাব অনুভব করিবার দুর্ভাগ্য হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।"

৯

লেখিকা হিসেবে বিনোদিনী অনেকখানি ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায়। পূর্ববর্তী সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদনে আমরা তাঁর গদ্যরীতির স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছিলাম এবং কবি হিসেবে সেকালের যে-কোনো মহিলা কবির সমপর্যায়ে তাঁর স্থান নির্দেশ করেছিলাম। আমাদের সে-কথা কারো কারো কাছে অত্যুক্তি মনে হয়েছিল। কিন্তু আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করলাম যে সম্প্রতি বিনোদিনীর সাহিত্যকর্ম ও রচনাবৈশিষ্ট্য বিশেষ স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করেছে। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ত্রৈমাসিক পত্রিকার দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত (কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪) শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রঙ্গনটী বিনোদিনী দাসী' নামে দীর্ঘ ও সুলিখিত আলোচনাটি এ-প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান।

গিরিশচন্দ্রও বিনোদিনীর ক্ষুদ্র জীবনীটিতে "রচনাচাতুর্য্য ও ভাবমাধুর্য্যের পরিচয়" স্বীকার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর সংখ্যা কম নয়, গদ্য লেখিকাও অনেক। কিন্তু আন্তরিকতা, সরলতা ও ভাবুকতার এমন সমন্বয় সহজে পাওয়া যায় না। মহিলা আত্মজীবনীকারদের মধ্যে একমাত্র রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'ই এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। কিন্তু বিনোদিনীর মতো বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার অধিকারিণী তিনি ছিলেন না। রাসসুন্দরী ছিলেন কুলবধূ, আর বিনোদিনী রঙ্গনটী।

ব্যক্তিগত জীবনে বহু রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। থিয়েটারে

অভিনেত্রীর জীবনে সুখদুঃখের ঢেউ সর্বদাই উতরোল। বিনোদিনীর অত্যাশ্চর্য বর্ণনাশক্তিতে সেসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্প বলার ক্ষমতাও অসামান্য ছিল। আবার তাঁর পত্রাকারে আত্মস্মৃতি নিবেদনের কৌশল বিস্ময়ের উদ্রেক না ক'রে পারে না। বিনোদিনীর কবিহৃদয়ের পরিচয় শুধু দু-খানি কাব্যগ্রন্থে নয়, তাঁর গদ্য রচনাতেও ছাপ ফেলেছে। তাঁর অনেক বিবরণই যে কবিতা গিরিশচন্দ্রও তা লক্ষ করেছিলেন। 'আমার কথা' একেবারেই অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ বেদনা ও উল্লাসের অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

শেষজীবনে 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ তাঁর ভাষা সরল চলিত গদ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ভাষা নিয়ে এতে তাঁর সচেতন চিন্তার ছাপ আছে। এর মধ্যে যেমন স্বচ্ছতা ও প্রবহমানতা এসেছে তেমনি পরিণত জীবনবোধে এ রচনাটি সার্থক। দূর অতীত জীবনকে তখন অনেকখানি বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখতে পাচ্ছেন, পূর্বতন ক্ষোভ ও বিষাদের সুর কেটে গেছে। তার বদলে রঙ্গপরিহাস ও খোসগল্পের মেজাজ এসেছে। বিনোদিনীর ইচ্ছা ছিল শেষজীবনের কাহিনী নিয়ে 'আমার কথা'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করবেন। যদি তা হতো তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর রচনাপ্রতিভার আরো পরিণত রূপ লক্ষ করা যেত।

আর তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলা যায়, পরিমাণে সামান্য হলেও তাঁর কিছু কবিতার জন্য তিনি সেকালের মহিলা-কবিদের যে কারো সঙ্গেই সমকক্ষতার দাবি করতে পারেন। স্বাভাবিক বেদনাবোধ, ভাবুকতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাঁর কবিতাগুলিকে বিশিষ্ট মহিমা দিয়েছে। রোমান্টিক গীতি-কবিতার সব লক্ষণই তাতে স্পষ্ট।

১০

বিনোদিনীর ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষত তাঁর শেষজীবন সম্পর্কে পাঠকদের একটা কৌতূহল থেকে যায়। রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের ২৬ বছর পরে প্রকাশিত 'আমার কথা'য় তার কিছু বিবরণ তিনি নিজেই দিয়েছেন। দুই ভাইবোনের বাল্যজীবন, দারিদ্র্য, ভাইয়ের মৃত্যু, বালিকা বয়সে নিজের বিবাহ ও স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কবিচ্ছেদ, রঙ্গালয়ে যোগদান, আশ্রয়দাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক, রামকৃষ্ণদেবের কৃপা লাভ ও তাঁর মৃত্যুশয্যায় সাক্ষাৎকার (ছদ্মবেশে এই সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ আছে সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ'তে)। থিয়েটার ত্যাগের পর কন্যা শকুন্তলার জন্ম ও মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার মৃত্যু, শেষ আশ্রয়-

দাতার মৃত্যু এবং শূন্য ও শুষ্ক জীবনের হতাশ্বাসও তাঁর বইতে যথাযথ রূপ পেয়েছে। তাঁর শেষজীবনের দুই সান্ত্বনা তাঁর কন্যা শকুন্তলা ও আশ্রয়দাতা সদাশয় পুরুষটির মৃত্যু হয় যথাক্রমে ১৯০৩ ও ১৯১২-তে।

'আমার কথা'র প্রথম খণ্ড এই পর্যন্ত। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড আর লেখা হয় নি। যদি 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকার রচনাটি তিনি শেষ করতে পারতেন তাহলে হয়তো আরো কিছু জানা যেত। তবে সেখানেও তিনি শুধু 'অভিনেত্রী জীবনে'র কথাই বলতে বসেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তখন আর কার আকর্ষণ!

১৯১২ থেকে তাঁর মৃত্যু ১৯৪১ পর্যন্ত এই উনত্রিশ বছরের জীবনকথা বিশেষ জানা যায় না। তথ্যের যেখানে অভাব সেখানে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, সে কাজ ঔপন্যাসিকের। তবু অনুসন্ধানে যা জানা গেছে তার কিছুটা বলা যেতে পারে।

বিনোদিনীর বাড়ির একাংশে ২৯ বছর ভাড়াটিয়ারূপে বাস করেছেন এমন এক ব্যক্তির বংশধরদের সন্ধান পেয়ে আমরা বিনোদিনী সম্পর্কে জানতে চাই এবং সেই মর্মে ২২।৯।৬৩ তারিখে একটি পত্র পাই। তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

"কতদিন বেঁচেছিলেন, কোন সালে মারা যান তা —বাবু বলতে পারলেন না। তবে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। কাশীতে নয় কলকাতাতেই উনি মারা গেছেন এমন বল্লেন। ওঁদের বাড়ীতে 'রূপবাণী'র পাশের রাস্তা··· তারাসুন্দরী ও বিনোদিনী পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতেন। তারাসুন্দরী বিনোদিনীকে মাসী ডাকতেন ও খুব সোহাগ ছিল উভয়ত।···যে বাড়ীটা ৺—মহাশয় ২৯ বছর ভাড়া ছিলেন সেই বাড়ীটা ৺বিনোদিনীর · বাড়ী ভাড়ার রসিদ তিনিই সই ক'রে দিতেন ও ভাড়ার টাকা নিতেন। নিজের মেয়ের নাম ছিল শকুন্তলা। তবে তাঁর পালিতা আরেক কন্যার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়, তারই সন্তানসন্ততি এখন সেই বাড়ী ভোগ করছে। ·তিনটি ছেলে একটি মেয়ে সেই পালিতা কন্যার। · দুটো বাড়ীর মাঝে একটা দোর উঠোনে নীচে, একটা ওপরে ছাতে ছিল। · যাতায়াত তখনকার সময় বিনোদিনীর বাড়ীর সঙ্গে ··হতে পারতো না। তবে কখনও কখনও ভেতরের বা ছাতের দোর কর্তাদের অজ্ঞাতে মেয়েরা খুলতো ও বিনোদিনীর ছাত্এ খেলতে·· ওঁর শোবার ঘর খুব উঁচু পালঙ্ক তাতে মই লাগানো, অনেক ফটো রঙ্গিন ও সাদা কালো নানান সাজের। বিনোদিনী খুব ভাল

গান গাইতেন অর্গান বাজিয়ে। খুব পুজোপাঠ হত রাধাকৃষ্ণ গোপাল নারায়ণ শিলা এইসব নিয়মিত বামুন এসে পুজো করতো।…বিনোদিনী খুব সুশ্রী—কিন্তু রং কালোই ছিল স্বাস্থ্য খুব ভাল—গলার জোর, সাহস এও খুব ছিল। খুব দয়াশীলা পরোপকারী ধাম্মিকা রমণী ছিলেন।… ঈশ্বর প্রসঙ্গে বা অন্যান্য ভাল কথা কইতেন। তাঁর আত্মধিক্কার ছিল। গহনা পরতেন কানে গলায় হাতে কোমরে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ কেমন পেয়েছিলেন সে গল্পও করতেন। সর্ব্বদা চটি পায়ে থাকতেন। শ্বেতী হয়েছিল কিনা ওনারা জানেন না…বৃদ্ধ বয়সে বেশী সময় মাথায় চুলের আঁটি (বেঁধে) বসে থাকতেন বারান্দায়…রাগ হলে হাঁক দিয়ে গাল পাড়তেন। ভাড়াটিয়া বাড়ীর কর্ত্তারা ছেলেরা না থাকলে উনিই গার্জ্জেন হতেন। ইংরিজী শিখেছিলেন। ঘরে বইও ছিল। দুটো বাড়ীর পার্টিশানওয়ালে খুপড়ীতে বিস্তর পায়রা ছিল। তাদের নিজে হাতে চাল খাওয়াতেন। প্রত্যুৎমতি সম্পন্না ও মানুষ চিনতেন। সামান্য যা ওদের সঙ্গে গল্প ক'রে জানা গেল লিখলুম।…'কনক ও নলিনী' ও একটি (কাব্য) আমার কথার আগে উনি লিখেছিলেন।…"

উপরের পত্র পাওয়ার পর আমরা রাজা বাগান স্ট্রীটে বিনোদিনীর বাড়িতে যাই এবং বর্ণনামতো সবই মিলে যেতে দেখি। বিনোদিনীর ঠাকুর ঘর, শোবার ঘর, বইপত্র সবই দেখতে পাই। ঠাকুর ঘরে তাঁর মৃত্যুশয্যার একখানি ছবি আছে। তাঁর বংশধরদের সঙ্গে কথা বলে আমরা তাঁর মৃত্যুর তারিখ জানতে পারি। শেষজীবন পর্যন্ত তিনি নিয়মিত নাটক দেখতে যেতেন, সে-কথাও জানা গেল।

বিনোদিনী যে নিয়মিত নাটক দেখতেন তার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' (১ম পর্ব)-তে। আর মাঝে মধ্যে তারাসুন্দরীকে নিয়ে তিনি বেলুড় মঠে যেতেন। তারাসুন্দরী ছিলেন ব্রহ্মানন্দের ভক্ত। প্রথম বিনোদিনীই তারাসুন্দরীকে মঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তারাসুন্দরী লিখেছেন: "অতি শৈশবে যখন সাত বৎসর বয়সে রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইনি (বিনোদিনী) আমায় নাট্যশালায় লইয়া যান, মঠেও ইনি আমার প্রথম সঙ্গিনী।" ('উদ্বোধন', ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ)।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "আজ বিনোদিনী সর্ব্বস্ব গোপালে সমর্পণ করিয়া গোপালের সেবায় নিযুক্তা…" (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু, ১৩৪৪)।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটি কথা বলা প্রয়োজন। বিনোদিনীর আশ্রয়দাতা ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিছু-কিছু কৌতূহল জাগতে পারে পাঠক-সাধারণের। এ-বিষয়ে বিনোদিনী যতটুকু বলেছেন সেটাই যথেষ্ট মনে করি। রঙ্গালয় ও নিজ অভিনেত্রী জীবনের সূত্রে যেটুকু প্রাসঙ্গিক মনে করেছেন বিনোদিনী সেটুকুই বলেছেন। তার বাইরে তথ্য হয়তো কিছু জানা যায়, কিন্তু সে-তথ্যে আমাদের রঙ্গালয়ের ইতিহাসের কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘ ৩১ বছর যাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন (? ১৮৮১-১৯১২) তাঁর সম্পর্কে বিনোদিনীর কৃতজ্ঞতা, প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাস 'আমার কথা'য় বারংবার প্রকাশিত। সেই অভিজাত ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয় অতিরিক্ত কী সত্য উদ্ঘাটন করবে।

১১

'আমার কথা' ও 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ বিনোদিনীর স্মৃতিচারণায় কিছু তথ্যগত ভুলভ্রান্তি আছে, তা আগেই বলা হয়েছে। স্মৃতিকথায় এ-ধরনের ভুল অস্বাভাবিক নয়। কয়েকটি ভুলের উল্লেখ করা যায় :

১. ১১-১২, ১৫, ৯৭, ১০১ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় কয়েকটি স্থলে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' বলে বিনোদিনী যে রঙ্গালয়ের নাম করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' হবে। ভুবনমোহন নিয়োগী কর্তৃক ১৮৭৩-এ 'গ্রেট ন্যাশনাল' স্থাপিত হয় এবং ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর সেখানে প্রথম অভিনয় শুরু হয়। বিনোদিনী এই রঙ্গালয়ে যোগদান করেন ১৮৭৪-এর ডিসেম্বরে। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে এই রঙ্গালয় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে কিছুকাল নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখে ও পুনরায় 'গ্রেট ন্যাশনাল' নামে ফিরে আসে। ১৮৭৬-এ 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' বিধিবদ্ধ হওয়ার পরই এই থিয়েটার বিলুপ্ত হয়। ১৮৭৭-এর জুলাইতে ঐ একই জমিতে (৬ বিডন স্ট্রীট, বর্তমান মিনার্ভা) গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল' নাম গ্রহণ ক'রে থিয়েটার চালু হয়। নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে মোটামুটি ১৮৮৩ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনী এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজেই 'গ্রেট ন্যাশনাল' ও 'ন্যাশনাল' দুই নামেই কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে দুটি রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব ছিল, সে কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। বিনোদিনী কিছুটা অন্যমনস্কভাবে এদের নাম করায় অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

২. ১৫ পৃষ্ঠায় মহেন্দ্রনাথ বসু—'মহেন্দ্রলাল বসু' নামে বিখ্যাত।

৩. বিনোদিনী জানিয়েছেন তিনি 'বেণীসংহার' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন (পৃ ১৫ ও ৮৫)। আসলে নাটকটির নাম 'শত্রুসংহার'। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে হরলাল রায় কর্তৃক রচিত।

৪. ১৮ পৃষ্ঠায় অভিনীত চরিত্রের তালিকায় 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে "ফতি" আছে। কিন্তু ঐ নামের চরিত্র আছে মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে। সম্ভবত 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন "রতা"র চরিত্রে।

৫. ২০ পৃষ্ঠায় বিনোদিনী জানিয়েছেন যে 'গ্রেট ন্যাশনালে' থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে ২৫৲ টাকা বেতনে যোগদান করেন। আবার ২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "ঠিক মনে পড়ে না, কি কারণ-বশতঃ আমি 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটার ত্যাগ করি।" এই পরস্পরবিরোধী উক্তি কিছুটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে। ১০১ পৃষ্ঠাতেও অনুরূপ উক্তি আছে।

৬. ২০ পৃষ্ঠায় আছে: "··বেঙ্গল থিয়েটারে যে কয়েক বৎসর অভিনয় কার্য্য করিয়াছিলাম···", কিন্তু সম্ভবত ৭ মাসের বেশি তিনি কাজ করেন নি। কারণ 'বেঙ্গল'-এ তিনি যোগ দেন ১৮৭৬-এর ডিসেম্বরে, আর সেখান থেকে গিরিশ-চন্দ্রের 'ন্যাশনালে' যোগ দেন ১৮৭৭-এর জুলাইতে। তবে ২৬ পৃষ্ঠার বিবরণ অনুযায়ী 'ন্যাশনাল' থেকে "কয়েকবার" অনুরোধে পড়ে 'বেঙ্গল'-এ অভিনয় ক'রে থাকতেও পারেন।

৭. ২১ পৃষ্ঠায় বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের প্রসঙ্গে বিনোদিনী বলেছেন, তিনি 'মেঘনাদ বধ' নাটকে সাতটি ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এই ভুল সংশোধন করেছেন (দ্র পৃ ১৪৪)। সাতটি ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন 'ন্যাশনাল'-এ, বেঙ্গলে নয়। তবে 'বেঙ্গলে' শুধু প্রমীলার অভিনয় নিশ্চয়ই করেছিলেন।

৮. 'রিজ অ্যাণ্ড রায়ত' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিনোদিনী ভুলক্রমে একবার তাঁকে (পৃ ৫২) 'শম্ভুনাথ' করেছেন।

৯. ৮৬ পৃষ্ঠায় 'প্রকৃত বন্ধু' নাটকের লেখকরূপে "৺দেবেনবাবু" নাম উল্লিখিত হয়েছে। নাট্যকারের প্রকৃত নাম ব্রজেন্দ্রকুমার রায়।

১০. ৮৭ পৃষ্ঠায় বিনোদিনী দুটি নাটকের নাম করেছেন—'কনক-কানন' ও 'আনন্দলীলা'। কিন্তু ঐ নামে কোনো নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে 'কনক-প্রতিমা' (অতুলকৃষ্ণ মিত্র), 'আনন্দ-মিলন' (কুঞ্জবিহারী বসু), 'আনন্দ

কানন'(লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী) ও 'কনক পদ্ম' (হরলাল রায়) নাটকগুলির নাম পাওয়া যায় — সবগুলিই ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৮এর মধ্যে অভিনীত হয়েছিল। নাম-সাদৃশ্যে মনে হয়, বিনোদিনী এরই মধ্যে কোনো দুটি নাটকের কথা বলতে চেয়েছেন।

১১. ১০২ পৃষ্ঠায় বিনোদিনীর উল্লেখ : "ছোট বাবু (স্বর্গীয় চারুবাবু)" : ইতিপূর্বে জানা গেছে বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎচন্দ্র ঘোষকেই তিনি 'ছোট বাবু' নামে উল্লেখ করতেন। আসলে চারুচন্দ্র ঘোষ ছিলেন শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

১২. ১০৪ পৃষ্ঠায় বিনোদিনী বলেছেন : "বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী এই বেঙ্গল থিয়েটারেই এখন খোলা হয়।" কিন্তু 'মৃণালিনী' প্রথম অভিনীত হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে, ১৮৭৪-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি।

এ-ছাড়া বিনোদিনীর রচনায় সন-তারিখের উল্লেখ না থাকায় এবং বিভিন্ন অভিনয় ও প্রাসঙ্গিক উল্লেখের পারম্পর্য না থাকায় পাঠকদের কিছু কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে।

১২

আমরা দেখেছি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চ থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচিতে দেশবিদেশের রঙ্গালয় ও নাট্যসাহিত্য বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিনোদিনী সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য ও 'আমার কথা' থেকে কিছু উদ্ধৃতি মুদ্রিত হতো। অভিনেত্রী ও লেখিকা হিসেবে তাঁর সম্পর্কে যে শিশিরকুমারের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এই অনুষ্ঠান-সূচি তার অন্যতম প্রমাণ।

আমাদের সম্পাদনায় এই বইয়ের পূর্ববর্তী সংস্করণে (১৩৭১) অসতর্কতা-বশত আমরা একটি গুরুতর ভুল করেছিলাম, সেটির বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। উক্ত সংস্করণের পরিশিষ্ট : গ-রূপে বিনোদিনীর রচিত ও গীত কয়েকটি গান মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে সেগুলি বর্জন করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে তাঁর 'কনক ও নলিনী' কাব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। এই বর্জনের কারণ হল উক্ত গানগুলি রেকর্ডে যিনি গেয়েছিলেন সেই বিনোদিনী দাসী অন্য ব্যক্তি।

'সুবর্ণরেখা' সংস্থার শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার গ্রামোফোন কোম্পানির ১৯২২-এর একটি রেকর্ড-তালিকা আমাদের দেখিয়েছেন। তাতে উক্ত গায়িকা হিসাবে "স্বর্গীয়া বিনোদিনী দাসী"র নাম আছে। কিন্তু অভিনেত্রী বিনোদিনীর মৃত্যু হয়েছে তার অনেক পরে। আমরা ঐ পুরনো রেকর্ডগুলিও শুনেছি। তখনকার

রেকর্ডে গানের শেষে গায়ক-গায়িকা নিজের নাম বলতেন। এখানে শোনা গেল—"আমার নাম গাইনী বিনোদ"। অর্থাৎ আমি গায়িকা বিনোদ, নটী বিনোদ নই। আবিষ্কারের অত্যুৎসাহে আমাদের এ-বিচারও ঠিক হয় নি যে গান গাইলেই গায়িকা সেগুলির রচয়িত্রীও হবেন!

তবে জোনোফোন রেকর্ডের ঐ একই বছরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে 'বিল্ব-মঙ্গল' ও আরো কয়েকটি পালার অংশবিশেষ নিয়ে দু-খানি রেকর্ডে এস. এন. ঘোষ ও মিস বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন। এই 'মিস্ বিনোদিনী' কে ছিলেন তা নিশ্চিত বলা দুরূহ—তবে 'ক্লাসিক' ও 'ইউনিক' থিয়েটারের জনৈকা অভিনেত্রী বিনোদিনীও হতে পারেন।

পূর্ববর্তী সংস্করণের আরো দুটি গুরুতর ভুল বর্তমান সংস্করণে যথাস্থানে সংশোধিত হয়েছে: ১. বিনোদিনীর প্রথম মঞ্চাবতরণ ১৮৭২-এ নয়, ১৮৭৪-এ এবং ২. শেষ অভিনয় 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকে বিলাসিনী কারফরমার ভূমিকায় নয়, 'বেল্লিক বাজার' নাটকে রঙ্গিনী-র ভূমিকায়।

বর্তমান সংস্করণে বিনোদিনীর 'বাসনা' কাব্য থেকে আরো অতিরিক্ত কয়েকটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে।

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত বর্তমান সংস্করণটিকে যথাসাধ্য ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই কিছু ভুলভ্রান্তি রয়ে গেল, সে জন্য আমরা দুঃখিত। তবে সান্ত্বনার কথা, এ জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরবর্তী গবেষকই পূর্ববর্তী অপেক্ষা বিজ্ঞতর।

এই সংস্করণের 'স্থান-কাল-পাত্র' অংশটি সংকলন করেছেন শ্রীশিশির বসু; 'বিষয়-সূচি' প্রস্তুত করতেও তিনি সহায়তা করেছেন। এ-জন্য তাঁর কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। দুষ্প্রাপ্য 'সৌরভ' পত্রিকা দেখতে পেয়েছি শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে। রমাপতি দত্ত ছদ্মনামে তিনি 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' (১৩৪৮) নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। অমরেন্দ্র-নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র এই সদাশয় ব্যক্তির কাছে আন্তরিক ঋণ স্বীকার করি। বর্তমান সংস্করণের জন্য বিশেষভাবে শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাশ, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও শ্রীশুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা
১ শ্রাবণ, ১৩৭৬

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
নির্মাল্য আচার্য

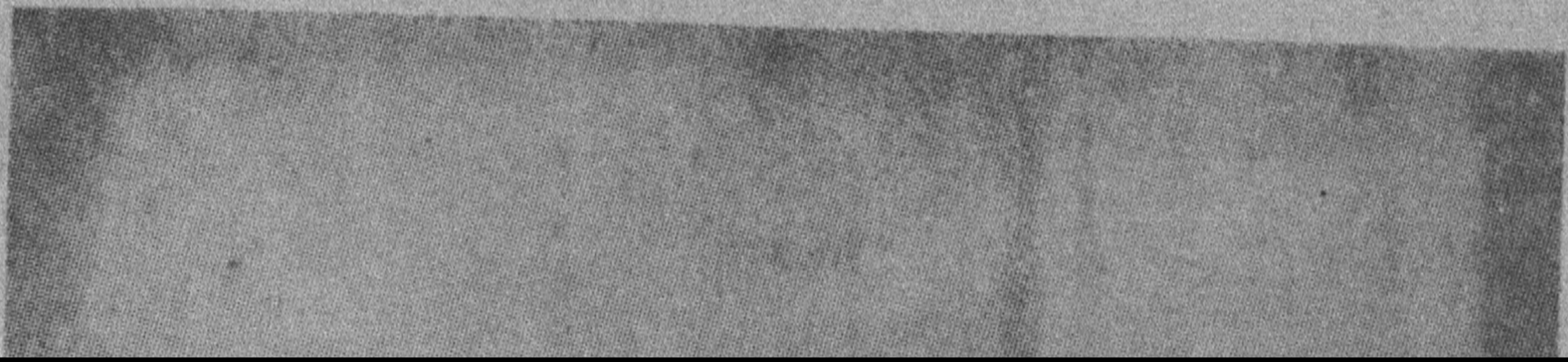

[redacted]

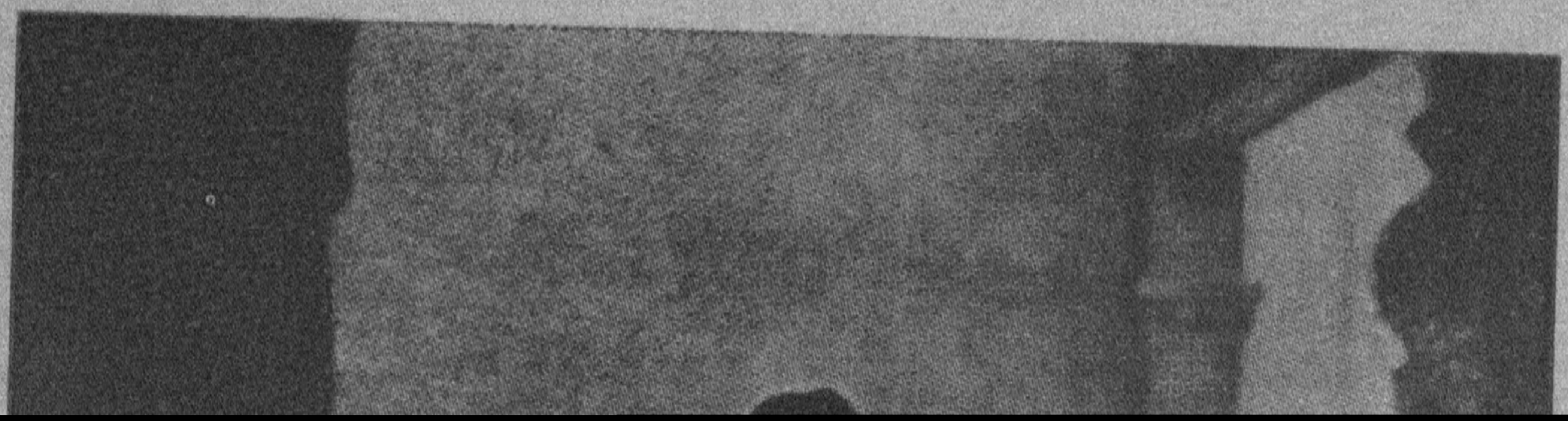

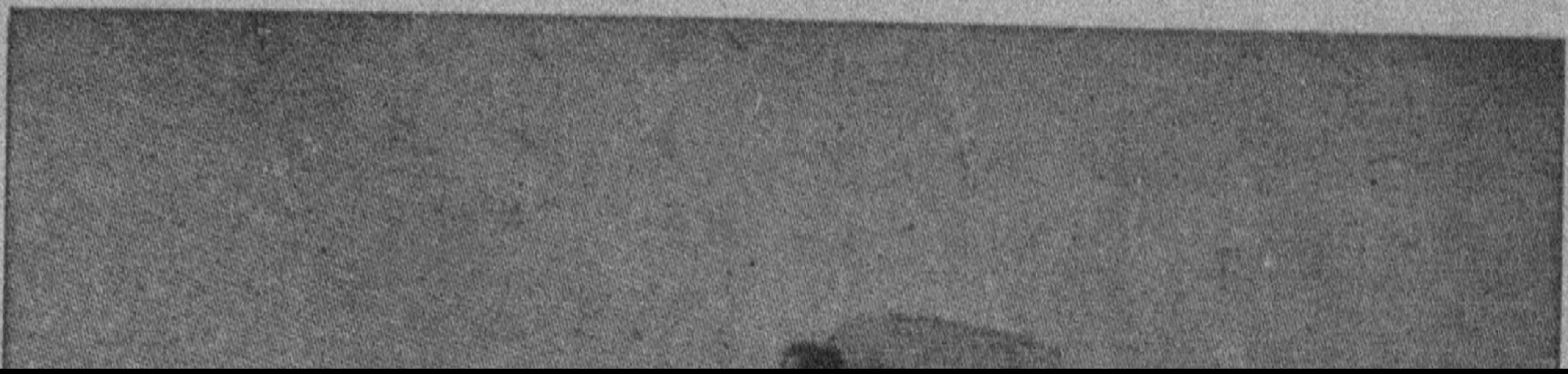

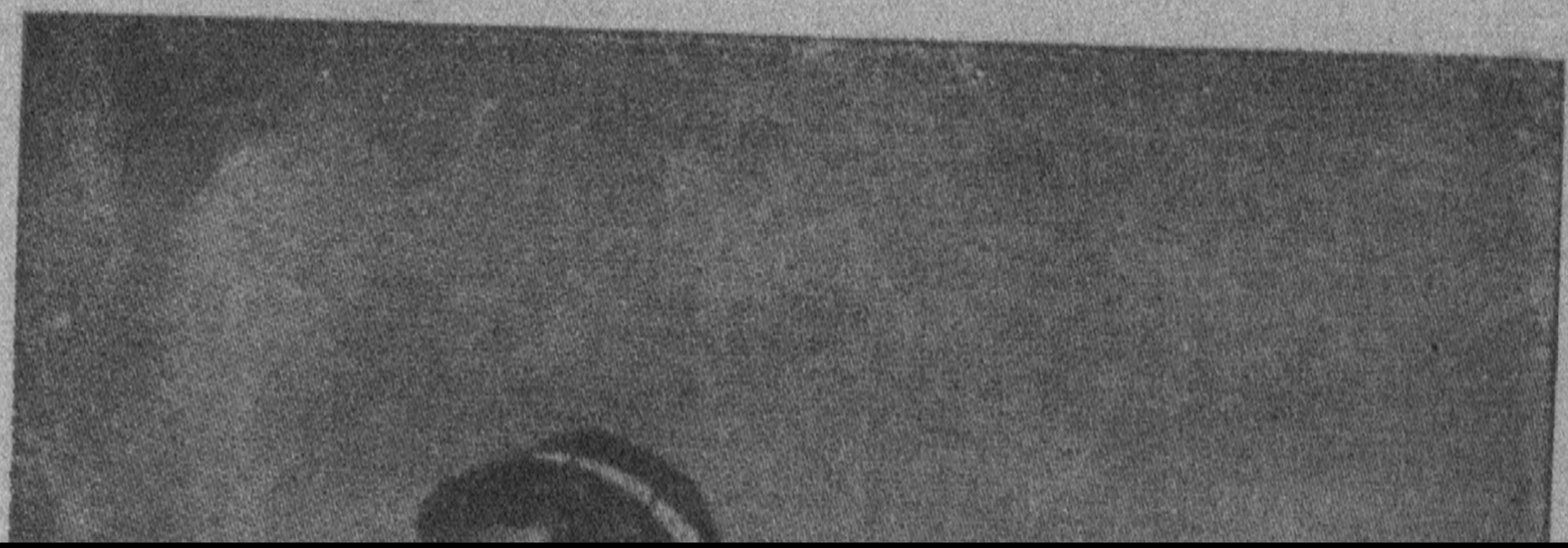

ভূ মি কা

*

আমার এই মর্ম্ম বেদনা-গাথাব

আবার ভূমিকা কি ?

ইহা কেবল অভাগিনীর হৃদয়-জ্বালার ছাযা ! পৃথিবীতে আমাব কিছুই নাই, স্থধুই অনন্ত নিরাশা, স্থধুই দুঃখময় প্রাণের কাতরতা ! কিন্তু তাহা শুনিবারও লোক নাই ! মনের ব্যথা জানাইবার লোক জগতে নাই—কেননা, আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী, পতিতা। আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে আমাব বলিতে এমন কেহই নাই।

তথাপি যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বব ক্ষুদ্র ও মহৎ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলকে স্থখ দুঃখ অনুভব করিবাব ক্ষমতা দিযাছেন, তিনিই আবার আমাকে আমাব কর্ম্মোচিত ফল লাভ করিবার জন্য আমার হৃদযে যন্ত্রণা ও সান্ত্বনা অনুভব কবিবাব ক্ষমতাও দিযাছেন। কিন্তু দুঃখের কথা বলিবাব বা যাতনায অস্থিব হইলে সহানুভূতি দ্বারা কিঞ্চিৎ শান্ত কবিবার, এমন কাহাকেও দেন নাই। কেননা আমি সমাজপতিতা, ঘৃণিতা বাবনাবী ! লোকে আমায কেন দযা কবিবে ? কাহাব নিকটেই বা প্রাণেব বেদনা জানাইব, তাই কালি কলমে আঁকিতে চেষ্টা কবিযাছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে মর্ম্মান্তিক ব্যথা বুঝাইবাব ভাষা নাই। মর্ম্মে মর্ম্মে পিশিয়া প্রাণের মধ্যে যে যাতনাগুলি ছুটাছুটি কবিয়া বেডায় তাহা বাহিরে ব্যক্ত করিবার পথ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জানেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু এই বিদ্যাবুদ্ধিহীনা, অজ্ঞানা, অধমা নারী যে কিছুই পাবে নাই তাহা নিজেই মনে মনে বুঝিতেছি।

যাহা চক্ষে দেখিব বলিযা কালি কলমে তুলিতে গিয়াছিলাম, হায ! তাহাব তো কিছুই হইল না। স্থধুই এতগুলি কাগজ কালি নষ্ট করিলাম। বুঝিয়াছি যে মর্ম্ম-বেদনা স্থধু মনেই বুঝা যায়, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার কোন উপায় নাই, তাই বলিতেছিলাম যাহার কিছুই হইল না তাহার আবার পূর্ব্বোক্তি বা ভূমিকা কি ?

উ প হা র

*

আমার আশ্রয় স্বরূপ

প্রাণময় দেবতার চরণে এই ক্ষুদ্র

উ প হা র

প্রাণের কৃতজ্ঞতার সহিত অর্পিত হইল।

যে অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান অজ্ঞাত মহাপুরুষ ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বলিয়া বিরাজিত হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে পূজিত হইতেছেন, তিনি চর্ম্মচক্ষের অতীত, বর্ণনা ও জ্ঞান বুদ্ধিরও অতীত! সেই অব্যক্ত অচিন্ত্য মহাপুরুষ তো চিরদিনই ধারণার অতীত রহিলেন। এ ক্ষুদ্র জীবনে কখন যে তাহার সীমা নির্দ্ধারিত করিতে পারিব, সে আশাও নাই।

কিন্তু সেই অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এই শোকসন্তপ্ত প্রাণ, এই ভগ্ন-হৃদয় যাহার চরণে আশ্রয় পাইয়াছে, যাঁহার অমৃতময় সান্ত্বনা-বারি দানে এ যন্ত্রণাময় পাপ প্রাণ এখনও এ দেহে রহিয়াছে; যাঁহার কৃপায় সেই আনন্দময়ী ননীর পুতলিকে পাইয়াছিলাম, এক্ষণে নিজ কর্ম্মফলে হারাইয়া এখনও জীবিত আছি!

সেই দয়াময় দেবতার চরণে, এই বেদনাজড়িত **আমার কথা** সমর্পণ করিলাম! একদিন যে অমূল্য ধনে দুঃখিনীর হৃদয় পূর্ণ ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই! অযত্নে অনাদরে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। স্বধুই জীবনে মরণে জড়িত অশ্রুবারি মাখা জলন্ত স্মৃতি আছে! হে দেবতা! এই তাপিত প্রাণের অশ্রুবারিই উপহার লইয়া এই অভাগিনীকে চরণে স্থান দিও, আমার আর কিছুই নাই, দেব!

এই পুস্তক লেখা শেষ করিয়া যাঁহার উদ্দেশে উপরোক্ত ভূমিকা লিখিত হয়; তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, যে "আমার জীবনী লিখিয়া আপনাকে উপহার দিব, কেমন?" তিনি তখন সহাস্য বদনে বলেন, যে "বেশ! তোমার যখন সকল ভার বোঝাগুলি বহিতেছি; তখন ও পাগলামির কালির আঁচড়গুলিও বহিব!"

যাঁহার উদ্দেশে উপরোক্ত উপহার প্রদত্ত হয় সেই দয়াময় দেবতা এক্ষণে

আর ইহ সংসারে নাই! (চিরদিন এ সংসারে কেহ থাকে না বটে) কিন্তু স্বর্গে আছেন! স্বর্গ ও নরক, ইহজন্ম ও পরজন্ম, হিন্দু নরনারীগণ অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকেন বোধ হয়! এ বিশ্বাসের আরও একটী কারণ ও সান্ত্বনা আছে।

কেননা। স্নেহ ও ভালবাসা বলিয়া মানব-হৃদয়ে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জড়িত মধুময় সুখস্পর্শ ভাবলহরী হৃদিসবোবরে সতত উথলিত আবেগময় ভাবে খেলিয়া বেড়ায়, সেইটী বোধহয় মহামায়ার মোহিনী শক্তির বন্ধন স্বরূপ। মানব জীবনের প্রধান জীবনীশক্তি বলিয়া আমার মনে বিশ্বাস।

তাহাতেই ৺বঙ্কিমবাবু মহাশযের নগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিল যে "আমার সূর্য্যমুখী ঐ স্বর্গে আছে। আমার কাছে নাই, কিন্তু সে আমার স্বর্গে আছে।"

আবার সেই স্নেহময় ভালবাসারই আকর্ষণী শক্তিতে পিক্‌মেলিয়নের গেলেটিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে সজীব মূর্ত্তি হইয়া পিক্‌মেলিয়নের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন! আবার নিরাশার তাড়নায় পুনঃ প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন।

আমিও বলিতেছি যে তিনি পৃথিবীতে না থাকিলেও স্বর্গে আছেন! অবশ্যই সেইখান হইতেই সকলই দেখিতেছেন! এ হতভাগিনীরও হৃদয-ব্যথা বুঝিতেছেন। অবশ্য যদি আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সত্য হয়, দেবদেবী সত্য হয়, জন্ম জন্মান্তর যদি সত্য হয়।

উপহারটা কি ?

*

প্রীতির কুসুম দান

সেই জন্যই আমাব স্বর্গীয় প্রাণময় প্রীতির দেবতার চরণে **আমার কথা** উৎসর্গ কবিলাম ! তাঁহার জিনিস আবার তাঁহাকেই দিলাম ! তিনি যেখানেই থাকুন আমার প্রাণেব এই আকুলিত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার পবিত্র আত্মাতে স্পর্শ করিবেই ! কেননা তিনি আমাব নিকট সত্যে বদ্ধ, সত্যবাদীব সত্য কখনও ভঙ্গ হয না ! বিশেষতঃ যে প্রাতঃস্মরণীয উন্নতবংশে তাঁহাব জন্ম, সে বংশেব বংশধর কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পাবেন না। ইহা ত্রিজগতে বিখ্যাত।

অবস্থাব বিপাকে এ সংসাব হইতে যাইবার সময তিনি কথা কহিতে পাবেন নাই বলিযা যে তিনি তাঁহার সত্য প্রতিজ্ঞা ভুলিযা যান নাই, তাঁহাব কাতর দৃষ্টি ও প্রাণেব ব্যাকুলতাই তাহাব প্রমাণ। আমি তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার চরণতলে উপস্থিত ছিলাম। কারণ, তিনি শত শতবার তাঁহার মস্তক স্পর্শ কবাইযা দিব্য করাইযাছিলেন যে, আমি যেন তাঁহার মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত থাকি। বোধহয সেই সত্য রক্ষাব জন্য ঈশ্বব আমায দয়া করিয়া অযাচিতভাবে তাঁহাব নিকট উপস্থিত রাখিযা, আমার সত্য বক্ষা করিলেন।

যে স্থান আমার নিজেব বলিযা স্বাধীনভাবে থাকিতে যাইতাম, সেই স্থানে অপবেব দযাব উপর নির্ভব কবিযা এই পাষাণ বক্ষে লোহার দ্বাবা বন্ধন কবিযা তাহাব নিকট গিযা বসিলাম। তিনি অতি কাতব ভাবে আমাব মুখের দিকে বাব বার চাহিতে লাগিলেন , বালিস হইতে মস্তক তুলিযা এই পাপীযসীর কোলের উপর মাথা বাখিযা যেন অতি কাতরে বলিতে লাগিলেন, আমি তোমার নিকট যে সত্যবদ্ধ হইযা আছি, তাহা সকলে জানে, যাঁহারা আমায জানে , তাহারা তোমায জানে , যাঁহারা আমায় জানে, তাঁহারা সকলে তোমায় জানে।

আমার জীবনের অংশ বলিয়া যাহাকে জানি ; যে ব্যক্তি আমার পদস্পর্শ

করিয়া তোমাব ভারগ্রহণ করিয়াছে, যাহাকে অতি শিশুকাল হইতে আজ ৩১ বৎসর পুত্র স্নেহে আদর করিয়া আসিতেছ, সে রহিল, ধর্ম্ম রহিল!

আমার দিকে চাহেন, আর পদ্মচক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া আইসে। তাঁহার সেই কাতর দৃষ্টি আমার বুকের ভিতর দিয়া প্রতি রক্তশিরায় আঘাত কবিতে লাগিল।

অতি কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন অমন করিতেছ? কি কষ্ট হইতেছে? বল, একবার বল, তোমার কি যাতনা হইতেছে?" হায়। কিছুই বলিলেন না, স্বধু কোলেব উপব মাথা দিয়া কাতরে মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন। আমি হতভাগিনী, শেষের একটী আশ্বাসবাক্য শুনিতে পাইলাম না।

যে প্রেমময় দেবতা আজ ৩১ বৎসর প্রায় শত সহস্রবার আমার নিকট ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিযা, দেবতা স্পর্শ কবিয়া প্রতিজ্ঞা কবিয়া বলিয়াছিলেন যে "যদি আমার কিছুমাত্র দেবতার উপব ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, যদি আমি পুণ্যময় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি তবে তোমাকে কাহারও দ্বাবস্থ হইতে হইবে না। যখন এতদিন— প্রায় সমস্ত জীবন, মান, অপমান, সমান কবিয়া আদবে স্থান দিয়াছি, তখন তোমাব শেষ জীবনে বঞ্চিত হইবে না।" কিন্তু হায় মৃত্যু। তোমাব নিকট দুর্ব্বল বলবান, অধাম্মিক ধাম্মিক, জ্ঞানী অজ্ঞানী, কাহারও শক্তি নাই, তোমারই শক্তি প্রবল। আহা। হয়তো তাঁহার কত কথা বলিবার ছিল, কিছুই বলিতে পারিলেন না। কত বেদনাময় বুক লইয়া ইহ সংসাব হইতে চলিয়া গেলেন।

জীবনে শতসহস্রবার বলিতেন, যে "আমি তোমার আগে এ সংসার হইতে যাইবই তোমায় আগে যাইতে কখন দিব না। স্বদ্ধ তুমি আমার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকিও একটী কথা তোমায় বলিয়া যাইব।" হায়! হায়!! শেষ জীবনেব মনের কথা, মনে রহিল! সেই ন্যায়পবায়ণ, সত্যবাদী, সহৃদয় দেবতা, চন্দ্রের ন্যায় একটী মাত্র কলঙ্ক রাখিয়া আমায় চির যাতনাময় সমুদ্রে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

এই খণ্ডে "আমাব কথা"র এই পর্য্যন্ত বহিল। কিন্তু যখন আমার যাতনাময় জীবনের শেষ নাই, তখন আমার কথারও শেষ নাই। আমাব নাট্য-জীবনের পর ৩১ বৎসর যে দেবতার চরণে আশ্রয় লইয়া, জীবনের সার তৃতীয় অংশ যাঁহার সহিত, যাঁহার আত্মীয় স্বজনের সহিত সমভাবে কাটাইয়াছি; যে পুণ্যময় দেবতা সত্যধর্ম্মে বদ্ধ হইয়া আমায় এত দিন আশ্রয় দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ডে আমার জীবনের সেই সুখময় অংশ ও এই শেষের দুঃখময় অংশ শেষ করিবার ইচ্ছা রহিল। হায় ভাগ্য! যে দয়াময় আত্মীয় পরিবারের সহিত সমভাবে এক সংসারে

স্থান দিয়াছিলেন ; যাঁহার অভাবে আজ আমি ভাগ্যহীনা জন্মদুঃখিনী—কোথায় সেই স্নেহপূর্ণ দেবহৃদয় ! হায় সংসার কি পরিবর্ত্তনশীল এখন মনে হইতেছে !

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা ।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদাদিত্যবধারয় ॥"

নি বে দ ন *

অধীনার নিবেদন

আমার শিক্ষাগুরু ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশযের অনুবোধে এই আত্মকাহিনী লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখিতে দিই, তিনি দেখিয়া শুনিয়া যেখানে যেরূপ ভাবভঙ্গীতে গড়িতে হইবে উপদেশ দিয়া বলেন যে, "তোমার সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে। তুমি যেমন লিখিয়াছ, তেমনি ছাপাইয়া দাও। আমি তোমাব পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব।" একটি ভূমিকা লিখিয়াও দিযাছিলেন, কিন্তু তাহা আমার মনের মতন হয় নাই।† লেখা অবশ্য খুব ভালই হইয়াছিল, আমার মনের মতন না হইবার কারণ, তাহাতে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ ছিল না। আমি সেকথা বলাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়। সংসারে আমাদের ন্যায় রমণীগণের মান অভিমান করিবার স্থল অতি বিরল। এইজন্য যাঁহারা স্বভাবের উদারতা গুণে আমাদিগকে স্নেহেব প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদেব উপর আমরাও বিস্তর অত্যাচার করিয়া থাকি। একে রমণী অদূরদর্শিনী, তাহাতে সে সময় অভিমানে আমার হৃদয় পূর্ণ, গিরিশ বাবু মহাশয়ের রুগ্ন-শয্যা ভুলিয়া, তাঁহার রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া, সত্য ঘটনা সকল উল্লেখ করিয়া আর একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম। তিনিও তাহা লিখিয়া দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমার শিক্ষাগুরু ও সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যদি

---

*এই অংশটি দ্বিতীয় (নব) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে। সম্পাদক।

†উল্লিখিত ভূমিকাটি 'পরিশিষ্ট : ঙ' রূপে গ্রন্থের শেষে ছাপা হল। 'আমার কথা'-র প্রথম সংস্করণে বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের এই ভূমিকাটিকে স্থান দেন নি। পরের বছরে (১৩২০ সাল) প্রকাশিত 'আমার কথা'-র নব সংস্করণে এটি মুদ্রিত করেন। সম্পাদক।

সকল ঘটনা ভূমিকায় উল্লেখ না করেন, তাহা হইলে, আমার আত্মকাহিনী লেখা অসম্পূর্ণ হইবে। শীঘ্র ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাকে ত্বরা দিতে লাগিলাম। স্নেহময় গুরুদেব আমায় বলিলেন, "তোমার ভূমিকা লিখিয়া না দিয়া আমি মরিব না।" রঙ্গালয়ে আমি ৺গিরিশবাবু মহাশয়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলাম। তাহার প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী বলিয়া একসময়ে নাট্যজগতে আমার গৌরব ছিল। আমার অতি তুচ্ছ আবদার রাখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! আমার মান অভিমান রাখিবার দুইজন ব্যক্তি ছিলেন, একজন বিদ্যায়, প্রতিভায়, উচ্চ সম্মানে পরিপূর্ণ, অন্যজন ধনে মানে যশে গৌরবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। এক্ষণে তাঁহারা কেহই আর এ সংসারে নাই। আমার তুচ্ছ আবদার রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গের গ্যারিক্ গিরিশবাবু আর ফিরিয়া আসিবেন না। 'ভূমিকা লিখিয়া না দিয়া মরিব না' বলিয়া তিনি আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। মনে করিয়াছিলাম, তাহার পুনর্ব্বার-লিখিত ভূমিকা সম্পূর্ণ হইলে, আমার আত্মকাহিনীর নব সংস্করণ করিব। কিন্তু আমার শিক্ষাগুরু ভূমিকা লেখা অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমায় শিখাইয়া গেলেন যে, সংসারের সকল সাধ সম্পূর্ণ হইবার নয়।

সম্পূর্ণ ত হইবার নহে, তবে যাহা আছে, তাহা লোপ পায় কেন? আমি গিরিশবাবু মহাশয়ের পূর্ব্বলিখিত ভূমিকাটি অন্বেষণ করিতে গিয়া শুনিলাম যে, গিরিশবাবুর শেষ বয়সের নিত্যসঙ্গী পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছেন। সেটি তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমার ক্ষুদ্র কাহিনীর সহিত গাঁথিয়া দিলাম। আমার শিক্ষাগুরু মাননীয় ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে ও বিশেষ অনুরোধে লিপিবদ্ধ হইয়া আমার আত্মকাহিনী প্রকাশিত হইল। কিন্তু তিনি আজ কোথায়? হায়—সংসার! সত্যই তুমি কিছুই পূর্ণ কর না! এ ক্ষুদ্র কাহিনী যে স্বহস্তে তাঁহার চরণে উপহার দিব, সে সাধটুকুও পূর্ণ হইল না।

বিনীতা

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

বাল্য-জীবন

অ ঙ্কু র

১ম পত্র।

১লা শ্রাবণ। ১৩১৬ সাল।

মহাশয়।

বহু দিবস গত হইল, সে বহুদিনেব কথা, তখন মহাশযের নিকট হইতে এরূপ অজ্ঞাতভাবে জীবন লুক্কাযিত ছিল না। সে সময় মহাশয, বারবার কতবাব আমাকে বলিযাছেন যে, "ঈশ্বব বিনা কাবণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের কায্য কবিতে এ সংসাবে আসে, সকলেই তাঁহাব কায্য করে, আবার কার্য্য শেষ হইলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিযা যায।" আপনাব এই কথাগুলি আমি কতবাব আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু আমি তো আমাব জীবন দিযা বুঝিতে পাবিলাম না যে আমার ন্যায় হীন ব্যক্তিব দ্বারা ঈশ্ববের কি কার্য্য হইয়াছে, আমি তাঁব কি কার্য্য কবিযাছি, এবং কি কার্য্যই বা কবিতেছি, আর যদি তাহাই হয় তবে এতদিন কার্য্য কবিয়াও কি কার্য্যের অবসান হইল না? আজীবন যাহা করিলাম, ইহাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? এরূপ হীন কার্য্য কি ঈশ্বরের?

বার বার আমার অশান্ত হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, "কৈ সংসারে আমার কার্য্য কৈ?" এই তো সংসারের পান্থশালা হইতে বিদায় লইবার সময নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল! তবে এতদিন আমি কি করিলাম? কি সান্ত্বনা বুকে লইয়া এ সংসার হইতে বিদায় লইব! আমি কি সম্বল লইয়া মহাপথের পথিক হইব! মহাশয় অনেক বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমায় বুঝাইয়া দিন, যে ঈশ্বরের কোন্ কার্য্যে আমি ছিলাম ও আছি এবং থাকিব।

অনুগৃহিতা।

২য় পত্র।
৭ই শ্রাবণ।

মহাশয়।

মরুভূমে পতিত পথিকের তৃষ্ণায় আকুল প্রাণ যেমন দূরে সুশীতল সরোবর দর্শনে তৃপ্তি পায়, সেইরূপ মহাশয়ের আশা-বাক্যে আমার প্রাণের কোণে আবার আশার আলোক দেখা দিতেছে। কিন্তু যে ঈশ্বরের জগতপূর্ণ নাম, কোথায় সে ঈশ্বর? কোথায় সেই দয়াময়? যিনি আমার মত পাপী তাপীকে দয়া করেন? আপনি লিখিয়াছেন, "কি কার্য্যে সংসারে আছি, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই। যিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা তিনিই জানেন।" অবশ্যই জানেন! তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী তিনি তো জানিবেনই! কিন্তু আমার কি হইল? আমার যে জ্বালা সেই জ্বালাই আছে, যে শূন্যতা সেই শূন্যতাই! আমার কি হইল? আমার সান্ত্বনার জন্য কি রাখিলেন? শেষ অবলম্বন একটি মধুময়ী কন্যা দিয়াছিলেন আমি তো তাহা চাহি নাই, তিনিই দিয়াছিলেন তবে কেন কাড়িয়া লইলেন? শুনেছিলাম দেবতার দান ফুরায় না! তার কি এই প্রমাণ? না অভাগিনীর ভাগ্য? হায়! ভাগ্যই যদি এত বলবান, তবে তিনি পতিতপাবন নাম ধরিয়াছেন কেন? দুর্ভাগা না হইলে কেন আকিঞ্চন করিব, কেন এত কাঁদিব! যে জন ভক্তি ও সাধনের অধিকারী সে তো জোর করিয়া লয়। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, প্রভৃতি আর আর ভক্তগণ তো জোর করিয়া লইয়াছেন। আমার মত অধম, যদি চিরযাতনার বোঝা বহিয়া অনন্ত নরকে গেল, তবে তাঁহার পতিতপাবন নাম কোথায় রহিল?

আপনি লিখিয়াছেন—"তোমার জীবনে অনেক কার্য্য হইয়াছে, তুমি রঙ্গালয় হইতে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছ। অভিনয় স্থলে তোমার অদ্ভুত শক্তি দ্বারা যেরূপ বহু নাটকের চরিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছ, তাহা সামান্য কার্য্য নয়। আমার 'চৈতন্যলীলায়' চৈতন্য সাজিয়া বহুলোকের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়াছ ও অনেক বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। সামান্য ভাগ্যে কেহ এরূপ কার্য্যের অধিকারী হয় না। যে সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া তুমি প্রস্ফুটিত করিয়াছিলে সে সকল চরিত্র গভীর ধ্যান ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না। যদিচ তাহার ফল অদ্যাবধি দেখিতে পাও নাই, সে তোমার

দোষে নয় অবস্থায় পড়িয়া, এবং তোমার অনুতাপের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে অচিরে সেই ফলের অধিকারী হইবে।”

মহাশয় বলিতেছেন—দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছি। দর্শক কি আমাব অন্তর দেখিতে পাইতেন! কৃষ্ণ নাম করিবার সুবিধা পাইয়া কার্য্যকালে, অন্তরে বাহিরে কত আকুল প্রাণে ডাকিয়াছিলাম! দর্শক কি তাহা দেখিয়াছেন? তবে কেন একমাত্র আশার প্রদীপ নিবিয়া যাইল? আর অনুতাপ। সমস্ত জীবনই তো অনুতাপে গেল। পদে পদে তো অনুতপ্ত হইযাছি, জীবন যদি সংশোধন করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে অনুতাপের ফল হইত বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু অনুতাপের কি ফল ফলিয়াছে? এখনও তো স্রোতে মগ্ন তৃণ প্রায ভাসিয়া যাইতেছি। তবে আপনি কাহাকে অনুতাপ বলেন জানি না। এই যে হৃদয় জোড়া যাতনার বোঝা লইয়া তাঁর বিশ্বব্যাপী দরজায় পডিয়া আছি কেন দয়া পাই না। আর ডাকিব না, আর কাঁদিব না বলেও যে “হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ” করিয়া হৃদয়ের নিভৃত কোণ হইতে যাহাকে ডাকিতেছি, কোথায় সে হরি?

বাল্যকাল হইতে কত সাধ, কত বাসনা, কত সরল সৎপ্রবৃত্তি কালের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব? কৃষ্ণ নাম স্মরণ করিয়া, জগৎ-সুন্দর জগদীশ্বরের দিকে যে বাসনা সৎপথে ছুটিতে চাহিত, তখনি মোহজালে জডিত মন তাহাকে চোরাবালির মোহে ডুবাইয়া দিয়াছে। যখন জোর করিয়া উঠিতে আগ্রহ হইত, কিন্তু চোরাবালিতে পডিয়া ডুবিয়া গিয়া, জোর করিয়া উঠিতে গেলে যেমন বালির বোঝা সব চারিদিক হইতে আরও উপরে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পাতালে ডুবাইয়া দেয়, আমার দুর্ব্বল বাসনাকেও তেমনি মোহ-ঘোর আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। বলহীন বাসনা আশ্রয় পায় নাই, ডুবিয়া গিয়াছে। চোরাবালিতে পডিয়া পুতে যাওয়ার ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ডুবিয়াছে! কিন্তু এখন তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি যে বাসনা প্রবৃত্তি উপরে ছুটিতে চায়। কে যেন ঘাড ধরিয়া ডুবাইয়া দেয়, তাহা তো বুঝিতে পারি না। তখন কত কাতরে কাঁদি, তবু ডুবি! শক্তিহীন দুর্ব্বল বলিয়াই ডুবি। বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়! মহাশয় মনের আবেগে কত কথা আসিয়া পডিতেছে। যাহার দিকে চাহিয়া, যাহাকে বড আপনার করিয়া বডই অনাথ হইয়া চরণ ধরিয়া আপনার করিতে যাই, তবু দূরে বহুদূরে পডিয়া থাকি! অধিক বলিয়া বিরক্ত করিব না, এক্ষণে বিদায় হই!

অভাগিনী।

৩য় পত্র।

মহাশয়।

পূর্ব্বের অবস্থা যাহাই থাকুক, উপস্থিত অবস্থায় কি কার্য্যে আছি! রুগ্ন, অথর্ব্ব, ভবিষ্যৎ আশা শূন্য, দিনযামিনী এক ভাবেই যাইতেছে, কোনরূপ উৎসাহ নাই। রোগ-শোকের তীব্র কশাঘাত, নিরুৎসাহের জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া অপরিবর্ত্তিত স্রোত চলিতেছে। আহার, নিদ্রা ও দুশ্চিন্তা, প্রতিদিনের ছবি একদিনে পাওয়া যায়, আজ একরূপ কাল অন্যরূপ কোনই পরিবর্ত্তন নাই। কেবল মাত্র প্রভেদ এই কখন কখন রোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি সদা সর্ব্বক্ষণ অস্বস্তি। কেহ যত্ন করিয়া উপশমের চেষ্টা করিলে, সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত হইতে বলিলে মনে মনে হাসি পায়! কারণ তাঁহারা এই বলিয়া আশ্বাস দেন, বলেন "সুস্থ হইয়া থাক কোনরূপ চিন্তা করিও না।" আমি ভাবি তাঁহারা আমার অবস্থা বোঝেন না। তাঁহারা বোঝেন না যে যদি চেষ্টা করিয়া সুস্থ থাকা সম্ভব হইত, সে চেষ্টা শত সহস্ররূপে হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বলার অপেক্ষা থাকিত না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তাঁহারা আমার মতন ভাগ্যহীনা লোকের স্বরূপ অবস্থা না বোঝেন। কারণ এরূপ অবস্থায় না ঠেকিয়া কেহ বুঝিতে পারে না। সততই মনে হয় যে এই আশাশূন্য দুশ্চিন্তায় সদা সর্ব্বদা মগ্ন থাকাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? সর্ব্বদাই বলি ভগবান আর কতকাল। দুঃখের অবসান না হউক অন্ততঃ স্মৃতির জলন্ত যাতনা হইতে নিস্তার পাইয়া শান্তি লাভ করি। সে যন্ত্রণা অতি তীব্র। বিনীত ভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এইরূপ জরাজীর্ণ দেহ লইয়া অবসন্ন ভাবে সংসারের এক কোণে পড়িয়া থাকিয়া কি আপনার মতে ঈশ্বরের কার্য্য হইতেছে?

৪র্থ পত্র।

মহাশয়!

আপনাকে যখন দুঃখের কথা জানাইয়া পত্র লিখি, পত্রের উত্তরে আপনার সান্ত্বনা বাক্যে আশার ক্ষীণ আলোক হৃদয়ে দেখা দেয়! কিন্তু সে ক্ষণিক—

মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায়। আপনি তো জানেন আমার তমোময় হৃদয়ের আলোক স্বরূপ একটী কন্যা অযাচিত রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে কন্যাটী নাই। এক্ষণে আমার গাঢতমাচ্ছন্ন হৃদয় গাঢতর তিমিরে ডুবিয়াছে। যত প্রকারে সান্ত্বনা আনিবার চেষ্টা পাই সকলই বিফল। "ঈশ্বর দয়া কর" "হরি দয়া কর"—বারবার বলি সত্য, কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেখিতে পাই যে আমার সেই প্রাণপ্রতিমাব জন্য আমি লালায়িত। যেমন দিক নির্ণয় যন্ত্রের সূচিকা উত্তবাভিমুখে থাকে, আমারও মন সেইরূপ সেই হাবানিধিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। যিনি মাতার বেদনা জানেন না, তিনি আমার বেদনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কন্যার জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনা আমার মানস দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। এ অবস্থায় শান্তি কোথায়? সততই মনে হয়, আমি কি এই দারুণ যন্ত্রণা ভোগের জন্য সৃষ্টি হইযাছি। আপনাব নীতিগর্ভ-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে হয়তো বা শান্তিলাভ কবিতে পারিতাম। কিন্তু সে বিশ্বাস আমাব কোথায়? বাল্যকাল হইতে সংসারচক্রে পডিয়া অবিশ্বাস করিতে শিখিযাছি, এই অবিশ্বাসের জন্য আমার অভিভাবক, সাংসারিক অবস্থা ও আমি নিজে দাযী! কিন্তু দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ফল কি? অবিশ্বাস অবিশ্বাসই আছে। অবস্থায় পডিযা যে দিকে মনের গতি, তাহাব বিপরীত দিকে চিরদিনই চালিত হইযাছে। এই বিপরীত যুদ্ধে শরীব-মন জর্জ্জরীভূত। বলিয়াছি আমার হৃদয় সেই স্নেহ-প্রতিমাব দিকে দিবারাত্র রহিয়াছে। তাহার আলোচনা দুঃখময, কিন্তু সেই আলোচনাই আমাব সুখ। হতাশ্বাসপূর্ণ সন্তান-হাবা হৃদয়ে আর অপব সুখ নাই। অবিশ্বাসেব মূল কিরূপ দৃঢ় হইয়া অন্তরে বসিয়াছে, তাহা আমার জীবনেব ঘটনাবলি শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। আপনি বলেন, আমার আজীবন বৃত্তান্ত শুনিলে, আমি যে ঈশ্বরেব কার্য্যে সৃষ্ট হইযাছি, তাহা বুঝাইযা দিবেন। আমিও আমাব আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি বিবৃত করিব। যদি কৃপা করিয়া শুনেন, বুঝিতে পারিবেন অবিশ্বাস কিরূপে দৃঢীভূত হইয়াছে। এবং তাহার উচ্ছেদ অসম্ভব। শান্তির মূল বিশ্বাস, হয়ত বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই বিশ্বাস কোথায়? আমার প্রতি আপনার অশেষ স্নেহ, এই নিমিত্ত সাহস করিয়া আদ্যোপান্ত বলিতেছি। কৃপা করিয়া শুনুন! শুনিতে শুনিতে যদি বিবক্তি জন্মায় পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। শুনিবেন কি?

মহাশয় আপনি আমার ক্ষুদ্র জীবনী শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা

আমার পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়। আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছি দয়া করিয়া শুনিলে কৃতার্থ হইব এবং আপনার ন্যায় মহৎ লোকের নিকট হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া এ দুর্ব্বিসহ হৃদয়ভার কতকটা লাঘব করিব।

১ম কথা (পল্লব) রঙ্গালয়ে প্রবেশের সূচনা

বাল্য-জীবন

আমাব জন্ম এই কলিকাতা মহানগবীব মধ্যে সহায় সম্পত্তিহীন বংশে। তবে দীন দুঃখী বলা যায় না, কেননা কষ্টে-শ্রেষ্টে এক রকম দিন গুজরান হইত। তবে বড় সুশৃঙ্খলা ছিল না, অভাব যথেষ্টই ছিল। আমার মাতামহীর একখানি নিজ বাটী ছিল। তাহাতে খোলার ঘব অনেকগুলি ছিল। সেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ১৪৫ নম্বব বাটী এখন আমাব অধিকারে আছে। সেই সকল খোলার ঘরে কতকগুলি দরিদ্র ভাড়াটিয়া বাস কবিত। সেই আয় উপলক্ষ করিযাই আমাদের সংসাব নির্ব্বাহ হইত। আর তখন দ্রব্যাদিসকল সুলভ ছিল, আমরাও অল্প পবিবার। আমাব মাতামহী, মাতা আর আমরা দুটী ভ্রাতা ভগ্নী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সহিত আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তখন আমার মাতামহী একটী মাতৃহীনা আড়াই বৎসর বয়সের বালিকার সহিত আমার পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাহার মাতার যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি ঘরে আনিলেন। তখন অলঙ্কাব বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল। কারণ ইহার অগ্রেই মাতামহীর ও মাতাঠাকুরানীর যাহা কিছু ছিল, তাহা সকলই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরানী বড়ই স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণকারের দোকানে এক একখানি করিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া আমাদের হাতে দিতেন, অলঙ্কার বিক্রয় জন্য কখন দুঃখ করিতেন না।

আমার সেই সময়ের একটা কথা মনে পড়ে, আমার যখন বয়স বছর সাতেক তখন আমার মাতা কাহাদিগের কর্ম্ম-বাড়ী গিয়া আমাদের জন্য কয়েকটী সন্দেশ চাহিয়া আনিয়াছিলেন। অনুগ্রহের দান কিনা, তাহাতেই দশ পনের দিন তুলিয়া রাখিয়া, মায়া কাটাইয়া আমার মাতার হাতে দিয়াছিলেন; এখন হইলে সে সন্দেশ দেখিলে অবশ্য নাকে কাপড় উঠিত। আমার মাতা তাহা বাটীতে আনিয়া আমাদের তিনজনকে আনন্দের সহিত

খাইতে দেন। পাছে সেই দুর্গন্ধ সংযুক্ত সন্দেশ শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এইজন্য অতি অল্প করিয়া খাইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা হইয়াছিল। এই আমার সুখের বাল্যকালের ছবি।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতি অল্প বয়সেই আমার মাতাকে চিরদুঃখিনী করিয়া এ নারকীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার মৃত্যুতে আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরানী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। আমার ভ্রাতা অসুস্থ হইলে অর্থের অভাবে তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালযে লইয়া যাইতে হয়। আমবা দুটি ক্ষুদ্র বালিকা বাটীতে থাকিতাম। আমাদের একটি দয়াবতী প্রতিবেশিনীর জন্য আমাদের আহারাদির কোন কষ্ট হইত না। তিনি আমাদেব সঙ্গে কবিযা আমাব মাতাব ও মাতামহীব আহাব লইযা ডাক্তাবখানায় আমাব ভ্রাতাকে দেখিতে যাইতেন। কোন কোন দিন তাঁহাদের আহার কবিবাব জন্য বাড়ী পাঠাইযা দিয়া তিনি নিজে আমার ভ্রাতার নিকট বসিয়া থাকিতেন। পরে আবার তাহারা আহার সমাপন কবিযা সেইখানে যাইলে আমাদের সঙ্গে করিয়া বাটী আসিতেন। কেবল আমাদের বলিযা নহে, তিনি স্বভাবতই পবোপকাবিণী ছিলেন। যদি রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময কেহ আসিযা তাঁহাকে বিপদ জানাইত, তখন অমনি কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে তাহাদের বাটী যাইতেন। পবে নিজের শরীর দ্বারাই হউক আব পয়সাব দ্বাবাই হউক লোকের উপকার সাধন কবিতেন। তাঁহাব মতন পরোপকারিণী এখনকার দিনে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায না। তাঁহার নিজের কিছু সম্পত্তি ছিল, সংসাবে তাঁহাব আর কেহ ছিল না। পবোপকারই তাঁহার ব্রত ছিল।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালযেই আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয। সে দিন আমার স্মৃতি-পটে জাজ্বল্যমান আছে। তখন ভাবতে লাগিলাম আবার আমার ভাই আসিবে না কি? যমে নিলে যে আব ফিবাইযা দেয না, দৃঢরূপে তখন হৃদযঙ্গম হয নাই। আমার মাতামহী আমার ভ্রাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন কিন্তু অতিশয় ধৈর্য্যশালিনীও ছিলেন। তাঁহার শুনা ছিল, ডাক্তারখানায় মবিলে মড়া কাটে, গতি করিতে দেয় না! যেমন আমার ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিল, তিনি অমনি সেই মৃতদেহ বুকে করিয়া তিনতলার উপর হইতে তড়্ তড়্ করিয়া নামিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে যেন ছুটিলেন। আমরা আমার মাতার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম।

আমার মাতাঠাকুরানী কেমন বিকৃত হৃদয় হইয়াছিলেন, তিনি হাঃ হাঃ করিয়া মাঝে মাঝে হাসিতে লাগিলেন। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারখানার বড় ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "ব্যস্ত হইও না, আমরা ধরে রাখিব না।" কিন্তু দিদিমাতা শুনেন নাই, তিনি একেবারে কোলে করিয়া লইয়া গঙ্গার তীরে মৃতদেহ শযান করাইয়া দেন। গঙ্গার উপর সেই ডাক্তারখানা। তখন একজন ডাক্তার সেইখান পর্য্যন্ত দয়া করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে "এখনই সৎকার করিও না, অতিশয় বিষাক্ত ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, আমি আবার আসিতেছি।" পরে তাঁহারা ঘণ্টাখানেক সেই গঙ্গাতীরে সেই মৃতদেহ কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ডাক্তার বাবু আসিয়া আবার অনুমতি দিলে তবে কাশী মিত্রের ঘাটে এনে তাকে চিতায় শয়ন করান হয়। ইতিমধ্যে আমাদের সেই দয়াবতী প্রতিবেশিনী তথায় উপস্থিত হন। তিনি বাটী হইতে কিছু অর্থ আনিতে গিয়াছিলেন। ভ্রাতার অবস্থা খারাপ দেখিয়া তার আগের রাত্রে আমি ও ভ্রাতৃবধু সেইখানেই ছিলাম। এব ভিতরে আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে রক্ষা হয়। ভ্রাতার সৎকারের জন্য আমার মাতামহী ও সেই প্রতিবেশিনী যখন ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় মা আমার আস্তে আস্তে গঙ্গার জলে কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। আমি মা'র কাপড় ধরিয়া খুব চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকায় আমার দিদিমাতা দৌড়াইয়া আসিয়া মাতাকে ধরিয়া লইয়া যান। ইহার পর মা আমার অনেক দিন অর্দ্ধ-উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। মোটে কাঁদিতেন না, বরং মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেন। সে কারণ আমার দিদিমাতা বড়ই সাবধান ছিলেন। মায়ের সম্মুখে কাহাকেও আমার ভ্রাতার কথা কহিতে দিতেন না। যদিও আমার দিদিমাতা আমাদের সকলের অপেক্ষা আমার ভ্রাতাকেই অধিক স্নেহ করিতেন, কেন না আমাদের বংশে পুত্র সন্তান কখন হয় নাই, মেয়ের মেয়ে, তাহার মেয়ে নিয়েই সব ঘর। কিন্তু নিজ কন্যার অবস্থা দেখিয়া একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে আমরা সকলে শুইয়া আছি, আমার মা "ওরে বাবারে কোথা গেলিরে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার দিদিমাতা বলিলেন, "আঃ বাঁচলেম।" আমি 'মা মা' করিয়া উঠিতে দিদিমাতা বলিলেন যে, "চুপ – চুপ উহাকে কাঁদিতে দে", আমি ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমারও বড় কান্না আসিতে লাগিল।

শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এ কথাও যেন মনে পড়ে যে

আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড একটী সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ আর আর প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিযা আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটী আমার বর। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি যে আমার একজন মাস্-শাশুড়ী ছিলেন, তিনিই আমার স্বামীকে লইয়া গিয়াছিলেন, আর আসিতে দেন নাই। সেই অবধি আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। লোক পরম্পরায় শুনিতাম যে তিনি বিবাহাদি করিযা সংসার করিতেছেন, এক্ষণে তিনিও আর সংসারে নাই। আমার ভ্রাতার জীবদ্দশায় আমার স্বামীকে আনিবার জন্য কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা হইযাছিল। আমি একটি মাত্র কন্যা বলিয়া মাতামহীর ও মাতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি আমাদের বাটীতেই থাকেন। কেন না তিনিও আমাদের ন্যায় দরিদ্র ঘরের সন্তান। কিন্তু তাঁহার মাসী আর আসিতে দেন নাই।

এই তো গেল আমার বালিকা কালের কথা, পরে যখন আমার নয় বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় আমাদের বাটীতে একটী গায়িকা আসিযা বাস করেন। আমাদের বাটীতে একখানি পাকা একতলা ঘর ছিল, সেই ঘরে তিনি থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহ ছিল না, আমার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে কন্যাসদৃশ স্নেহ করিতেন। তাঁহার নাম গঙ্গা বাইজী। অবশেষে উক্ত গঙ্গা বাইজী ষ্টার থিয়েটারে একজন প্রসিদ্ধা গায়িকা হইযাছিলেন। তখনকার বালিকা-সুলভ-স্বভাববশতঃ তাঁহার সহিত আমার "গোলাপ ফুল" পাতান ছিল, আমরা উভয়ে উভয়কে "গোলাপ" বলিযা ডাকিতাম এবং তিনিও নিঃসহায় অবস্থায় আমাদের বাটীতে আসিযা আমার মাতার নিকট কন্যা স্নেহে আদৃত হইয়া পরমানন্দে একসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি সমভাবে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। সময়ের গতিকে এবং অবস্থা ভেদে পরে যদিও আমাদের দূরে দূরে থাকিতে হইত, তথাপি সেই বাল্য-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে সমভাবে ছিল। এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল বলিয়া আমার মাতামহী ও মাতাকে বড়ই সম্মান করিতেন। এখনকার দিনে অনেক লোক বিশেষ উপকৃত হইয়া ভুলিযা যায় ও স্বীকার করিতে লজ্জা এবং মানের হানি মনে করে, কিন্তু "গঙ্গামণি" – ষ্টারে গায়িকা ও অভিনেত্রীর উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও অহঙ্কারশূন্যা ছিলেন। সেই উন্নত হৃদয়া বাল্য-সখী স্বর্গাগতা গঙ্গামণি আমার বিশেষ সম্মান ও ভক্তির পাত্রী ছিলেন।

আমাদের আর কোন উপায় না দেখিয়া আমার মাতামহী উক্ত বাইজীর নিকটেই আমায় গান শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তখন আমাব বয়ঃক্রম ৭ বা ৮ বৎসর এমনই হইবে। আমার তখন গীত বাদ্য যত শিক্ষা করা হউক বা না হউক তাঁহাব নিকট যে সকল বন্ধুবান্ধব আসিতেন, তাঁহাদেব গল্প শুনা একটী বিশেষ কাজ ছিল। আর আমি একটু চালাক চতুর ছিলাম বলিয়া আমাকে সকলে আদব কবিতেন। তখন বালিকা-সুলভ-চপলতাবশতঃ তাঁহাদের আদর আমার ভালো লাগিত। কি করিতাম, কি কবিতেছি, ভালো কি মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু খুব বেশী মিশিতাম না; কেমন একটা লজ্জা বা ভয় হইত। দূরে দূরে থাকিতাম, কেন না আমি বাল্যকাল হইতে আমাদের বাটীর ভাডাটিয়াদের রকম সকমের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণ ছিলাম, যাহারা আমাদের খোলাব ঘবে ভাডাটিয়া ছিল; তাহারা যদিও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ নহে, তবুও স্ত্রী-পুরুষের ন্যায ঘব সংসাব কবিত; দিন আনিত দিন খাইত এবং সময়ে সময়ে এমন মারামাবি করিত যে দেখিলে বোধ হইত বুঝি আর তাহাদের কখনও বাক্যালাপ হইবে না। কিন্তু দেখিতাম যে পরক্ষণেই পুনরায় উঠিয়া আহারাদি হাস্য পরিহাস কবিত। আমি যদিও তখন অতিশয় বালিকা ছিলাম, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতাম। মনে হইত, আমি তো কখনও এরূপ ঘৃণিত হইব না। তখন জানি নাই যে আমার ভাগ্য দেবতা আমাব মাথার উপর কাল্ মেঘ সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। তখন মনে করিতাম বুঝি এমনি মাতৃকোলে সরল সুখময় হৃদয় লইযা চিরদিন কাটিয়া যাইবে। সেই মনোভাব লইয়া আমার বাল্যসখীর বন্ধুদেব সহিত বাহিবে বাহিরে আনন্দ করিয়া খেলা করিয়া, রাত্র হইলে স্নেহময়ী জননীর কোলে শুইয়া আনন্দ লাভ করিতাম। আমার ভ্রাতার মৃত্যুব কিছুদিন পরে, গঙ্গামণির ঘরে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠ বলিয়া দুইটী ভদ্রলোক তাঁহার গান শুনিবার জন্য প্রায়ই আসিতেন, শুনিতাম তাঁহারা নাকি কোনখানে "সীতার বিবাহ" নামে গীতিনাট্য অভিনয় করিবার মানস করিয়াছিলেন। তিনি একদিন আমার মাতামহীকে ডাকিয়া বলিলেন যে "তোমাদের বড কষ্ট দেখিতেছি তা তোমাব এই নাতনীটিকে থিয়েটারে দিবে? এক্ষণে জলপানি-স্বরূপ কিছু কিছু পাইবে, তারপর কার্য্য শিক্ষা করিলে অধিক বেতন হইতে পারিবে।" তখন সবে মাত্র দুইটী থিয়েটার ছিল, একটী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর "ন্যাশন্যাল থিয়েটার"

দ্বিতীয় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "বেঙ্গল থিয়েটার"। আমার দিদিমাতা দুই চারিটী লোকের সহিত পরামর্শ করিলেন, অবশেষে পূর্ণবাবুর মতে থিয়েটারে দেওয়াই স্থির হইল। তখন পূর্ণবাবু আমাকে সুবিখ্যাত "ন্যাশন্যাল থিয়েটাবে" দশ টাকা মাহিনাতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। গঙ্গা বাইজী যদিও একজন সুদক্ষ গাযিকা ছিলেন, কিন্তু লেখাপডা কিছুমাত্র জানিতেন না; সেইজন্য আমার থিযেটারে প্রবেশের বহুদিন পরে তিনি সামান্য মাত্র লেখাপডা শিখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পরে উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত অভিনেত্রীব কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

এই সময় হইতে আমার নূতন জীবন গঠিত হইতে লাগিল। সেই বালিকা বয়সে, সেই সকল বিলাস বিভূষিত লোকসমাজে সেই নূতন শিক্ষা, নূতন কার্য্য, সকলই আমার নূতন বলিযা বোধ হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, তবে যেরূপ শিক্ষা পাইতাম, প্রাণপণ যত্নে সেইরূপ শিক্ষা করিতাম। সাংসাবিক কষ্ট মনে কবিয়া আরও আগ্রহ হইত। মাতার শোকদুঃখপূর্ণ মুখখানি মনে করিযা আরও উৎসাহ বাডিত। ভাবিতাম যে মায়ের এই দুঃখের সময় যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে সাংসারিক কষ্টও লাঘব হইবে।

যদিও রঙ্গালয়ে শিক্ষামত কার্য্য করিতাম বটে, কিন্তু আমাব মনের ভিতব কেমন একটা আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা সতত ঘুরিযা বেডাইত। মনে ভাবিতাম, যে আমি কেমন করিযা শীঘ্র শীঘ্র এই সকল বড বড় অভিনেত্রীদের মত কার্য্য শিখিব! আমার মন সকল সময়েই সেই সকল বড বড অভিনেত্রীদের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেডাইত। তখন সবে মাত্র চারিজন অভিনেত্রী ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ছিলেন। রাজা, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী ও নারায়ণী। ক্ষেত্রমণি আর ইহলোকে নাই। সে একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিল। তাহার অভিনয় কার্য্য এত স্বাভাবিক ছিল যে লোকে আশ্চর্য্য হইত, তাহার স্থান আর কখন পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ! "বিবাহ-বিভ্রাটে" ঝীর অংশ অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং "ছোটলাট টমসন" বলিয়াছিলেন যে এ রকম অভিনেত্রী আমাদের বিলাতেও অভাব আছে। চৌরঙ্গীর কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে এক সময় অনেক বড বড সাহেব ও বাঙ্গালীর অধিবেশন হইয়াছিল, সেই খানেই আমাদের থিয়েটারে "বিবাহ-বিভ্রাট" অভিনয় হয়, তাহার অভিনয় ছোট লাটসাহেব দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহাশয় অধিক আর বলিতে সাহস

হইতেছে না। যে হেতু সেই গত জীবনের নিরস ও বাজে কথা শুনিতে হয় তো আপনার বিরক্তি জন্মিতে পারে, সেইজন্য এইখানে বন্ধ করিলাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আমি অতি অল্প সময় মধ্যেই তাঁহাদের ন্যায় সমান অংশ অভিনয় করিতে পারিতাম।

দ্বিতীয় পল্লব

র ঙ্গা ল য়ে

মহাশয় !

আপনার যে এখনও আমার জীবনের দুঃখময় কাহিনী শুনিতে ধৈর্য্য আছে, ইহা কেবল আমার উপর মহাশয়ের অপরিমিত স্নেহের পরিচয়।

আপনি ছত্রে ছত্রে বলিতেছেন যে, প্রতি চরিত্র অভিনয়ে আমি মানুষের মনে দেবভাব অঙ্কিত করিয়াছি। দর্শক অভিনয় দর্শনে আনন্দ করিয়াছেন ও মনঃসংযোগে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু কিরূপে তাঁহাদেব হৃদয়ে দেব-ছবি অঙ্কিত করিযাছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অবকাশ হয তবে বুঝাইয়া দিবেন। এক্ষণে যদি ধৈর্য্য থাকে তবে আমার নাটকীয় জীবন শুনুন।

আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। সে স্থান যদিও আমার বিশেষ স্মরণ নাই, তবুও অল্প অল্প মনে পড়ে। বড়ই রমণীয় স্থান ছিল, একেবারে গঙ্গার উপরে বাড়ী ও বারান্দা, নীচে গঙ্গার বড় বাঁধান ঘাট, দুই ধারে অন্তিমপথ-যাত্রীদিগের বিশ্রাম ঘর। সেই বালিকা কালের সেই রমণীয় ছবি দূর স্মৃতির ন্যায় এখনও আমার মনোমধ্যে জাগিয়া আছে, কেমন গঙ্গা কুল কুল করিযা বহিয়া যাইত। আমি সেই টানা-বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া খেলিযা বেড়াইতাম। আমার মনে কত আনন্দ, কত সুখ-স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিত। বালিকা বলিয়াই হউক, কিম্বা শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়াই হউক, সকলে আমাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন। আমরা যে তখন বড় গরীব ছিলাম, তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ নিজের একটী বসত বাটী ছাড়া ভাল কাপড় জামা বা অন্য দ্রব্যাদি কিছুই ছিল না। সেই সময়ে “রাজা” বলিয়া যে প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন, তিনি আমায় ছোট হাত-কাটা দুটী ছিটের জামা তৈয়ারী করাইয়া দেন। তাহা পাইয়া আমার কত যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই জামা দুইটীই আমার শীতের সম্বল ছিল।

সকলে বলিত যে এই মেয়েটীকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলে বোধ হয় খুব কাজের লোক হইবে। তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৺অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। আর বোধ হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও গোপালবাবু, ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় "বেণী-সংহার" পুস্তকে একটা ছোট পার্ট দিলেন, সেটা দ্রৌপদীর একটী সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা। তখন বই প্রস্তুত হইলে, নাট্যমন্দিরে গিয়া ড্রেস-রিহার্সাল দিতে হইত। যে দিন উক্ত বই এর ড্রেস-রিহার্সাল হয়, সে দিন আমার তত ভয় হয় নাই, কেননা—রিহার্সাল বাড়ীতেও যাহারা দেখিত, সেখানেও প্রায় তাহারাই সকলে এবং দুই চারিজন অন্য লোকও থাকিত।

কিন্তু যে দিন পার্ট লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে ষ্টেজে বাহির হইতে হইল, সে দিন হৃদয়ভাব ও মনের ব্যাকুলতা কেমন করিয়া বলিব। সেই সকল উজ্জ্বল আলোকমালা, সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, পা দুটীও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আর চক্ষের উপর সেই সকল উজ্জ্বল দৃশ্য যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভিতর হইতে অধ্যক্ষেরা আমায় আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ভয়, ভাবনা ও মনের চঞ্চলতার সহিত কেমন একটা কিসের আগ্রহও যেন মনের মধ্যে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহা কেমন করিয়া বলিব? একে আমি অতিশয় বালিকা, তাহাতে গরীবের কন্যা, কখনও এরূপ সমারোহ স্থানে যাইতে বা কার্য্য করিতে পাই নাই। বাল্যকালে কতবার মাতার মুখে শুনিতাম ভয় পাইলে হরিকে ডাকিও, আমিও ভয়ে ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, যে কয়টী কথা বলিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের শিক্ষানুযায়ী সুচারুরূপে ও সেইরূপ ভাবভঙ্গীর সহিত বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিতে লাগিলেন। ভয়েই হউক, আর উত্তেজনাতেই হউক, আমার তখনও পা

কাঁপিতেছিল। ভিতরে আসিতে অধ্যক্ষেরা কত আদর করিলেন। কিন্তু তখন করতালির কি মর্ম্ম তাহা জানিতাম না। পরে সকলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে আনন্দে করতালি দিয়া থাকেন। ইহার কিছুদিন পরেই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় হরলাল রায়ের "হেমলতা" নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমার পার্ট শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া সকলে বলিত যে এই মেয়েটী হেমলতার পার্ট ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে। এই সময় আর একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেইসঙ্গে মদনমোহন বর্ম্মণ অপেরা মাষ্টার হইয়া থিয়েটারে যোগ দিলেন। উক্ত অভিনেত্রীর নাম কাদম্বিনী দাসী। বহুদিন যাবৎ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাদম্বিনী অভিনয় কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অবসরপ্রাপ্তা। এই "হেমলতা" অভিনয় শিক্ষা দিবার সময় আমার হৃদয় যেন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি যখন কার্য্য স্থান হইতে বাড়ীতে আসিতাম, সেই সকল কার্য্য আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাব ভঙ্গি সকল দেখাইয়া দিতেন, সেই সকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারিদিকে ঘেরিয়া থাকিত। আমি যখন বাড়ীতে খেলা করিতাম তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তি দ্বারা সেই দিকেই আচ্ছন্ন থাকিতাম। বাড়ীতে থাকিতে মন সরিত না, কখন আবার গাড়ী আসিবে, কখন আমায় লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত। যদিও তখন আমি ছোট ছিলাম, তবুও মনের ভিতর কেমন একটা উৎসাহপূর্ণ মধুর ভাব ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার পর যখন আমার শিক্ষা শেষ হইয়া অভিনয়ের দিন আসিল, তখন আর প্রথমবারের মত ভয় হইল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। সে দিন আমি রাজকন্যার অভিনয় করিব কিনা— তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল পোষাক দেখিয়া ভারি আমোদ হইল। তেমন পোষাক পরা দূরে থাক্, কখন চক্ষেও দেখি নাই। যাহা হউক, ঈশ্বরের দয়াতে আমি "হেমলতা"র পার্ট সুচারুরূপে অভিনয় করিলাম। তখন হইতে লোকে বলিত যে "ইহার উপর ঈশ্বরের দয়া আছে।" আর আমারও এখন বেশ মনে হয়, যে আমার ন্যায় এমন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বালিকা ঈশ্বর অনুগ্রহ ব্যতীত কেমন করিয়া সেরূপ দুরূহ কার্য্য সমাপন করিয়াছিল। কেননা আমার কোন গুণ ছিল না। তখন ভাল লেখাপড়াও জানিতাম না, গান ভাল জানিতাম না। তবে শিখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল।

সেই সময় হইতে আমি প্রায় প্রধান পার্ট অভিনয় করিতে বাধ্য হইতাম। আমার অগ্রবর্ত্তী অভিনেত্রীগণ যদিও আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের বয়সে সমান না হইলেও অল্পদিনে কাজে তাঁহাদেব সমান হইয়া ছিলাম। ইহার কয়েক মাস পরেই "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার কোম্পানী পশ্চিম অঞ্চলে থিযেটার করিতে বাহির হন, এবং আমার আব পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ করেন। পশ্চিমে থিযেটার করিবার সময় ছ'একটি ঘটনা শুনুন,—যদিও সে ঘটনা শুধু আমার সম্বন্ধে নয় তবুও তাহা কৌতূহলকর।

একবাত্রি লক্ষ্ণৌ নগরে ছত্রমণ্ডিতে আমাদের "নীলদর্পণ" অভিনয় হইতেছিল, সেই দিন লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিযা ছিলেন। যে স্থানে বোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির উপব অবৈধ অত্যাচার কবিতে উদ্যত হইল, তোরাপ দবজা ভাঙ্গিয়া রোগ সাহেবকে মারে, সেই সময় নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়া চলিযা যায়। একে তো "নীলদর্পণ" পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় হইতেছিল, তাহাতে বাবু মতিলাল সুর—তোরাপ, অবিনাশ কর মহাশয়—মিষ্টার রোগ সাহেবের অংশ অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে ছিলেন। ইহা দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পড়িল এবং একজন সাহেব দৌড়িয়া একেবাবে স্টেজের উপর উঠিযা তোরাপকে মারিতে উদ্যত! এইরূপ কারণে আমাদের কান্না, অধ্যক্ষদিগেব ভয়, আর ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুব মহাশয়ের কাঁপুনি!! তারপর অভিনয় বন্ধ করিয়া, পোযাক আস্‌বাব বাঁধিয়া ছাঁদিয়া বাসায় এক রকম পলায়ন!! পরদিন প্রাতেই লক্ষ্ণৌ নগর পরিত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়েন!!!

ইহার পরে আমরা যদিও অনেক স্থানে গিয়াছিলাম কিন্তু সব কথা আমার মনে নাই, তবে দিল্লীতে মাছির ঘর, বিছানা ব্যতীত কিছুই দেখা যাইত না! এবং সেই প্রথম ভিস্তির জলে স্নান করিতে আমার আপত্তি, মাতার ক্রমাগত রোদন দেখিয়া, আমার মাকে একটী ইঁদারার জল নিজ হাতে তুলিয়া স্নান আহার করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়ায় সন্তুষ্ট হইলেন। আর আমাদের ভিস্তির জলই বন্দোবস্ত। দিল্লীতে আর একটী ঘটনা হয় তাহা ক্ষুদ্র হইলেও আমার বেশ মনে আছে। দিল্লীর বাড়ীর খোলা ছাদে আমি একদিন ছুটাছুটী

করিয়া খেলা করিতে ছিলাম। কি কারণে মনে নাই, কাদম্বিনীর তাহা অসহ্য হওয়ায় আমার হাত ধরিয়া আমার গালে দুই চড মারেন, সেই দিন আমরা মায়ে ঝীয়ে সারাদিন কাঁদিয়া ছিলাম। মা আমার মনের দুঃখে কিছু খান নাই, আমিও মাযের কাছে সমস্ত দিন বসিযা ছিলাম, শেযে বৈকালে থিয়েটাবের বাবুরা আমায় জোর করাইয়া আহার করান। আমার মা কিন্তু সে দিন কিছুই আহার করিলেন না। একে তো দিল্লী সহরে মুসলমানের বাডাবাডি দেখিযা মা আমার ক্রমাগতই কাঁদিতেন, কি কবিবেন, একে আমরা গরীব তাহাতে আমি বালকা, যদিও কর্ত্তৃপক্ষেরা যত্ন করিতেন, তবুও বড অভিনেত্রাবা নিজের গণ্ডা নিজে বুঝিযা লইতেন, আমাব দয়ার উপর নির্ভর ছিল। আর কি কাবণে জানিনা, সকলের অপেক্ষা কাদম্বিনী যেন কিছু অহঙ্কতা ছিলেন, আমার উপর কেমন তার দ্বেষ ছিল, প্রায়ই দূর ছাই করিতেন। তারপর বোধ হয় আমাদেব লাহোরে যাইতে হয। লাহোরে আমাদের বেশী দিন থাকিতে হয়, সেখানে অনেকগুলি বই অভিনয় হইয়াছিল। আমি নানা রকম পার্ট অভিনয় কবিযা ছিলাম। "সতী কি কলঙ্কিনী"তে রাধিকা, "নবীন তপস্বিনী"তে কামিনী, "সধবার একাদশী"তে কাঞ্চন, "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে ফতি—কত বলিব। তবে বলিযা রাখি যে, সে সময় আমার এত অল্প বযস ছিল যে বেশ করিবার সময় বেশকারীদের বড ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইত। আমার মত একটী বালিকাকে কিশোর বযস্কা বা সময় সময় প্রায় যুবতীর বেশে সজ্জিত কবিতে তাহারা সময়ে সমযে বিরক্ত হইত—তাহা বুঝিতাম। আবার কখন কখন সকলে তামাসা করিয়া বালত যে "তোকে কামার দোকানে পাঠাইযা দিয়া পিটিযা একটু বড় করিয়া আনাইব।" লাহোরে যখন আমরা অভিনয় করি, তখন আমার সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেখানে গোলাপ সিংহ বলিযা একজন বড জমীদার মহাশয়ের খেযাল উঠিল, যে তিনি আমায় বিবাহ করিবেন এবং যত টাকা লইয়া আমাব মাতা সন্তুষ্ট হন তাহা দিবেন। পূর্ব্বোক্ত জমীদার মহাশয় অর্দ্ধেন্দুবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবুকে বডই পিডাপীডি করিযা ধরিলেন। তখন উঁহারা বডই মুস্কিলে পডিলেন। তিনি নাকি সেখানকার একটী বিশেষ বডলোক। একে বিদেশ—উপরান্ত এই সকল কথা শুনিয়া আমার মা তো কাঁদিযাই আকুল। আমিও ভয়ে একেবারে কাঁটা। এই উপলক্ষে আমাদের শীঘ্রই লাহোর ছাডিতে হয়। ফিরিবার সময় আমরা ৺শ্রীশ্রী বৃন্দাবন ধাম দিয়া আসিয়া ছিলাম।

৺শ্রীবৃন্দাবন ধামে আবার আমি একটী বিশেষ ছেলে মানুষি করিয়া ছিলাম। তাহা এই :—

থিয়েটার কোম্পানী সেই দিন ৺শ্রীধামে পৌছিয়া চল্লিশ জন লোকেব জলখাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তাঁহারা ৺শ্রীজীউদিগেব দর্শন করিতে গেলেন এবং আমাকে বলিয়া যান যে "তুমি ছেলে মানুষ, এখনই এই গাডীতে আসিলে, এখন জল খাইয়া ঘবের দবজা বন্ধ কবিয়া থাক। আমবা দেবতা দর্শন করিযা আসি।" আমি বাসায় দরজা বন্ধ করিযা রহিলাম। তাঁহারা সকলে ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন জন্য চলিযা গেলেন। আমাব একটু রাগ ও দুঃখ হইল বটে, কিন্তু কি করিব? মনের ক্ষোভ মনেই চাপিযা রহিলাম। ঘরের দরজা দিযা বসিয়া আছি, এমন সময একটা বাঁদর আসিয়া জানালার কাঠ ধরিয়া বসিল। আমি বালিকা-স্থলভ-চপলতা বশতঃ তাহাকে একটী কাঁকডি খাইতে দিলাম, সে খাইতেছে এমন সময় আর দুইটা আসিল, আমি তাহাদেরও কিছু খাবার দিলাম, আবার গোটা দুই আসিল, আমি মনে ভাবিলাম যে ইহাদের কিছু কিছু খাবার দিলে সকলে চলিয়া যাইবে। সেই ঘরের চার পাঁচটী জানালা, আমি যত আহার দিই, ততই জানালায়, ছাদে, বারান্দায় বাঁদরে বাঁদরে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমার বড ভয় হইল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যত খাবাব ছিল প্রায় তাব সকলই তাহাদের দিতে লাগিলাম। আর মনে করিতে লাগিলাম যে এই বারেই তারা চলিয়া যাইবে। কিন্তু যত খাবাব পাইতে লাগিল, বানরের দল তত বাডিতে লাগিল। আব আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাদেব ক্রমাগত আহার দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কোম্পানীর লোক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—ছাদ, বারান্দা, জানালা সব বানরে ভরিযা গিয়াছে। তাঁহারা লাঠি ইত্যাদি লইযা তাহাদের তাডাইযা দিয়া আমায় দবজা খুলিতে বলিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে দরজা খুলিযা দিলাম। তাঁহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সকল কথা তাঁহাদের বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া আমার মা আমায় দুটী চড মারিলেন ও কত বকিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি যে অত ক্ষতি কবিয়াছিলাম, তবু কোম্পানীর সকলে হাসিয়া মাকে মারিতে নিযেধ করিলেন ; বলিলেন যে "মারিও না, ছেলে মানুষ ও কি জানে? আমাদের দোষ, সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেই হইত!" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন "বোকা মেয়ে আমাদের সকল খাবার বিলাইয়া ব্রজবাসীদিগের ভোজন করাইলি, এখন আমরা কি খাই বল্ দেখি?"

আবার জলখাবার খরিদ করিয়া আনা হইল, তবে তাঁহারা জল খাইলেন। ঐ কথা লইয়া নীলমাধববাবু আমায় দেখা হইলেই এখনও তামাসা করিয়া বলিতেন যে "৺বৃন্দাবনে গিয়া বাঁদর ভোজন করাবি বিনোদ!" নীলমাধব চক্রবর্ত্তী বঙ্গীয় নাট্যজগতে বিশেষ সুপরিচিত! সকলেই তাঁহার নাম জানেন। তিনিও আমাদের সঙ্গে পশ্চিমে ছিলেন, তিনিও আমায় অতিশয় যত্ন করিতেন। দিল্লীতে যখন সব একট্রেসরা চাদর, জামা, কাপড় নিজ নিজ পয়সায় খরিদ করেন, আমার পয়সা ছিল না বলিয়া কিনিতে না পারায় তিনি আমায় একখানি ফুল দেওয়া চাদর ও কাপড় কিনিয়া দেন। সেই তখনকার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার স্নেহের জিনিষ আমার কতদিন ছিল। আর একটী প্রথম উপহার, একটী অকৃত্রিম স্নেহময় বন্ধুর প্রদত্ত আমার বড় আদরের হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর ডাক্তার মহাশয় তিনি একটী ঢাকার গঠিত রূপার ফুল ও খেলিবার একটী কাঁচের ফুলের খেলনা আমায় দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্নেহময় উপহার আমার সেই বালিকা কালে বড়ই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। নিঃস্বার্থ স্নেহে বশীভূত হইয়া আমি এখনও তাঁ'র দয়া অনুগ্রহ দ্বারা ও দায় বিদায়ে রোগে শোকে সান্ত্বনা পাইয়া থাকি। তাঁহার অকৃত্রিম অনুগ্রহে আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী। এই বহু সম্মানিত ডাক্তারবাবু মহাশয় এই অভাগিনীর চির ভক্তির পাত্র। এই রূপেই আমার বাল্যকালের নাট্যজীবন।

ইহার পর আমরা কলিকাতা চলিয়া আসি। তার পর বোধহয় পাঁচ ছয় মাস পরে "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে আমি মাননীয় ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে ২৫৲ পচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। তখনও যদিচ আমি বালিকা কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কার্য্য-তৎপরা এবং চালাক চটপটে হইয়া ছিলাম। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ। এইখান হইতেই আমার অভিনয় কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রথম সোপান। সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাননীয় স্বর্গগত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অতুলনীয় স্নেহ মমতা। তিনি আমায় এত অধিক যত্ন করিতেন, বোধহয় নিজ কন্যা থাকিলেও এর অধিক স্নেহ পাইত না।

মহাশয়ের আমার উপর অসীম করুণা ছিল, সেই কারণে বলিতে সাহস করিতেছি। যদি অনুমতি করেন তবে বেঙ্গল থিয়েটারে যে কয়েক বৎসর অভিনয় কার্য্য করিয়া ছিলাম, সেই সময়ের ঘটনাগুলি বিবৃত করি।

বেঙ্গল থিয়েটারে

কৈশোরে পদার্পণ করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারেব অধ্যক্ষ পূজনীয় ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হই। ঠিক মনে পড়ে না, কি কাবণবশতঃ আমি "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার ত্যাগ করি। এই বেঙ্গল থিয়েটারই আমার কার্য্যের উন্নতির মূল, এই স্থানে ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রধান প্রধান ভূমিকা অভিনয় কবিতে আবম্ভ করি। মাননীয় শরৎবাবু আমায় কন্যাব ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার অসীম স্নেহ ও গুণের কথা আমি একমুখে বলিতে পাবি না। প্রসিদ্ধা গায়িকা বনবিহাবিণী (ভুনি), সুকুমাবী দত্ত (গোলাপী) ও এলোকেশী সেই সময "বেঙ্গলে" অভিনেত্রী ছিলেন। তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্য নাটকাকাবে পবিবর্ত্তিত হইয়া অভিনযার্থে প্রস্তুত হইতে ছিল। আমি উক্ত "মেঘনাদ বধ" কাব্যে সাতটী পার্ট একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছিলাম। ১ম চিত্রাঙ্গদা, ২য় প্রমীলা, ৩য় বারুণী, ৪র্থ রতি, ৫ম মায়া, ৬ষ্ঠ মহামায়া, ৭ম সীতা। বঙ্কিমবাবুব "মৃণালিনীতে" মনোরমা অভিনয়ই করিতাম এবং "দুর্গেশনন্দিনীতে" আযেশা ও তিলোত্তমা এই দুইটি ভূমিকা প্রয়োজন হইলে দুইটিই একরাত্রি একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছি। কারাগারের ভিতর ব্যতীত আয়েষা ও তিলোত্তমার দেখা নাই। কারাগারে তিলোত্তমার কথাও ছিল না অন্য একজন তিলোত্তমাব কাপড় পবিয়া কারাগারে গিযা "কে-ও – বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা?" জগৎ সিংহের মুখে এইমাত্র কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। আর সেই সময়েই আয়েষার ভূমিকার শ্রেষ্ঠ অংশ ওস্মানের সহিত অভিনয়! এই অতি সঙ্কুচিতা ভীরু-স্বভাবা রাজকন্যা তিলোত্তমা, তখনি আবার উন্নত-হৃদয়া-গর্ব্বিণী অপরিসীম হৃদয়-বলশালিনী প্রেমপরিপূর্ণা নবাব পুত্রী আয়েষা! এইরূপ দুইভাগে নিজেকে বিভক্ত কবিতে কত যে উদ্যম প্রয়োজন তাহা বলিবার নহে। ইহা যে প্রত্যহ ঘটিত তাহা নহে, কার্য্যকালীন আকস্মিক অভাবে এইরূপে কয়েকবার অভিনয় করিতে হইয়াছিল।

একদিন অভিনয় রাত্রিতে আয়েষা সাজিবার জন্য গৃহ হইতে সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া অভিনয় স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, যিনি "আসমানির" ভূমিকা অভিনয় করিবেন তিনি উপস্থিত নাই। রঙ্গালয় জনপুর্ণ! কর্ত্তৃপক্ষগণের ভিতব চুপি চুপি কথা হইতেছে—"কে বিনোদকে 'আসমানির' পার্ট অভিনয় করিতে বলিবে? উপস্থিত বিনোদ ব্যতীত অন্য কেহই পারিবে না!" আমি বাটী হইতে একেবারে আয়েষার পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি বলিয়া ভরসা করিয়া কেহই বলিতেছেন না। এমন সময় বাবু অমৃতলাল বসু আসিয়া অতি আদর করিযা বলিলেন, "বিনোদ! লক্ষ্মী ভগ্নিটী আমার! আসমানি যে সাজিবে তাহার অসুখ করিয়াছে, তোমায় আজ চালাইয়া দিতে হইবে, নতুবা বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি।" যদিও মুখে অনেকবার "না—পারিব না" বলিযা ছিলাম বটে, আর বাস্তবিক সেই নবাব পুত্রীর সাজ ছাড়িয়া তখন দাসীর পোষাক পরিতে হইবে, আবার "আয়েষা" সাজিতে অনেক খুঁত হইবে বলিয়া মনে মনে বড রাগও হইযাছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের কথামত কার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয করিবার সময় "ইংলিসম্যান", "ষ্টেটস্ম্যান" ইত্যাদি কাগজে আমায কেহ "সাইনোরা" কেহ কেহ বা "ফ্লাওযার অব দি নেটিভ ষ্টেজ" বলিয! উল্লেখ করিতেন। এখনও আমার পূর্ব্ব বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা বলেন, যে "সাইনোরা" ভাল আছ তো!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই থিয়েটারে বঙ্কিম বাবুব "মৃণালিনী" অভিনীত হইত। তাহার অভিনয় যেরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তখনকার বা এখনকার কোন রঙ্গালয়ে এ পুস্তকের এরূপ অভিনয বোধহয় কোথাও হয নাই। এই মৃণালিনীতে হরি বৈষ্ণব—হেমচন্দ্র, কিরণ বাঁড়ুয্যে—পশুপতি, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত)—গিরিজায়া, ভুনী—মৃণালিনী এবং আমি—মনোরমা!

আর গোটাকয়েক কথা বলিয়া বেঙ্গল থিয়েটার সম্বন্ধে কথা শেয করিব। একবার আমরা সদলবলে চুয়াডাঙ্গা যাই, আমাদের জন্য একখানি গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সকলে একত্রে যাইতেছি! মাস—স্মরণ নাই, মাঝখানে কোন্ স্টেশনে তাও মনে নাই, তবে সে যে একটী বড স্টেশন সন্দেহ নাই। সেইস্থানে নামিয়া "উমিচাঁদ" বলিয়া ছোটবাবু মহাশয়ের একজন আত্মীয় (আমরা মাননীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ছোটবাবু বলিয়া ডাকিতাম) ও আর দুই চারিজন একটার আমাদের কোম্পানীর জন্য খাবার আনিতে গেলেন। জলখাবার, পাতা. ইত্যাদি লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন, উমিচাঁদ বাবুর

আসিতে দেরী হইতে লাগিল। এমন সময় গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, ছোটবাবু মহাশয় গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া "ওহে উমির্চাদ শীঘ্র এস – শীঘ্র এস – গাড়ী যে ছাড়িল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময় গাড়ীও একটু একটু চলিতে লাগিল, ইত্যবসরে দৌড়িয়া উমির্চাদ বাবু গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ীও জোরে চলিল। এমন সময় উমির্চাদ বাবু অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ছোটবাবু মহাশয় ও অন্যান্য সকলে "সর্দিগরমি হইয়াছে, জল দাও জল দাও" করিতে লাগিলেন, চারুচন্দ্র বাবু ব্যস্ত হইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন দুর্দৈব যে সমস্ত গাড়ীখানার ভিতর একটী লোকের কাছে, এমন কি এক গণ্ডুষ জল ছিল না, যে সেই আসন্ন – মৃত্যুমুখে পতিত লোকটীর তৃষ্ণার জন্য তাহা দেয়। "ভুনি" তখন সবে মাত্র বেঙ্গল থিয়েটারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার কোলে ছোট মেয়ে, সে সময় অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া আপনার স্তন্য দুগ্ধ একটী ঝিনুকে করিয়া লইয়া উমির্চাদের মুখে দিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। বোধহয় ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। গাড়ী শুদ্ধ লোক একেবারে ভয়ে ভাবনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ছোটবাবু মহাশয় উমির্চাদের বুকে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি একে বালিকা, তাহাতে ওরকম মৃত্যু কখন দেখি নাই, ভয়ে মাতার কোলের উপর শুইয়া পড়িলাম। উমির্চাদ বাবুর মৃত্যুকালীন সেই মুখভঙ্গী আমার মনোক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল। আমার অবস্থা দেখিয়া চারুবাবু মহাশয় ছোট বাবুকে বলিলেন, "শরৎ থাম, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যদি রেলের লোক এ ঘটনা জানিতে পারে, গাড়ী কাটিয়া দিবে, এত লোকজন লইয়া রাস্তার মাঝে আর এক বিপদ হইবে।" ছোটবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি উমির মা'কে গিয়া কি বলিব? সে আসিবার কালীন উমির্চাদ সম্বন্ধে কত কথা যে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল।" (উমির্চাদ বাবু মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন)। যাক্ এই রকম ভয়ানক বিপদ ঘাড়ে করিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় চুয়াডাঙ্গায় নামিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা, সেখানের স্টেশন মাস্টারকে বলা হইল যে এই আগের স্টেশনে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। তারপর আমরা বাসায় গিয়া যে যেখানে পাইলাম, অবসন্ন হইয়া সে রাত্রে শুইয়া পড়িলাম। ছোটবাবু ও দুই চারিজন অভিনেতা শব দাহ করিতে যাইলেন। সেখানে তিন দিন থাকিয়া অভিনয় কার্য্য সারিয়া সকলে অতি বিষণ্ণ ভাবে কলিকাতায় ফিরিলাম। এই শোকপূর্ণ ঘটনাটি কোন যোগ্য লেখকের দ্বারা বর্ণিত হইলে সে ভীষণ ছবি কতক পরিমাণে পরিস্ফুট হইত।

আর একবার একটী ঘোর বিপদে পড়ি। সেও বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত সাহেবগঞ্জ না কোথায় একটী জঙ্গলা দেশে যাইতে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে কতকটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাতী ও গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। ৪টী হাতী ও কয়েকখানি গোরুর গাড়ী আমাদের জন্য প্রেরিত হয়। যাহারা যাহারা গোরুর গাড়ীতে যাইবে, তাহারা তিনটার সময় চলিয়া গেল। আমি ছেলে মানুষির ঝোঁকে বলিলাম, যে "আমি হাতীর উপর যাইব।" ছোটবাবু মহাশয কত বারণ করিলেন। কিন্তু আমি হাতি কখন দেখি নাই! চড়া তো দূরের কথা! ভারি আমোদ হইল, আমি গোলাপকে বলিলাম, 'দিদি আমি তোমার সঙ্গে হাতীতে যাইব।" গোলাপ বলিল, "আচ্ছা,—যাস্।" সে আমায় তার সঙ্গে রাখিল। মা বকিতে বকিতে আগে চলিযা গেলেন। আমরা সন্ধ্যা হয় এমন সময় হাতীতে উঠিলাম। আমি, গোলাপ ও আব দুইজন পুরুষ মানুষ একটাতে, আব চাবিজন কবিযা অপব তিনটাতে। কিছু দূর গিযা দেখি, এমন রাস্তা তো কখন দেখি নাই। মোটে এক হাত চওড়া রাস্তা। আর দুইধারে বুক পর্য্যন্ত বন। ধান গাছ কি অন্য গাছ বলিতে পাবি না—আব জল। ক্রমে যতই রাত্রি হইতে লাগিল ততই বৃষ্টি চাপিযা আসিল, আব সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আরম্ভ হইল। হাতী তো ফর্ ফর্ করিতে লাগিল। শেষে সকলকে বেত বনের মধ্যে লইযা ফেলিল। তাব উপব শিলা বৃষ্টি! হাতীর উপর ছাউনী নাই, সেই জল, ঝড়, মেঘ গর্জ্জন, তার উপর শিলা বর্ষণ, আমি কেঁদেই অস্থির। গোলাপও কাঁদিতে লাগিল। শেষে হাতী আর এগোয না। শুঁড় মাথাব উপর তুলিয়া আগের পা বাড়াইযা ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবাব তখন মাহুত বলিল, যে বাঘ বেরিয়েছে তাই হাতী যাইতেছে না।" মাহুত চারিজন হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। আমি তো আড়ষ্ট, আমার হাতী চড়ার আমোদ মাথায় উঠিয়াছে। ভয়ে কেঁদে কাঁপিতে লাগিলাম, পাছে হাতীর উপর হইতে পড়িয়া যাই বলিয়া একজন পুরুষ মানুষ আমায় ধরিয়া রহিল। তাহার পর কত কষ্টে প্রায আধমরা হইযা আমবা কোন রকমে বাসায় পৌঁছিলাম। জলে শীতে আমরা এমনি অসাড় হইযা গিয়াছিলাম, যে হাতী হইতে নামিবারও ক্ষমতা ছিল না! ছোট-বাবু নিজে ধরিযা নামাইয়া নিযা আগুন করিয়া আমার সমস্ত গা সেঁকিতে লাগিলেন। মা তো বকিতে বকিতে কান্না জুড়িলেন। মার বুলিই ছিল "হতচ্ছাড়া মেয়ে কোন কথা শোনে না।" সেই দিনই আমাদের অভিনয়ের কথা ছিল, কিন্তু দুর্য্যোগের জন্য ও আমাদের শারীরিক অবস্থার জন্য সেদিন বন্ধ রহিল।

আর একবার নৌকাতে বিপদে পড়িয়াছিলাম—আর একবার পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া ঝড়ের মাঝে পড়িয়া পথ হারাইয়া পাহাড়ীদের কুটীরে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করি! সেই পাহাড়ীই আবার রাস্তা দেখাইয়া দিয়া বাসায় রাখিয়া যায়।

একবার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে ঘোড়ায় চড়িয়া অভিনয় করিতে পড়িয়া গিয়া বড়ই আঘাত লাগিয়া ছিল। "প্রমীলা"ব পাট ঘোটকের উপর বসিয়া অভিনয় করিতে হইত। সেখানে মাটিব প্লাটফরম্ প্রস্তুত হইযাছিল, যেমন আমি স্টেজ হইতে বাহিরে আসিব, অমনি মাটির ধাপ ভাঙ্গিযা ঘোড়া হুমড়ি খাইযা পড়িযা গেল। আমিও ঘোড়ার উপর হইতে প্রায দুই হস্ত দূরে পতিত হইয়া অতিশয আঘাত পাইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইবাব শক্তি রহিল না। তখন আমার অভিনযের অনেক বাকী আছে—কি হইবে। চারুবাবু আমায ঔষধ সেবন করাইয়া বেশ করিয়া আমার হাঁটু হইতে পেট পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। ছোটবাবু মহাশয কত স্নেহ কবিযা বলিলেন, যে "লক্ষ্মীটি! আজিকার কার্য্যটি কষ্ট করিযা উদ্ধার কবিয়া দাও।" তাঁহার সেই স্নেহময সান্ত্বনাপুর্ণ বাক্যে আমার বেদনা অর্দ্ধেক দূব হইল। কোনরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরদিন কলিকাতায় ফিবিলাম। ইহাব পব আমি এক মাস শয্যাশাযী ছিলাম। যাহা হউক, বেঙ্গল থিযেটারে অভিনয়কালে আমি একরূপ সন্তোষে কাটাইযা ছিলাম। কেননা তখন বেশী উচ্চ আশা হয় নাই। যাহা পাইতাম তাহাতেই সুখী হইতাম। যেটুকু উন্নতি করিতে পাবিতাম, সেইটুকুও যথেষ্ট মনে করিতাম। বেশী আশাও ছিল না, অতৃপ্তিও ছিল না। সকলে বড ভালবাসিত। হেসে খেলে নেচে কুঁদে দিন কাটাইতাম।

এই সময় মাননীয় ৺কেদারনাথ চৌধুবী ও শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রায়ই বেঙ্গল থিয়েটারে যাইতেন। স্বর্গীয় কেদারবাবু আমার "কপালকুণ্ডলার" অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যে "এই মেয়েটি যেন প্রকৃত "কপালকুণ্ডলা" ইহার অভিনয়ে বন্য সরলতা উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

পরে শুনিযাছিলাম এই সময়ে গিরিশবাবু মহাশয় ছোটবাবুকে বলেন, যে "আমরা একটি থিয়েটার করিব মনে করিতেছি। আপনি যদ্যপি বিনোদকে আমাদের থিয়েটারে দেন তবে বড়ই ভাল হয়।" ছোটবাবু মহাশয় অতি উচ্চ-হৃদয়-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলিলেন, "বিনোদকে আমি বড়ই

স্নেহ করি, উহাকে ছাড়িতে হইলে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে। তথাপি আপনার অনুরোধ আমি এড়াইতে পাবি না, বিনোদকে আপনি লউন।"

তারপব ছোটবাবু মহাশয় একদিন আমায় বলিলেন, যে "কি রে বিনোদ এখান হইতে যাইলে তোর মন কেমন করিবে না?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ বিষয় লইয়া সেদিন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশযও বলিলেন, যে "ওসব কথা আমারও বেশ মনে আছে। তোমাকে বেঙ্গল থিয়েটার হইতে আনিবার পরও শরৎবাবু মহাশয আমাদের বলিয়া ৺মাইকেল মধুস্থদন দত্তের বেনিফিট নাইটের "দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষার" ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য লইয়া যান, আরও কয়েকবার লইযা গিয়াছিলেন।" যাহা হউক, সেই সময় হইতে আমি মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয়ের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার শিক্ষায আমার যৌবনের প্রথম হইতে জীবনের সার ভাগ অতিবাহিত হইযাছে।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে

যৌবনারম্ভে

আমি বেঙ্গল থিয়েটার ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ন্যাশন্যাল থিয়েটারে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হই। মাসকয়েক "মেঘনাদ বধ" "মৃণালিনী" ইত্যাদি পুরাতন নাটকে এবং "আগমনী", "দোললীলা" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্যে ও অনেক প্রহসন ও প্যাণ্টোমাইমে প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করি। সকলগুলিই প্রায় গিরিশবাবুর রচিত। ইহার পর গিরিশবাবুর ও আমার থিয়েটারের সহিত সংশ্রব শিথিল হইয়া আসে। ঐ সময় ন্যাশন্যাল থিয়েটারের দুর্দ্দশা। অল্পদিনের মধ্যেই থিয়েটার নীলামে বিক্রয় হওয়ায় প্রতাপ চাঁদ জহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী অধিকারী হইলেন। প্রতাপচাঁদ বাবুর অধীনে থিয়েটারের নাম ন্যাশন্যাল থিয়েটারই রহিল। গিরিশবাবু পুনর্ব্বার ম্যানেজার হইলেন। এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয়, স্বর্গীয় কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিরচিত "হামীর"! ইহার নায়িকার ভূমিকা আমার ছিল, কিন্তু তখন ন্যাশন্যালের দুর্নাম রটিয়াছে, অতি ধূমধামের সহিত সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া অভিনয় হইলেও অধিক দর্শক আকর্ষিত হইল না। ভাল ভাল নাটক যাহা ছিল, সব পুরাতন হইয়া গিয়াছে, নূতন ভাল নাটকও পাওয়া যায় না। "মায়াতরু" নামে একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য গিরিশবাবু রচনা করিলেন। "পলাশীর যুদ্ধের" সহিত একত্রিত হইয়া এই গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। দুই তিন রাত্রি অভিনয়ের পরেই এই ক্ষুদ্র নাটিকার যশে দর্শক আকর্ষিত হইয়া বাড়ী ভরিয়া যাইতে লাগিল। এই গীতিনাট্যে আমার "ফুলহাসির" ভূমিকা দেখিয়া "রিজ এণ্ড রায়তের" সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন, "বিনোদিনী *was simply charming*" ক্রমে গিরিশবাবুর "মোহিনী প্রতিমা", "আনন্দ রহো" দর্শক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর "রাবণ বধের" পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত না। উপরের আসন সকল প্রতিবারই পূর্ণ হইয়া যাইত, যে সকল ধনবান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা

ঘৃণা করিয়া থিয়েটারে আসিতেন না তাঁহাদের দ্বারাই দুই একদিন পূর্ব্বে টিকিট ক্রীত হইয়া অধিকৃত হইত। দিন দিন থিয়েটারের অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া একদিন সত্ত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদ বলেন, "বিনোদ তিল সমাত করন্তি।" তিল সমাত অর্থে যাদু! ক্রমে "সীতার বনবাস" প্রভৃতি নাটক চলিল। থিয়েটারের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অধীনার খ্যাতিও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

গিরিশবাবুর সহিত থিয়েটার করিতে আরম্ভ করিয়া বিডন ষ্ট্রীটের "ষ্টার থিয়েটার" শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে বরাবর কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। কার্য্য ক্ষেত্রে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমি তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা ছিলাম। তাঁহার নাটকের প্রধান প্রধান স্ত্রী চরিত্র আমিই অভিনয় করিতাম। তিনিও অতি যত্নে আমায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতেন।

• যে সময় কেদারবাবু থিয়েটার করেন, সেইসময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র মহাশয় আসিয়া অভিনয় কার্য্যে যোগ দেন। গিরিশবাবুর মুখে শুনিয়া ছিলাম, যে অমৃত মিত্র আগে যাত্রার দলে একৃট করিতেন। তাঁহার গলার সুন্দর স্বর শুনিয়া তিনি প্রথমে থিয়েটারে লইয়া আসেন। উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ইতিপূর্বে "মেঘনাদ বধ", "বিষবৃক্ষ", "সধবার একাদশী", "মৃণালিনী", "পলাশীর যুদ্ধ" ও নানা রকম বড় অথরের বই নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছিল। "মেঘনাদ বধে" অমৃতলাল রাবণ সাজেন এবং আমি এখানেও সাতটি অংশ অভিনয় করিতাম। গিরিশবাবু মেঘনাদ ও রাম, "মৃণালিনীতে" গিরিশবাবু পশুপতি, আমি মনোরমা, "দুর্গেশনন্দিনীতে" গিরিশবাবু জগত সিংহ, আমি আয়েষা, "বিষবৃক্ষে" গিরিশবাবু নগেন্দ্রনাথ, আমি কুন্দনন্দিনী, "পলাশীর যুদ্ধে" গিরিশবাবু ক্লাইব, আমি বৃটেনিয়া, অমৃত মিত্র জগৎ শেঠ ও কাদম্বিনী রাণী ভবানী। কত পুস্তকের নাম করিব। সকল পুস্তকেই আমার, গিরিশবাবুর, অমৃত মিত্রের, অমৃত বসু মহাশয়ের এই সকল বড় বড় পার্ট থাকিত। গিরিশবাবু আমাকে পার্ট অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম পার্টগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পার্ট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাটীতে বসিয়া, অমৃত মিত্র, অমৃতবাবু (ভুনীবাবু) আরো অন্যান্য লোকে মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি

সেক্সপীয়ার, মিল্‌টন, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাব-ভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য্য শিখিতে লাগিলাম। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়া পাখীর চতুবতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তি দ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়-নির্ব্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী বড় বড় এক্‌টার এক্‌ট্রেস আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবাব জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটারের অধ্যক্ষেরাও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজি থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাটী আসিলে গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেন "কি রকম দেখে এলে বল দেখি?" আমার মনে যেমন বোধ হইত, তাঁহার কাছে বলিতাম। তিনি আবার যদি ভুল হইত তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

৺কেদারবাবু প্রায় বৎসরখানেক থিয়েটার করেন, ইহার পব কৃষ্ণধন ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া দুই ভাই কয়েকমাস থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব করেন। তাহার পর কাশীপুরের প্রাণনাথ চৌধুরীর বাটীর শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়া একব্যক্তি ছয় মাস কি আট মাস এই থিয়েটারেব প্রোপ্রাইটার হন। এই সকল থিয়েটারেই গিরিশবাবু মহাশয় ম্যানেজার ও মোশান মাস্টার ছিলেন। কিন্তু সকল প্রোপ্রাইটারই স্ব স্ব প্রধান, গিবিশবাবু আফিসের কার্য্য করিয়া থিয়েটারে অধিক সময় দিতে পাবিতেন না। ইহাতে এত বিশৃঙ্খলা হইত যে ব্যবসা বুদ্ধিহীন আমোদপ্রিয় প্রোপ্রাইটারেরা শেষে থলি ঝাড়া হইয়া শূন্য হস্তে ইন্‌সল্‌ভেণ্টের আসামী হইয়া থিয়েটার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। তত্রাচ আমার বেশ মনে পড়ে যে সে সময় প্রতি রাত্রেই খুব বেশী লোক হইত ও এমন সুন্দররূপ অভিনয় হইত যে লোকে অভিনয় দর্শনে মোহিত হইয়া একবাক্যে বলিত যে আমরা অভিনয় দর্শন করিতেছি কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা বোধ করিতে পারিতেছি না। এত বিক্রয় সত্ত্বেও যে কেন সব ধনী সন্তানেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। লোকে বলিত যে এই যায়গাটা হানা যায়গা। এই স্থানের ভূমিখণ্ড কাহাকেও অনুকূল নহে।

গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ গুণে আমি যখন স্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি

অন্য কেহ! আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র। কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত। আমার এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমায় বড়ই ভালবাসিতেন ও অতিশয় স্নেহ মমতা করিতেন। কেহবা কন্যার ন্যায় কেহবা ভগ্নীর ন্যায়, কেহবা সখীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আমিও তাঁহাদের যত্নে ও আদরে তাঁহাদের উপর প্রবল স্নেহের অত্যাচার করিতাম। যেমন মা বাপের কাছে আদরের পুত্র কন্যারা বিনা কারণে আদর আবদারের হাঙ্গামা করিয়া তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত করে, ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট যেমন কোলের ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলি মিছামিছি ঝগড়া আবদার করে, আমারও সেইরকম স্বভাব হইয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে নানারকমের উচ্চচরিত্র অভিনয় দ্বারা আমার মন যেমন উচ্চদিকে উঠিতে লাগিল, আবার নানারূপ প্রলোভনের আকাঙ্ক্ষাতে আকৃষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে আত্মহারা হইবার উপক্রম হইত।

আমি ক্ষুদ্র দীন দরিদ্রের কন্যা, আমার বল বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র। এদিকে আমার উচ্চবাসনা আমার আত্মবলিদানের জন্য বাধা দেয়, অন্যদিকে অসংখ্য প্রলোভনের জীবন্ত চাকচিক্য মূর্ত্তি আমায় আহ্বান করে। এইরূপ অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-হৃদয়-বল কতক্ষণ থাকে? তবুও সাধ্যমত আত্মদমন করিতাম। বুদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে আত্মরক্ষা না করিলেও কখনও অভিনয় কার্য্যে অমনোযোগী হই নাই। অমনোযোগী হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার জীবনের সার সম্পদ ছিল। পার্ট অভ্যাস, পার্ট অনুযায়ী চিত্রকে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে সেই সকল প্রকৃতির আকৃতি মনোমধ্যে স্থাপিত করিয়া তন্ময়ভাবে সেই মনাঙ্কিত ছবিগুলিকে আপনার মধ্যে মিলাইয়া মিশাইয়া দেখা, এমন কি সেইভাবে চলা, ফেরা, শয়ন, উপবেশন যেন আমার স্বভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল।

আমার অন্য কথা বা অন্য গল্প ভাল লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন, আমার তাহাই ভাল লাগিত। মিসেস সিড্‌নিস্ যখন থিয়েটারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া, দশবৎসর বিবাহিতা অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন সমালোচক কোন স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিল, কোন অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী ইত্যাদি পুস্তক হইতে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। কোন্ একট্রেস বিলাতে

বনের মধ্যে পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত, তাহাও বলিতেন। এলেণ্টারি কিরূপ সাজ-সজ্জা করিত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন হ্যামলেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' কোন্ পুস্তকেব ছায়াবলম্বনে লিখিত, 'রজনী' কোন্ ইংরাজী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম কত বলিব গিরিশবাবু মহাশযের ও অন্যান্য স্নেহশীল বন্ধুগণের যত্নে ইংরাজী, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মানি প্রভৃতি বড বড অথবেব কত গল্প যে আমি শুনিযাছি, তাহা বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম। এই কাবণে আমাব স্বভাব এমন হইযা গিযাছিল যে যদি কখন কোন উদ্যান ভ্রমণ কবিতে যাইতাম, সেখানকার ঘর বাডী আমার ভাল লাগিত না, আমি কোথায় বন-পুষ্প শোভিত নির্জ্জন স্থান তাহাই খুঁজিতাম। আমার মনে হইত যে আমি বুঝি এই বনেব মধ্যে থাকিতাম, আমি ইহাদের চিবপালিত! প্রত্যেক লতাপাতায সৌন্দর্য্যের মাখামাখি দেখিযা আমার হৃদয় লুটাইযা পডিত। আমার প্রাণ যেন আনন্দে নাচিযা উঠিত! কখন কোন নদীতীরে যাইলে আমার হৃদয় যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ভরিযা যাইত, আমার মনে হইত আমি বুঝি এই নদীব তবঙ্গে তরঙ্গেই চিরদিন খেলা করিয়া বেডাইতাম। এখন আমার হৃদয ছাডিযা এই তরঙ্গগুলি আপনা আপনি লুটোপুটি করিয়া বেডাইতেছে। কুচবিহাবের নদীর বালিগুলি অভ্র মিশান, অতি সুন্দর, আমি প্রায বাসা হইতে দূরে, নদীব পাবে একলাটী যাইযা সেই বালির উপর শুইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম। আমার মনে হইত উহাবা বুঝি আমার সহিত কথা কহিতেছে।

নানাবিধ ভাব সংগ্রহের জন্য সদা সর্ব্বক্ষণ মনকে লিপ্ত রাখায় আমি কল্পনাব মধ্যেই বাস করিতাম, কল্পনার ভিতর আত্ম বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম, সেইজন্য বোধ হয় আমি যখন যে পার্ট অভিনয় করিতাম, তাহার চরিত্রগত ভাবের অভাব হইত না। যাহা অভিনয় করিতাম, তাহা যে অপবেব মনোমুগ্ধ করিবার জন্য বা বেতনভোগী অভিনেত্রী বলিয়া কার্য্য করিতেছি ইহা আমাব কখন মনেই হইত না। আমি নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতাম। চরিত্রগত সুখ-দুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, ইহা যে অভিনয় করিতেছি তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। সেই কারণে সকলেই আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

একদিন বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'মৃণালিনী' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় আমি 'মৃণালিনী'তে 'মনোরমা'র অংশ অভিনয় করিয়াছিলাম।

মনোরমার অংশ অভিনয় দর্শন করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন যে "আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব তাহা মনে ছিল না, আজ মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার মনোরমাকে সামনে দেখিতেছি।" কয়েক মাস হইল এখনকার ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার অমৃতলাল বসু মহাশয় এই কথা বলিয়াছিলেন যে "বিনোদ, তুমি কি সেই বিনোদ,—যাহাকে দেখিয়া বঙ্কিমবাবুও বলিয়াছিলেন যে আমার মনোরমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি?" যেহেতু এক্ষণে রোগে, শোকে প্রায়ই শয্যাগত।

আমি অতি শৈশবকাল হইতে অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া, বুদ্ধি বৃত্তির প্রথম বিকাশ হইতেই, গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষাগুণে আমায় কেমন উচ্ছ্বাসময়ী করিয়া তুলিয়াছিল, কেহ কিছুমাত্র কঠিন ব্যবহার করিলেই বড়ই দুঃখ হইত। আমি সততই আদর ও সোহাগ চাহিতাম। আমার থিয়েটারের বন্ধু-বান্ধবেরাও আমায় অত্যধিক আদর করিতেন। যাহা হউক এই সময় হইতে আমি আত্মনির্ভর করিবার ভরসা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়াছিলাম।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা বলি:—প্রতাপবাবুর থিয়েটারে আসিবার ঠিক আগেই হউক আর প্রথম সময়েই হউক, আমাদের অবস্থা গতিকে আমাকে একটি সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে থাকিতে হইত। তিনি অতিশয় সজ্জন ছিলেন, তাঁহার স্বভাব অতিশয় সুন্দর ছিল, এবং আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহগুণে আমায় তাঁহার কতক অধীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম তাঁর ইচ্ছা ছিল, যে আমি থিয়েটারে কার্য্য না করি, কিন্তু যখন ইহাতে কোন মতে রাজী হইলাম না, তখন তিনি বলিলেন, তবে তুমি অবৈতনিকভাবে (এ্যামেচার) হইয়া কার্য্য কর, আমার গাড়ী ঘোড়া তোমায় থিয়েটারে লইয়া যাইবে ও লইয়া আসিবে। আমি মহাবিপদে পড়িলাম, চিরকাল মাহিনা লইয়া কার্য্য করিয়াছি। আমার মায়ের ধারণা যে থিয়েটারের পয়সা হইতে আমাদের দারিদ্র্যদশা ঘুচিয়াছে, অতএব ইহাই আমাদের লক্ষ্মী। আর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সখের মত কাজ করা হইয়া উঠিত না। হাড়-ভাঙ্গা মেহনত করিতে হইত, সেইজন্য সখেও বড় ইচ্ছা ছিল না। আমি একথা গিরিশবাবু মহাশয়কে বলিলাম, তিনি বলিলেন, যে "তাহাতে আর কি হইবে, তুমি "অমুককে" বলিও যে আমি মাহিনা লই না। তোমার মাহিনার টাকাটা আমি তোমার মা'র হাতে দিয়া আসিব।" যদিও প্রতারণা আমাদের চির

সহচরী, এই পতিত জীবনের প্রতারণা আমাদের ব্যবসা বলিয়াই প্রতিপন্ন, তবুও আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আর আমি ঘৃণিতা বারনারী হইলেও অনেক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, প্রতারণা বা মিথ্যা ব্যবহারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। অবিশ্বাস আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হইলেও আমি সকলকেই বিশ্বাস করিতাম ও ভাল ব্যবহার পাইতাম। লুকোচুরি ভাঁড়াভাঁড়ি আমার ভাল লাগিত না। কি করিব দায়ে পড়িয়া আমায় গিরিশবাবু মহাশয়ের কথায় সম্মত হইতে হইল। উক্ত ব্যক্তির সহিত গিরিশবাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, তিনি গিরিশবাবুকে বড় সম্মান করিতেন। তিনি এত সজ্জন ছিলেন যে পাছে উঁহারা কিছু মনে সন্দেহ করেন বলিয়া কাজের আগে আমায় থিয়েটারে পৌঁছাইয়া দিতেন। সে যাহা হউক প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিতে ছিল , তিনিও অতিশয় মিষ্টভাষী ও সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। এই স্থানে যে যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছেন, কেবল প্রতাপবাবুই ঋণগ্রস্ত হন নাই। লাভ হইয়াছিল কি না জানি না অবশ্য তাহা বলিতেন না, তবে যে লোকসান হইত না, তাহা জানা যাইত। কেন না প্রতি রাত্রে অজস্র টিকিট বিক্রয় হইত, আর চারিদিকে সুনিয়ম ছিল। তাঁর বন্দোবস্তও নিয়মমত ছিল। সকল রকমে তিনি যে একজন ব্যবসায়ী লোক তাহা সকলেই জানিত ও জানেন। এক্ষণে আমার উক্ত থিয়েটার ছাড়িবার কারণ ও "ষ্টার থিয়েটার" সৃষ্টির সূচনার কথা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করি। গিরিশবাবুর নূতন নূতন বই ও নূতন নূতন প্যান্টোমাইমে আমাদের বড়ই বেশী রকম খাটিতে হইত। প্রতিদিন অতিশয় মেহনতে আমার শরীরও অসুস্থ হইতে লাগিল, আমি একমাসের জন্য ছুটী চাহিলাম, তিনি অনেক জেদাজেদির পর ১৫ দিনের ছুটী দিলেন। আমি সেই ছুটীতে শরীর সুস্থ করিবার জন্য ৺কাশীধামে চলিয়া যাইলাম। কিন্তু সেখানে আমার অসুখ বাড়িল। সেই কারণ আমার ফিরিয়া আসিতে প্রায় এক মাস হইল। এখানে আসিয়া পুনরায় থিয়েটারে যোগ দিলাম, কিন্তু শুনিলাম যে প্রতাপ বাবু আমার ছুটীর সময়ের মাহিনা দিতে চাহেন না। গিরিশবাবু বলিলেন যে "ছুটীর মাহিনা না দিলে বিনোদ কাজ করিবে না, তখন বড় মুস্কিল হইবে।" যদিও স্পষ্ট শুনি নাই, তবু এই রকম শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, বড় রাগ হইল। আমার একটুতে যেন মনের ভিতর আগুন লাগিয়া যাইত, আমি চোখে কিছু দেখিতে পাইতাম না। সেই দিনই প্রতাপবাবু ভিতরে আসিলে আমি আমার মাহিনা চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মাহিনা

কেয়া ? তোম তো কাম নেহি—কিয়া !" আর কোথা আছে ;—"বটে মাহিনা দিবেন না" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আর গেলাম না !

তারপর গিরিশবাবু, অমৃত মিত্র আমাদের বাটীতে আসিলেন। আমি তখন গিরিশবাবুকে বলিলাম যে "মহাশয়, আমার বেশী মাহিনা চাহি, আর যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা চুক্তি করিয়া চাহি, নচেৎ কাজ করিব না।" তখন অমৃত মিত্র বলিলেন, "দেখ বিনোদ এখন গোল করিও না, একজন মাড়োয়ারীর সন্তান, একটি নূতন থিয়েটার করিতে চাহে, যত টাকা খরচ হয় সে করিবে। এখন কিছুদিন চুপ করিয়া থাক, দেখি কতদূর কি হয় !"

এইখান হইতেই "ষ্টার থিয়েটার" হইবার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। আমিও গিরিশবাবুর কথা অনুযায়ী আর প্রতাপবাবুকে কিছু বলিলাম না। তবে ভিতরে ভিতরে সংবাদ লইতে লাগিলাম কে লোক নূতন থিয়েটার করিতে চাহে ?

ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা কথা

পত্র।

মহাশয় !

এই সময় আমার অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। আমাদের ন্যায় পতিতা ভাগ্যহীনা বারনারীদের টাল বেটাল তো সর্ব্বদাই সহিতে হয় তবুও তাহাদের সীমা আছে, কিন্তু আমার ভাগ্য চিরদিনই বিরূপ ছিল। একে আমি জ্ঞানহীনা অধম স্ত্রীলোক, তাহাতে সুপথ কুপথ অপরিচিতা। আমাদের গন্তব্য পথ সততই দোষনীয়, আমরা ভাল পথ দিয়া যাইতে চাহিলে, মন্দ আসিয়া পড়ে ইহা যেন আমাদের জীবনের সহিত গাঁথা। লোকে বলেন আত্মরক্ষা সতত উচিত, কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষাও নিন্দনীয়। অথচ আমাদের প্রতি স্নেহ চক্ষে দেখিবার বা অসময় সাহায্য করিবার কেহ নাই। যাহা হউক, আমার মর্ম্ম ব্যথা শুনুন।

আমিও এই সময় ৺প্রতাপবাবু মহাশয়ের থিয়েটার ত্যাগ করিব মনে মনে করিয়াছিলাম। ইহার আগে আর একটি ঘটনার দ্বারা আমায় কতক ব্যথিত হইতে হইয়াছিল। আমি যে সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তিনি তখন অবিবাহিত ছিলেন, ইহার কয়েক মাস আগে তিনি বিবাহ করেন ও ধনবান যুবকবৃন্দের চঞ্চলতা বশতঃ আমার প্রতি কতক অসৎ ব্যবহার করেন। তাহাতে আমাকে অতিশয় মনঃক্ষুন্ন হইতে হয়। সেই কারণে আমি মনে মনে করি যে ঈশ্বর তো আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সামর্থ্য দিয়াছেন, এইরূপ শারীরিক মেহনত দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে যদি সক্ষম হই, তবে আর দেহ বিক্রয় দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব না ও নিজেকেও উৎপীড়িত করিব না। আমা হইতে যদি একটি থিয়েটার ঘর প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমি চিরদিন অন্ন সংস্থান করিতে পারিব। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখনই ঐ "ষ্টার থিয়েটার" করিবার জন্য ৺গুর্ম্মুখ রায় ব্যস্ত। ইহা আমি আমাদের একটারদের নিকট শুনিলাম এবং ঘটনাচক্রে এই সময় আমার [illegible]

কার্য্যানুরোধে দূরদেশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এদিকে অভিনেতারা আমাকে অতিশয় জেদের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, "তুমি যে প্রকারে পার একটী থিয়েটার করিবার সাহায্য কর!" থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ কবিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ কবিতে আমাব প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। গিরিশবাবু বলিলেন থিয়েটারই আমাব উন্নতির সোপান। তাঁহাব শিক্ষা সাফল্য আমার দ্বারাই সম্ভব। থিয়েটাব হইতে মান সম্ভ্রম জগদ্বিখ্যাত হয়। এইরূপ উত্তেজনায় আমার কল্পনা স্ফীত হইতে লাগিল। থিয়েটারের বন্ধুবর্গেরাও দিন দিন অনুরোধ কবিতেছেন, আমি মনে কবিলেই একটী নূতন থিয়েটার সৃষ্টি হয তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু যে যুবকেব আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহাকেও স্মরণ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই যুবা অনুপস্থিত, উপস্থিত বন্ধুবর্গেব কাতরোক্তি, মন থিয়েটারের দিকেই টলিল। তখন ভাবিতে লাগিলাম যিনি আশ্রয দিয়াছেন, তিনি আমার সহিত যে সত্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ভঙ্গ কবিয়াছেন, অপর পুরুষে যেরূপ প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাবও সেইরূপ। তিনি পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সাক্ষ্য কবিয়া বলিয়াছিলেন যে আমিই তাঁহাব কেবল একমাত্র ভালবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নয়! তিনি বিষয় কার্য্যেব ছল করিয়া দেশে গিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় কার্য্য নয, তিনি বিবাহ করিতে গিযাছেন। তবে তাঁহাব ভালবাসা কোথায? এতো প্রতারণা! আমি কি নিমিত্ত বাধ্য থাকিব? এরূপ নানা যুক্তি হৃদয়ে উঠিতে লাগিল! কিন্তু মধ্যে মধ্যে আবার মনে হইতে লাগিল, যে সেই যুবাব দোষ নাই, আত্মীয স্বজনের অনুবোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইযাছেন। আমি তাঁহাব একমাত্র ভালবাসাব পাত্রী তবে একি করিতেছি। রাত্রে এ ভাব উদয হইলে অনিদ্রায় যাইত, কিন্তু প্রাতে বন্ধুবর্গ আসিলে অনুরোধ তরঙ্গ ছুটিত ও রাত্রের মনোভাব একবারে ঠেলিয়া ফেলিত। থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার মন আমার সহিত প্রতারণা করে নাই। ইহা যতদূর প্রমাণ পাওয়া সম্ভব তাহা পাইয়াছিলাম। কিন্তু দিন ফিরিবার নয়, দিন ফিরিল না। এ প্রমাণের কথা মহাশয়কে সংক্ষেপে পশ্চাৎ জানাইব!

থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম! কেন করিব না? যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরবশীভূত,

তাহারাও সত্য কথাই বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সংকল্প দৃঢ় হইল, গুর্ম্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম। একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের চিরপ্রথা হইলেও এ অবস্থায় আমায় বড চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছিল। হয়তো লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে আমাদেরও আবার ছলনায় প্রত্যবায় বোধ বা বেদনা আছে। যদি স্থিরচিত্তে ভাবিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী-হৃদয়ের সকল কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই, যে কোমলতায় একদিন হৃদয় পূর্ণ ছিল তাহা একেবারে নির্ম্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তান পালন করা। পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? বিষ্ণুপরায়ণ প্রাতঃস্মরণীয় হরিদাসকে প্রতারিত করিবার জন্য আমাদেরই বারাঙ্গনা একজন প্রেরিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যবহারে তিনি বৈষ্ণবী হন, এ কথা জগৎ ব্যাপ্ত। যদি হৃদয় না থাকিত, সম্পূর্ণ হৃদয় শূন্য হইলে কদাচ তিনি বিষ্ণুপরায়ণা হইতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা কেনেন নাই। আমরাও অর্থে ভালবাসা বেচি নাই। এই আমাদের সংসারের অপরাধ। নাট্যাচার্য্য গিরিশবাবু মহাশয়ের যে "বারাঙ্গনা" বলিয়া একটি কবিতা আছে, তাহা এই দুর্ভাগিনীদের প্রকৃত ছবি। "ছিল অন্য নারীসম হৃদয় কমল।" অনেক প্রদেশে জল জমিয়া পাষাণ হয়! আমাদেরও তাহাই! উৎপীড়িত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে। যাহা হউক, এখন ও কথা থাকুক। এই পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থান্তর গ্রহণ করিতে আমাকে ও থিয়েটারের লোকদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেননা যখন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক শুনিলেন যে আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি থিয়েটারে চিরদিন সংলগ্ন হইবার সংকল্প করিয়াছি, তখন তিনি ক্রোধ বশতঃই হউক, কিম্বা নিজের জেদ বশতঃই হউক, নানারূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বাধা বড় সহজ বাধা নহে! তিনি নিজের জমিদারী হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া,

বাড়ী ঘেরোয়া করিলেন, গুর্ম্মুখ বাবুও বড বড় গুণ্ডা আনাইলেন, মারামারি পুলিশ হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। এমন কি একদিন জীবন সংশয় হইয়াছিল! একদিন রিহারসালের পর আমি আমার ঘরে ঘুমাইতে ছিলাম, ভোর ছয়টা হইবে, ঝন্ ঝন্ মস্ মস্ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! দেখি যে মিলিটারি পোষাক পরিয়া তরওয়াল বান্ধিয়া সেই যুবক একেবারে আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে, "মেনি এত ঘুম কেন?" আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতে, বলিলেন যে, "দেখ বিনোদ, তোমাকে উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার জন্য যে টাকা খরচ হইয়াছে আমি সকলই দিব। এই দশ হাজার টাকা লও, যদি বেশি হয় তবে আরও দিব।" আমি চিরদিনই একগুঁয়ে ছিলাম, কেহ জেদ করিলে আমার এমন রাগ হইত যে, আমার দিক্‌বিদিক্ কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিত না! যাহা বোক্ করিতাম কিছুতেই তাহা টলাইতে পারিত না! মিষ্ট কথায় স্নেহের আদরে যাহা করিব স্থির করিতাম, কেহ জোর করিয়া নিষেধ করিলে, সে কাজ করিতাম না, জোরের সহিত কাজ করান আমার সহজ সাধ্য ছিল না। তাঁহার ঐরূপ উদ্ধত ভাব দেখিযা আমাব বড রাগ হইল, আমি বলিলাম, "না কখনই নহে, আমি উহাদের কথা দিয়াছি, এখন কিছুতেই ব্যতিক্রম করিতে পারিব না।" তিনি বলিলেন "যদি টাকার জন্য হয়, তবে আমি তোমায় আরও দশ হাজাব টাকা দিব।" তাঁহার কথায় আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল! দাঁড়াইয়া বলিলাম, যে "রাখ তোমাব টাকা। টাকা আমি উপার্জ্জন করিয়াছি বই টাকা আমায উপার্জ্জন করে নাই! ভাগ্যে থাকে অমন দশ বিশ হাজার আমার কত আসিবে, তুমি এখন চলিয়া যাও!" আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আগুনের মতন জ্বলিয়া নিজের তরওয়ালে হাত দিয়া বলিলেন, "বটে! — ভেবেচ কি যে তোমায় সহজে ছাড়িয়া দিব, তোমায় কাটিয়া ফেলিব! যে বিশ হাজার টাকা তোমায় দিতে চাহিতে ছিলাম তাহা অন্য উপায়ে খরচ করিব, পরে যাহা হয় হইবে;" বলিতে বলিতে ঝাঁ করিয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া, চক্ষের নিমিষে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিলেন। আমার দৃষ্টিও তাঁহার তরবারির দিকে ছিল, যেমন তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত আমি অমনি একটি টেবিল হারমোনিয়ম ছিল তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম; আর সেই তরবারির চোট হারমোনিয়মের ডালার উপর পড়িয়া ডালার কাঠ তিন আঙুল কাটিয়া গেল! নিমেষ মধ্যে পুনরায় তরওয়াল তুলিয়া লইয়া আমার আঘাত করিলেন, তাঁর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আমারও মৃত্যু নাই, সে

আঘাতও যে চৌকিতে বসিয়া বাজান হইত তাহাতে পড়িল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি উঠিয়া তাঁহার পুনঃ উদ্যত তরওয়াল শুদ্ধ হস্ত ধরিয়া বলিলাম "কি করিতেছ, যদি কাটিতে হয় পরে কাটিও; কিন্তু তোমার পরিণাম? আমার কলঙ্কিত জীবন গেল আর রহিল তা'তে ক্ষতি কি! একবার তোমার পরিণাম ভাব, তোমার বংশের কথা ভাব, একটা ঘৃণিত বারাঙ্গনার জন্য এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইবে, ছি। ছি। শুন! স্থির হও! কি করিতে হইবে বল? ঠাণ্ডা হও!" শুনিয়াছিলাম দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের প্রথম বেগ শমিত হইলে লোকের প্রায় হিতাহিত ফিরিয়া আইসে। এ তাহাই হইল, হাতের তরওয়াল দূরে ফেলিয়া দিয়া মুখে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন! তাঁহার সে সময়ের কাতরতা বড়ই কষ্টকর! আমার মনে হইল যে সব দূরে যাউক, আমি আবার ফিরিয়া আসি। কিন্তু চারিদিক হইতে তখন আমায় অষ্ট বজ্র দিয়া থিয়েটারের বন্ধুগণ ও গিরিশবাবু মহাশয় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন, কোন দিকে ফিরিবার পথ ছিল না! যাহা হউক, সে হইতে তখন তো পার পাইলাম! তিনি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে আমরা যে কয়জন একত্র হইয়াছিলাম সকলে ৺প্রতাপবাবুর থিয়েটার ত্যাগ করিলাম। ৺গুর্ম্মুখবাবুও ধরিলেন যে আমি একান্ত তাঁর বশীভূত না হইলে তিনি থিয়েটারের জন্য কোন কার্য্য করিবেন না। কাজে কাজেই গোলযোগ মিটিবার জন্য পরামর্শ করিয়া আমাকে মাসকতক দূরে রাখিতে সকলে বাধ্য হইলেন। কখন রানীগঞ্জে, কখন এখানে ওখানে আমায় থাকিতে হইল। ইহার ভিতর কেমন ও কিরূপ থিয়েটার হইবে এইরূপ কার্য্য চলিতে লাগিল। পরে যখন সব স্থির হইল, যে বিডন ষ্ট্রীটে প্রিয় মিত্রের যায়গা লিজ্ লইয়া এত দিন থিয়েটার হইবে, এত টাকা খরচ হইবে, তখন আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি কলিকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন গুর্ম্মুখবাবু বলিলেন, যে "দেখ বিনোদ! আর থিয়েটারের গোলযোগে কাজ নাই, তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নিকট লও! আমি একেবারে তোমায় দিতেছি।" এই বলিয়া কতকগুলি নোট বাহির করিলেন। আমি থিয়েটার ভালবাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিতা বারনারী হইয়াও অর্দ্ধ লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিয়াছিলাম। যখন অমৃত মিত্র শুনিলেন, গুর্ম্মুখ রায় থিয়েটার না করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা আমায় দিতে চান, তখন তাঁহাদের চিন্তার সীমা রহিল না। যাহাতে আমি সে অর্থ গ্রহণ না করি, ইহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু এ সময়ে চেষ্টা [illegible]

নিষ্প্রয়োজন। আমি স্থির করিয়াছি থিয়েটার করিব। থিয়েটার ঘর প্রস্তুত না করিয়া দিলে আমি কোন মতে তাঁহার বাধ্য হইব না। তখন আমারই উদ্যমে বিডন ষ্ট্রীটে জমি লিজ্ লওয়া হইল, এবং থিয়েটার প্রস্তুতের জন্য গুর্ম্মুখ রায় অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। উক্ত বিডন ষ্ট্রীটেই বনমালী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী ভাড়া লইয়া রিহাবসাল আরম্ভ হইল, তখন একে একে সব নূতন পুবাতন এক্‌টার এক্‌ট্রেস আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন! গিরিশবাবু মহাশয় মাস্টাব ও ম্যানেজার হইলেন এবং বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় এগনকাব স্টার থিয়েটারেব সুযোগ্য ম্যানেজার অমৃতলাল বসু আসিলেন। ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ্ লন, তখন বোধহয় আমরা ৺প্রতাপ বাবুব থিয়েটারে; সেই সময় কোন কারণ বশতঃ জোড়া মন্দিরের পাশে ঐ সিমলাতে আমাদেব একটি বাড়ী ভাড়া ছিল। সে বাড়ীতে ভুনীবাবুও প্রায়ই যাইতেন ও কায্যানুবোধে কযেকদিন বাসও করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিযেটারেব কর্তৃপক্ষীযদের সহিত বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস দখল করিতে পারিতেছিলেন না। আমবাই দূবদেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভুনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়া দিই। পরে যখন আমাদের নূতন থিয়েটার হইল, তখন ভুনীবাবু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দেন! সেই সময় প্রফেসর জহরলাল ধর আমাদের স্টেজ ম্যানেজার হন! দাসুবাবু যদিও ছেলেমানুষ কিন্তু কার্য্য শিখিবার জন্য গিবিশবাবু মহাশয় উহাকে সহকারী স্টেজ ম্যানেজার করেন এবং হিসাবপত্র সব ভাল থাকিবে ও বন্দোবস্ত সব সুশৃঙ্খলে হইবে বলিযা তিনি এখনকার প্রোপ্রাইটার বাবু হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়কে আনিয়া সকল ভার দেন। হবিবাবু মহাশয় চিবদিনই বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান! গিরিশবাবু মহাশয় নূতন থিয়েটাবের উন্নতি করিবার জন্য শিক্ষা-কার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া নিজে সকল কাজ দেখিতে পারিতেন না। সে জন্য সুযোগ্য লোক দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের উপর এক এক কার্য্যের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। অতি উৎসাহের ও আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময় আমরা বেলা ২।৩টার সময় রিহারসালে গিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া থিয়েটারে আসিতাম; এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া মাটী বহিয়া পিট, ব্যাক সিটের স্থান পুর্ণ করিতাম, কখন কখন মজুরদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক ঝুড়ি পিছু চারিকড়া করিয়া কড়ি ধার্য্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতের জন্য রাত্র পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। সকলে চলিয়া যাইতেন, আমি গুর্ম্মুখবাবু

আর ২।১ জন রাত্র জাগিয়া কার্য্য করাইয়া লইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ দেখে কে ? অতি উৎসাহে অনেক পয়সা ব্যয়ে থিয়েটার প্রস্তুত হইল। বোধহয় এক বৎসরের ভিতর হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার সহিত আমি আর একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না, থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন সকলে আমায় বলেন যে "এই যে থিয়েটার হাউস্ হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম "বি" থিয়েটার হইবে।" এই আনন্দে আমি আরও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যকালে উঁহারা সে কথা রাখেন নাই কেন—তাহা জানি না! যে পর্য্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজেষ্ট্রি না হইয়াছিল, সে পর্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে "নাম" হইবে! কিন্তু যে দিন উঁহারা রেজেষ্ট্রি করিয়া আসিলেন—তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহকয়েক বাকী ; আমি তাডাতাডি জিজ্ঞাসা করিলাম যে থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল ? দাস্থবাবু প্রফুল্লভাবে বলিলেন যে "স্টার।" এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইযা বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিট কাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিছু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম "বেশ!" পরে মনে ভাবিলাম যে উঁহারা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহ মমতা দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিলেন ? কিন্তু কি করিব, আমার আর কোন উপায় নাই! আমি তখন একেবারে উঁহাদের হাতের ভিতরে! আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উঁহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমনভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এত টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিল যদিও এ সম্বন্ধে আর কখন কাহাকেও কোন কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতেও পারি নাই, ঐ ব্যবহার বরাবর মনে ছিল! আর থিয়েটার আমার বড প্রিয়, থিয়েটারকে বড়ই আপনার মনে করিতাম, যাহাতে তাহাতে আর একটি নূতন থিয়েটার তো হইল ; সেই কারণে সেই সময় তাহা চাপাও পডিয়া যাইত। কিন্তু থিয়েটার প্রস্তুত হইবার পরও সময়ে সময়ে বড ভাল ব্যবহার পাই নাই! আমি যাহাতে উক্ত থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী হইয়াও না থাকিতে পারি তাহার জন্যও সকলে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহাদের উদ্যোগ ও যত্নে আমাকে মাস দুই ঘরে বসিয়াও থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পর আবার গিরিশবাবুর যত্নে ও স্বত্বাধিকারীর জেদে আমায় পুনরায় যোগ দিতে হইয়াছিল।

লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে প্রোপ্রাইটার "এতো বড় অন্যায়, যাহার দরুণ থিয়েটার করিলাম তাহাকে বাদ দিয়া কার্য্য করিতে হইবে? এ কখন হইবে না। তাহা সব পুড়াইয়া দিব।" সে যাহা হউক, একসঙ্গে থাকিতে হইলে ত্রুটী হইয়া থাকে, আমাবও শত সহস্র দোষ ছিল। কিন্তু অনেকেই আমায় বড় স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ মাননীয় গিরিশবাবুর স্নেহাধিক্যে আমার অভিমান একটু বেশী প্রভুত্ব করিত, সেইজন্য দোষ আমারই অধিক হইত। কিন্তু আমার অভিনয় কার্য্যের উৎসাহের জন্য সকলেই প্রশংসা করিতেন, এবং দোষ ভুলিয়া আমার প্রতি স্নেহের ভাগই অধিক বিকাশ পাইত। আমি তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম স্নেহ কখন ভুলিতে পারিব না। এই থিয়েটারে কার্য্যকালীন কোন সুকার্য্য করিয়া থাকি আর না করিযা থাকি প্রবৃত্তির দোষে বুদ্ধির বিপাকে অনেক অন্যায করিয়াছি সত্য। কিন্তু এই কার্য্যের দরুণ অনেক ঘাত-প্রতিঘাতও সহিতে হইয়াছে। এইরূপ নানাবিধ টাল-বেটালের পর নূতন "স্টারে" নূতন পুস্তক "দক্ষযজ্ঞ" অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন সকলেবই মনোমালিন্য এক রকম দূরে গিয়াছিল। সকলেই জানিত যে এই থিয়েটাবটী আমাদের নিজের। আমরা ইহাকে যেমন বাহ্যিক চাকৃচিক্যময় করিযাছি তেমনিই গুণময় করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরও অধিক করিব। সেই কাবণে সকলে আনন্দে, উৎসাহে একমনে অভিনয়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যত্ন কবিতেন।

এখানকার প্রথম অভিনয় "দক্ষযজ্ঞ"। ইহাতে গিরিশবাবু মহাশয় "দক্ষ", অমৃত মিত্র "মহাদেব", ভুনীবাবু "দধীচি"। আমি "সতী", কাদম্বিনী "প্রসূতি" এবং অন্যান্য সুযোগ্য লোক সকল নানাবিধ অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের সে লোকাবণ্য, সেই খড়খড়ি দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিযা কম্পন বর্ণনাতীত! আমাদেরই সব "দক্ষযজ্ঞ" ব্যাপার। কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতাব বরে যেন সত্যই দক্ষালযের কার্য্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর সেই গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্ত্তি যখন ষ্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ। তাহার পর অভিনয় উৎসাহ, সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবু "দক্ষ", অমৃত মিত্রের "মহাদেব" যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধ হয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। "কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার" বলিয়া যখন অমৃত মিত্র ষ্টেজে বাহির হইতেন তখন বোধ হয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণ

ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত তখন সে বোধ হয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত। অভিনয়কালীন ষ্টেজের উপর যেন অগ্নি উত্তাপ বাহির হইত। যাহা হউক, এই থিয়েটার হইবার পর গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের আগ্রহ উৎসাহে দিন দিন উজ্জলতর উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। এই থিয়েটারেই কার্য্যকালীন নানাবিধ গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট উৎসাহ পাইয়া আমার কার্য্যের গুরুত্ব আমি অনুভব করিতে পারিলাম। অভিনয়-কার্য্য যে রঙ্গালয়ের রঙ্গ নহে, তাহা শিক্ষা করিবার ও দীক্ষা দিবার বিষয়। অভিনয়-কার্য্য যে হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া লইয়া সে কার্য্য মন ও হৃদয় এক করিয়া লইতে হয়; তাহাতে কতকটা আপনাকে টানিয়া মিলাইয়া লইতে হয় তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলাম, এবং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের যে কতদূর উচ্চ কার্য্য সমাধার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইলাম। সেই কারণ সতত যত্নের সহিত হৃদয়কে সংযম রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ভাবিতাম যে ইহাই আমার কার্য্য ও ইহাই আমার জীবন। আমি প্রাণপণ যত্নে মহামহিমান্বিত চরিত্র সকলের সম্মান রক্ষা করিতে হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিব। ইহার পর গিরিশবাবুর লিখিত সব উচ্চ অঙ্গের পুস্তক অভিনয় হইতে লাগিল। মধ্যস্থানে সমাজ পীড়নে বা অন্য কারণে হউক গুর্ম্মুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ত্ব ত্যাগ করিলেন। সেই সময় হরিবাবু, অমৃত মিত্র দাশুবাবু কিছু কিছু টাকা দিয়া ও কতক টাকা স্বর্গগত মাননীয় হরিধন দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া ও তখন এক্‌জিবিসনের সময় প্রত্যহ অভিনয় চালাইয়া সেই টাকার দ্বারা "ষ্টার থিয়েটার" নিজেরা ক্রয় করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসুও একজন প্রোপ্রাইটার হইলেন। এই সময় নানা কারণে ও অসুস্থ হইয়া গুর্ম্মুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ত্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ও বলিলেন যে, "এই থিয়েটার যাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আমি তাহাকেই ইহার স্বত্ত্ব দিব, অন্ততঃ ইহার অর্দ্ধেক স্বত্ত্ব তাহার থাকিবে, নচেৎ আমি হস্তান্তর করিব না।"

সেই সময় গুর্ম্মুখবাবুর ইচ্ছায় আমারও সমান অংশ লইবার কথা উঠিল। লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে গুর্ম্মুখবাবু বলিয়াছিলেন যে ইহাতে বিনোদের অংশ না থাকিলে আমি কখন উহাদিগকে দিব না। এদিকে কিন্তু গিরিশবাবু মহাশয় তাহাতে রাজী হইলেন না, তিনি আমার মাকে বলিলেন যে "বিনোদের মা ও-সব ঝঞ্চাটে তোমাদের কাজ নাই, তোমরা স্ত্রীলোক অত ঝঞ্চাট বহিতে

পারিবে না। আমরা আদার ব্যাপারি আমাদের জাহাজের খবরে কাজ নাই। তোমার মেয়েকে ফেলিয়া তো আমি কখন অন্যত্র কার্য্য করিব না; আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে একজন অতি প্রয়োজনীয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না! আমরা কার্য্য করিব; বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই! গাধার পিঠে বোঝা দিয়া কার্য্য করিব।" গিরিশবাবুর এই সকল কথা শুনিয়া মা আমার কোন মতেই রাজি হইলেন না। যেহেতু আমার মাতাঠাকুরাণীও গিরিশবাবু মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। এই রকম নানাবিধ ঘটনায় ও রটনায় বহু দিবসাবধি লোকের মনে ধারণা ছিল যে "ষ্টারে" আমার অংশ আছে! এমন কি অনেকবার লোকে আমায় স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছে "তোমার কত অংশ?" সে যাহা হউক, এই থিয়েটার ইঁহাদের নিজের হাতে আসিবার পর দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ হইল। পুর্ব্বে একৃজিবিসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তখনও একৃজিবিসন চলিতেছে, কত দেশ দেশান্তরের লোক কলিকাতায়! আমাদের উদ্যোগ, উৎসাহ, আনন্দ দেখে কে? এই সময় আবার আমরা সব ঐক্য হইলাম। যে যাহার কার্য্য করিতে লাগিল, তাহা যেন তা'রই নিজের কার্য্য! এই সময় সুবিখ্যাত "নল-দময়ন্তী", "ধ্রুবচরিত্র" "শ্রীবৎস-চিন্তা" ও "প্রহ্লাদচরিত্র" নাটক প্রস্তুত হয়'

এই থিয়েটারের যতই সুনাম প্রচার হইতে লাগিল, গিরিশবাবু মহাশয় ততই যত্নে আমায় নানাবিধ সৎশিক্ষা দিয়া কার্য্যক্ষম করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এইবার "চৈতন্যলীলা" নাটক লিখিত হইল এবং ইহার শিক্ষাকার্য্যও আরম্ভ হইল। এই "চৈতন্যলীলা"র রিহারসালের সময় "অমৃতবাজার পত্রিকার" এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেব-চরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পাবে তাহার উপদেশ দিতেন, এবং বার বার বলিতেন যে, "আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিত-পাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।" তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইত যে কেমন করিয়া এ অকূল পাথারে কূল পাইব। মনে মনে সদাই ডাকিতাম "হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।" যেদিন প্রথম চৈতন্যলীলা অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই

নাই ; প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উদ্বেগ হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইলাম ; পরে ১০৮ দুর্গানাম লিখিয়া তাঁহার চরণে ভিক্ষা করিলাম যে, "মহাপ্রভু যেন আমায় এই মহাসঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তাঁর কৃপালাভ করিতে পারি" ; কিন্তু সারা দিন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে স্মরণ লইয়াছিলাম তাহা বোধহয় ব্যর্থ হয নাই। কেননা তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম তাহা বহুসংখ্যক সুধীবৃন্দের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমিও মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন। কেননা সেই বাল্যলীলার সময় "রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী" বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম "কি দেখ মালিনী ?" সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম , আমার মনে হইত "ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ" উনিই তো বলিতেছেন, আমি সব মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি ! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। আমি যখন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বসিতাম "প্রভু কেবা কার ! সকলই সেই কৃষ্ণ" তখন সত্যই মনে হইত যে "কেবা কার !" পরে যখনই উৎসাহ উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে, –

"গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদে পঙ্কজে কবিতেছে মধুপান,
কত শত কোটী অশরীরী প্রাণী !"

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে ! আমি তো কেহই নহি ! আমাতে আমি-জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে –

"কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদনা নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে কৃষ্ণে নাহি পাবে।"

তখন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুর্‌গুর্ করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম্ম-বিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শকবৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কালে "হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি ভবে একা দাও হে দেখা প্রাণ সখা রাখ পায়॥" এই গানটী গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনাব নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরি পাদপদ্মে আপনার আশ্রয় স্থান খুঁজিত। উন্মত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতাম। এক একদিন এমন হইত যে অভিনয়ের গুরুভার বহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতাম।

একদিন অভিনয় করিতে করিতে মধ্যস্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়ি, সেদিন অতিশয় লোকারণ্য হইয়াছিল। "চৈতন্যলীলার" অভিনয়ে প্রায় অধিক লোক হইত। তবে যখন কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশী লোক সকল আসিতেন তখন আরও রঙ্গালয় পূর্ণ হইত এবং প্রায় অনেক গুণী লোকই আসিতেন। মাননীয় ফাদার লাফোঁ সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ড্রপসিনের পরেই ষ্টেজের ভিতর গিয়াছিলেন, আমার ঐ রকম অবস্থা শুনিয়া গিরিশবাবু মহাশয়কে বলেন যে "চল আমি একবার দেখিব।" গিরিশবাবু তাঁহাকে আমার গ্রিণরুমে লইয়া যাইলেন, পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিতে পাইলাম একজন মস্ত বড দাডিওয়ালা সাহেব ঢিলা ইজের জামা পরা আমার মাথার উপর হইতে পা পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিতে গিরিশবাবু বলিলেন, "ইঁহাকে নমস্কার কর। ইনি মহামহিমান্বিত পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ।" আমি তাঁর নাম শুনিতাম, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই! আমি হাত জোড করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমার মাথায় খানিক হাত দিয়া এক গ্লাস জল খাইতে বলিলেন! আমি এক গ্লাস জল পান করিয়া বেশ স্বস্থ হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইলাম। অন্য সময় মূচ্ছিত হইয়া পড়িলে যেমন নিস্তেজ হইয়া পডিতাম, এবার তাহা হয় নাই; কেন তাহা বলিতে পারি না। এই চৈতন্য-লীলা অভিনয় জন্য আমি যে কত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। পরম পূজনীয় নবদ্বীপের বিষ্ণু-প্রেমিক পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার

পবিত্র পদধূলিতে আমার মস্তক পূর্ণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি মহাপ্রভুর দয়ায় কত ভক্তি-ভাজন সুধীগণের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলাম। এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে—শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনেব মধ্যে চৈতন্যলীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৺পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিযা আমায় তাঁব শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন! অভিনয কার্য্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিযা নাচিতে নাচিতে বলিতেন, "হরি গুরু, গুরু হরি", বল মা "হরি গুরু, গুরু হরি", তাহাব পর উভয় হস্ত আমার মাথাব উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা তোমার চৈতন্য হউক।" তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময মূর্ত্তি আমার ন্যায অধম জনেব প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমাব সম্মুখে দাঁড়াইযা আমায় অভয় দিয়াছিলেন। হায! আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী! আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আবার মোহ জড়িত হইযা জীবনকে নবক সদৃশ করিয়াছি।

আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরেব বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই তখনও সেই রোগক্লান্ত প্রসন্নবদনে আমায় বলিলেন, "আয় মা বোস", আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান। কতদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নবেন্দ্রনাথের (পরে যিনি বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পবিচিত হইযাছিলেন) "সত্যং শিবং" মঙ্গলগীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিযাছি। আমার থিয়েটাব কার্য্যকরী দেহকে এইজন্য ধন্য মনে করিয়াছি। জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে "পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পবমহংস দেব" আমায় কৃপা করিয়াছিলেন! তাঁর সেই পীযুষ পুরিত আশাময়ী বাণী—"হরি গুরু, গুরু হরি" আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়-ভারে অবনত হইয়া পড়ি, তখনই যেন সেই ক্ষমাময প্রসন্ন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে, "বল—হরি গুরু গুরু হরি।" এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন, মনে নাই। তবে "বক্সে" যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্ত্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।

ইহার পর "দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা" অভিনয় হয়! এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা প্রথমভাগ হইতে কঠিন ও অতিশয় বড় বড় স্পীচ দ্বারা পুর্ণ! আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক। এই দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলার অংশ মুখস্থ করিয়া আমায় একমাস মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহার সকল স্থান কঠিন ও উন্মাদকারী, কিন্তু যখন সার্ব্বভৌম ঠাকুরের সহিত আকার ও নিবাকারবাদ লইয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভুর যড়ভূজমূর্ত্তি ধাবণ, সেই স্থান অভিনয় যে কতদূর উন্মাদকারী আত্মবিস্মৃত ভাবপুর্ণ, তাহা যাঁহারা দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলার অভিনয় না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেই পারিবেন না। সেই সকল স্থান অভিনয়কালীন মনের আগ্রহ যতদূর প্রয়োজন, আবার দেহের শক্তিও ততদূর দরকার। কেন না সেই লঘু হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর সংযোগে একভাবে মনের আবেগে মনে হইত যে আমি বুঝি এখনই পড়িয়া যাইব। আর সেই ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশকালীন "ঐ ঐ আমার কালাচাঁদ" বলিয়া আত্মহারা! ইহা বলিতে যত সহজ, কার্য্যে যে কতদূর কঠিন ভাবিতেও ভয় হয়! এখনকার এই জড়, অপদার্থ দেহে যখন সেই সকল কথা ভাবি, তখন মনে হয়, যে কেমন করিয়া আমি ইহা সম্পূর্ণ করিতাম। তাই মনে হয় যে, সেই মহাপ্রভুব দযা ব্যতীত আমার সাধ্য কি? আমি রঙ্গালয় ত্যাগ করিবার পর এই "দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলা" আর অভিনয় হয় নাই! এই সময অমৃতলাল বসু মহাশযের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন "বিবাহ বিভ্রাট" প্রস্তুত হয। ইহাতে আমি "বিলাসিনী কারফবমার" অংশ অভিনয় করি! কি বিষম বৈষম্য! কোথায় জগতপূজ্য দেবতা মহাপ্রভু চৈতন্য চরিত্র, আর কোথায় ঊনবিংশ শতাব্দীব শিক্ষিতা হিন্দু-সমাজ বিরোধী সভ্যা স্ত্রী বিলাসিনী কারফরমা চরিত্র! আমি তো ছয় সাত মাস ধরিযা এক সঙ্গে "চৈতন্য" ও "বিলাসিনীর" অংশ অভিনয কবিতে সাহস করি নাই। যদিও পরে অভিনয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অনেকদিন পবে তবে সাহস হইযাছিল। অভিনয়কালীন কত যে বাধা বিপত্তি সহিতে হইত, এখন মনে হইলে ভাবি যে কেমন করিয়া এত কষ্ট সহিতাম। সময়ে সময়ে এত অসুস্থ হইয়া পডিতাম যে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রায় আমার অনিষ্ট হইত। মাঝে মাঝে গঙ্গার তীরের নিকট কোনো স্থানে বাসা লইয়া বাস করিতাম এবং শনি ও রবিবারে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতাম। আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহার ব্যয়-ভার থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যত্নের সহিত বহন করিতেন।

এই সময়ের মধ্যে আর একটি পরিবর্তন ঘটে। অসুখে ও নানারূপ বাধা বিপত্তিতে আমার মনের ভাব হঠাৎ অন্য প্রকার হয়। মনে করি যে আমি আর কাহার অধীন হইব না। ঈশ্বর আমায় যে স্বকৃত উপার্জ্জনের ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিব। আমার এই মনের ভাব প্রায় দেড বৎসর ছিল এবং সেই সময় আমি বড় শান্তিতে দিন কাটাইতাম। সন্ধ্যার সময় কার্য্য স্থানে যাইতাম, আপনার কার্য্য সমাধা হইলে ভূনীবাবু ও গিরিশবাবু মহাশয়ের নিকট নানা দেশ-বিদেশের গল্প বা থিয়েটারের কথা সব শুনিতাম, এবং কি করিলে কোন খানে উন্নতি হইবে, কোন্ কার্য্যের কোথায় কি ক্রটী আছে এই নানারূপ পরামর্শ হইত। পরে বাটীতে আসিলে স্নেহময়ী জননী কত যত্নে আহার দিতেন। সেই তত রাত্রে উঠিয়া নিকটে বসিয়া আহার করাইতেন। আহারান্তে ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতাম। কিন্তু পরিশেষে নানারূপ মনভঙ্গ দ্বারা থিয়েটারে কার্য্য করা দুরূহ হইয়া উঠিল। যাঁহারা একসঙ্গে কার্য্য করিবার কালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, সখা ও সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা ধনবান উন্নতিশীল অধ্যক্ষ হইলেন। বোধহয়, সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমায় থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।

শেষ সীমা।

পত্র।

মহাশয়!

আপনাকে আর কত বিরক্ত কবিব! এ ভাগ্যহীনার কলঙ্কিত জীবনেব পাপকথা দ্বারা আপনাকে আর কত জালাতন করিব! কিন্তু আপনার দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণ করিযা এ পাপ জীবনের ঘটনা মহাশযকে নিবেদন করিতে সাহস করি। সেই কারণে নিবেদন এই যে, যদি এতদিন দয়া করিযা ধৈর্য্যদ্বারা আমার যন্ত্রণাময় কথা শুনিযাছেন, তবে শেষটাও শুনুন!

মানুষ যদি আপনার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত, তাহা হইলে গর্ব্ব অহঙ্কার সকল পাপই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইত! কি ছিলাম, কি হইয়াছি! তখন যদি বুঝিতাম যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর দিতেও পারেন এবং নিতেও পারেন, তাহা হইলে কি মান অভিমানের খেলা লইয়া বৃথা দিন কাটাইতাম! এখন দিন গেছে, কথাই আছে, আর আছে স্মৃতির জ্বালা! পাপের অনুতাপ! কিন্তু ঈশ্বর দয়াময় তাহাও নিশ্চয়! জীব যতই অধঃপতিত হউক না কেন, তাঁর দয়াতে বঞ্চিত নহে। তিনিই দেন, তিনিই লন, ইহাও তাঁহার করুণা, ইহাতে আক্ষেপ নাই। সেই অসীম করুণাময় এই নিরাশ্রয়া পতিতা ভাগ্যহীনাকে একটী সুশীতল আশ্রয়স্থল দিয়াছেন। যেখানে বসিয়া এই দুর্ব্বিসহ বেদনাপুর্ণ বুক লইয়া একটু শান্তিতে ঘুমাইতে পাই! ইহা তাঁহারি করুণা! এখন শেষ কথাগুলি শুনুন।

আমি যে সময় থিযেটারে কার্য্য করিতাম, সেই সময়ের দু'একটী কথা বলি। আমি এত বালিকা বয়সে অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া ছিলাম যে, আমি যখন "সরোজিনী"তে "সরোজিনী"র অংশ অভিনয় করিতাম, তখন এখনকার "ষ্টারে"র সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয় ঐ নাটকে বিজয়সিংহের অংশ অভিনয় করিতেন। তিনি এখনও বলেন, "সে সময় তোমার সহিত আমার বিজয়সিংহের ভূমিকা লইয়া প্রেমাভিনয় বড় লজ্জা হইত! কিন্তু অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইত

যে একদিন অভিনয়কালীন "ভৈরবাচার্য্য" যখন "সরোজিনী"কে বলি দিতে যায়, সেই সময় দর্শকবৃন্দ এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া ছিল যে ফুটলাইট ডিঙ্গাইয়া ষ্টেজে উঠিতে উদ্যত। তাহাতে মহা গোলযোগ হইয়া ক্ষণেক অভিনয় কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ইহা তোমার মনে আছে কি?"

"বিষবৃক্ষে" আমি "কুন্দের" অংশ অভিনয় করিতাম। আমাদের মতন চঞ্চলস্বভাবা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সেই ভীরুস্বভাবা শান্ত, শিষ্ট, এতটুকু হৃদয়মধ্যে অসীম ভালবাসা লুকাইয়া আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত হইয়া পরগৃহ প্রতিপালিতা হইয়া তাহার উপর দুর্ম্মতি বশতঃই হউক, আর অদৃষ্ট দোষেই হউক, সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ রূপে, গুণে, সহায় সম্পদে, ধনে মানে উচ্চ সেই আশ্রয়দাতাকে দান করিয়া, অতিশয় সহিষ্ণুতাব সহিত সেই বেদনা ভরা বুকখানিকে, বুকের মধ্যে লুকাইয়া সেই আশ্রয়দাতাকে আত্ম-সমর্পণ করিযা সশঙ্কিত মৃগশিশুর ন্যায় দিন কাটান। উপায় নাই, অবলম্বন নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, আত্মনির্ভরতাও নাই, এই ভাবে অভিনয় করিতে যে কত ধৈর্য্য প্রয়োজন, তাহা সমভাবি অভিনেত্রী ব্যতীত অনুভব করিতে পারিবেন না! এই সময় মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয় আমার সহিত "নগেন্দ্রনাথে"র অংশ অভিনয় করিতেন।

"বিষবৃক্ষে"র "কুন্দ"র অভিনয়ের পরই "সধবার একাদশী"র "কাঞ্চন"! কি স্বভাব সম্বন্ধে, কি কার্য্য সম্বন্ধে কত প্রভেদ! অভিনয়কালে আপনাকে যে কত ভাগে বিভক্ত করিতে হইত তাহা বলিতে পারি না। একটী কার্য্যপূর্ণ ভাব সম্পূর্ণ করিয়া অমনি আর একটা ভাবকে সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার এটী স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অভিনয় ব্যতীত আমি সদাসর্ব্বক্ষণ এক এক রকম ভাবে মগ্ন থাকিতাম।

"মৃণালিনী"তে "মনোরমা"র চরিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর কঠিন, তাহা যাঁহারা না মৃণালিনীর অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন না! একসঙ্গে বালিকা, প্রেমময়ী যুবতী, পরামর্শদাত্রী মন্ত্রী, অবশেষে পরম পবিত্র চিত্র স্বামী সহমরণ অভিলাষিণী দৃঢ়চেতা সতী রমণী! যে কেহ "মনোরমা"র অংশ অভিনয় করিবে, তাহাকেই একসঙ্গে এতগুলি ভাব দর্শককে প্রদর্শন করিতে হইবে! গাম্ভীর্য্যের সহিত "পশুপতি"র সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বালিকামূর্ত্তি ধরিয়া "পুকুরে হাঁস দেখিগে", বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে কত অভ্যাস ও চিন্তাসাধ্য তাহা ধারণা করাই কঠিন। গাম্ভীর্য্য ভাব

পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অবিকল বালিকাভাব ধারণ যদি স্বাভাবিক না হয় তাহা হইলে দর্শকের নিকট অতি হাস্যজনক হইয়া উঠে; "ন্যাকাম" বলিয়া অভিনেত্রী উপহাসাস্পদ হন! সেই কারণে ৺বঙ্কিমবাবু মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন যে "আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।"

আমার অভিনয় সম্বন্ধে কাগজে-কলমে যে বিস্তর সমালোচনা হইত, তাহা বলা বাহুল্য! সমালোচনায় অবশ্যই নিন্দা প্রশংসা উভয়ই ছিল, কিন্তু তাহাতে নিন্দা বা প্রশংসার কথা কি পরিমাণে ছিল তাহা যাঁহারা আমার অভিনয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আমি সমালোচনা বড় দেখিতাম না! তাহার কারণ এই যে, যদি প্রশংসার কথা শুনিয়া আমার দুর্ব্বলচিত্তে অহঙ্কার আসে তবে তো আমি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইব। যাহা হউক দয়াময় ঈশ্বর ঐ স্থানটীতে আমায় রক্ষা করিয়াছেন। আমার এখন যেমন নিজেকে হীন ও জগতের ঘৃণিতা বলিয়া ধারণা আছে, তখনও তাহাই ছিল। আমি সুধিগণের দয়ার ভিখারী ছিলাম! তখনকার আমার অভিনয় সম্বন্ধে পরম পূজনীয় স্বর্গীয় শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "রিজ এণ্ড রায়ৎ" পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার এক সপ্তাহের একখানির একটুকু লেখা আমি তুলিয়া দিতেছি–

"But last not least shall we say of Binodini? She is not only the Moon of Star company, but absolutely at the head of her profession in India. She must be a woman of considerable culture to be able to show such unaffected sympathy with so many and various characters and such capacity of reproducing them. She is certainly a Lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace. On Wednesday she played two very distinct and widely divergent roles, and did perfect justice to both. Her Mrs. Bilasini Karforma, the girl graduate, exhibited so to say an iron grip of the queer phenomenon, the Girl of the period as she appears in Bengal society. Her Chaitanya showed a wonderful mastery of the suitable

forces dominating one of the greatest of religious characters who was taken to be the Lord himself and is to this day worshipped as such by millions. For a young Miss to enter into such a being so as to give it perfect expression, is a miracle. All we can say is that genius like faith can remove mountains."

ইহার ভাবার্থ এই—

স্টার থিয়েটারের অভিনেত্রীবর্গের মধ্যে শ্রীমতী বিনোদিনী চন্দ্রমা স্বরূপা। বলিতে কি তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত অভিনেত্রীবৃন্দের শীর্ষস্থানীয়া। বিশেষ শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞা বলিয়া তিনি বহুবিধ চরিত্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তৎ চরিত্র প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং তিনি বিশিষ্টরূপ মার্জ্জিতারুচি বলিয়া, কোন অভিনেত্রীই এ পর্য্যন্ত তাঁহার মনোহারিত্ব অনুকরণ করিতে পারেন নাই। বিগত বুধবার (৭ই অক্টোবর ইং ১৮৮৫) তিনি দুইটী বিভিন্ন ও পরস্পর সম্পূর্ণরূপ বিসদৃশ চরিত্রের অভিনয় করিয়া, উভয় চরিত্রের সম্যক সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষিত রমণী গ্রাজুয়েড্ বিলাসিনী কারফরমার চরিত্র অভিনয়ে তিনি আধুনিক বঙ্গ সমাজের শিক্ষিতা মহিলার আদর্শরূপা, অদ্ভুত দৃশ্যের কঠোর ভাব প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আর যে চৈতন্যদেবকে ভগবান জানিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার চরিত্রাভিনয়ে ইনি যে প্রকৃতির বহুবিধ সক্ষম শক্তির উপর প্রাধান্য রাখিয়া থাকেন তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। কুমারী বিনোদিনীর পক্ষে এরূপ মহাপুরুষের চরিত্রাভিনয়ে সেই চরিত্রের সম্যক বিকাশ: প্রদর্শন, একপ্রকার অনৈসর্গিক ব্যাপারই বলিতে হইবে, তবে ঐশী প্রতিভা ও বিশ্বাস পর্ব্বতসদৃশ বাধাও অতিক্রম করিয়া থাকে!

আবার কত লোক নিন্দাও করিত, যে নিন্দা অভিনয় সম্বন্ধে নহে। বলিত যে এইরূপ লোকদ্বারা এরূপ উচ্চ অঙ্গের চবিত্র অভিনয় করাই দোষ। যাহার যাহা মনের ভাব বলিত! আমাদের সময়ে যেমন প্রশংসা ছিল তেমনি কোনরূপ ক্রটী হইলে নিন্দার জোরও তদধিক ছিল। অতি সামান্য ক্রটী হইলে অজস্র কটু কথাদ্বারা গালাগালি দিতেন।

আবার থিয়েটারে কার্য্যকালীন, সময়ে সময়ে কত দৈববিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। একবার প্রমীলার চিতা-আরোহণ সময়ে পরিহিত মাথার কাপর ও চুল

একেবারে জ্বলিয়া উঠে। একবার বৃটেনিয়া সাজিয়া শূন্যে তারের উপর হইতে নীচে একেবারে পড়িয়া যাই। এইরূপ দৈববিপদে যে কতবার পড়িয়াছি কত আর বলিব! অভিনয়কালীন যেমন আমার পার্টের দিকে মন থাকিত, তেমনি পোযাক পরিচ্ছদের সম্বন্ধেও যত্ন ছিল। ভূমিকা উপযোগী সাজিবার ও সাজাইবার আমার সুখ্যাতি ছিল। যখন নলদময়ন্তীর নূতন অভিনয় হয়, সেইসময় "নল"কে রং ও ড্রেস করিয়া দিবার জন্য কোন সাহেবের দোকান হইতে এক সাহেব আসিয়াছিল। যেহেতু অমৃতলাল মিত্র মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, রং ও পরচুলা অনেক টাকার আসিল। আমাকেও অনেকে বল্লেন যে "তুমিও রং করিয়া লও।" আমি বলিলাম যে আগে নল মহাশয়ের রং হউক দেখি। পরে "নলে"র রং করা দেখিয়া আমার মনঃপূত হইল না, বরং হাসি পাইল। যেন তেলচিটা তেলচিটা মনে হইতে লাগিল। আমি তখন বলিলাম যে "না মহাশয় আমার ড্রেস ও রং আমি আপনি করিতেছি দেখুন!" তখন আমি পোষাক ও রং সম্পূর্ণ করিলাম, সকলে দেখিয়া বলিলেন যে এই রং বেশ হইয়াছে। সেই অবধি অমৃতবাবু যতবার "নল" সাজিতেন ততবারই আমি রং করিয়া দিতাম। অন্য কেহ রং করিয়া দিলে তাঁর পছন্দ হইত না। ইহার দরুন অন্য এক্ট্রেসরা সময়ে সময়ে অসন্তুষ্ট হইত। আমার একদিন তাড়াতাড়ি থাকাতে বনবিহারিণী (ভুনী) নাম্নী একজন অভিনেত্রী বলিয়াছিল যে, "আসুন অমৃতবাবু, আমি রং করিয়া দিই।" অমৃতবাবু তাহার উত্তরে বলেন যে "রং ও পোষাক সম্বন্ধে বিনোদের পছন্দ সকলের হইতে উত্তম!" আমি সকল সময়েই নিজে নিজের পোষাক ও রং করিতাম, ড্রেসারেরা শুধু সংগ্রহ করিয়া দিতেন। আমি এমন সুরুচিসম্পন্নরূপে ড্রেস করিতে পারিতাম যে আমার পোষাকের কেহই প্রায় নিন্দা করিত না। আমার মাথার চুলগুলিকে যখন যেভাবে প্রয়োজন হইত সেই ভাবেই বিন্যস্ত করিতে পারিতাম। আমার চুলের কার্লিংগুলি এত সুন্দর হইত যে গিরিশবাবু মহাশয় আদর করিয়া বলিতেন যে, "একজন ইটালিয়ন কবি বলিতেন তাঁহার পুস্তকের একটী সুন্দর বালিকার মুখের এক স্থানের একটী তিলের জন্য তাঁহার জীবন দিতে পারিতেন; তোমার এই চুলের কার্লিংগুলি দেখিলে ইহার কত দাম ঠিক করিতেন বলিতে পারি না।" হইতে পারে গিরিশবাবু আমায় স্নেহ করিতেন বলিয়া খুব বেশী বলিতেন, কিন্তু আমার ড্রেসের কেহ কখন নিন্দা করেন নাই। এক্ষণকার "স্টার থিয়েটারের" সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও আমার ড্রেস করিবার অতিশয়

সুখ্যাতি করিতেন। থিয়েটারের অভিনেত্রীদের নিজ নিজ পোষাকের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখা প্রয়োজন। যেহেতু একজন লোককে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য সকল দশা অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া দর্শকসমীপে উপস্থিত হইতে হয়। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শান্তি, গম্ভীর নানারূপ মনের অবস্থা দেখাইতে হইবে, তখন একই জনকে মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গীর ভাবও নানারূপ দেখাইতে হইবে। সেইজন্য পোষাকেরও পরিবর্ত্তন চাই! কেননা "আগে দর্শন ডালি, পিছাড়ি গুণ বিচারি।"

যে সময় আমি থিয়েটারের কার্য্যে জীবিকা অতিবাহিত করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে বলিয়াছি তো যে সুকার্য্য কিছু করি আর না করি বুদ্ধির বিপাকে প্রবৃত্তির অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকিব। "ষ্টার থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করিবার কালীন এত ঘাত-প্রতিঘাত সহিতে হইযাছিল যে ইহার জের থিয়েটার হইতে অবসর লওযাব পরও শেষ হয় নাই। কোন এক রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। আমার গুর্ম্মুখ বাবুর আশ্রয় লইবার সময় আমার পূর্ব্ব আশ্রয় দাতা সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত অতিশয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম হওয়ায় আমাকে লুকাইয়া থাকিতে হয়। পরে সর্ব্বকার্য্য সমাধা কবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ হইলে একদিন পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত যুবক আমার সহিত দেখা কবিয়া বলিলেন, যে "বিনোদ, তুমি আমায় প্রতারণা করিয়া তোমার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইলে, কিন্তু এ তোমার ভুল। তুমি কতদিন লুকাইয়া থাকিবে? আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমার শত্রুতা করিব। আমার কথার কথনই ব্যতিক্রম হইবে না। তুমি ঠিক জানিও আমার কথা মিথ্যা হইবে না। মৃত্যুর পরও তোমায় দেখা দিব জানিও।" আমি তখন একথা বিশ্বাস করি নাই, বোধহয় আমার মুখে একটু অবিশ্বাসের হাসিও দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ১২৯৬ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন আমি ইহার সত্যতা অনুভব করিতে সক্ষম হই। তখন আমি থিয়েটার হইতে অবসর লইয়া ঘরে বসিয়াছিলাম। উক্ত রবিবারে সবেমাত্র আমার ঘরে সন্ধ্যার আলো দিয়া গিয়াছে। আমি সেদিন আলস্য ভাবে বিছানায় সন্ধ্যার সময়ই শয়ন করিয়াছিলাম। আমার বেশ মনে আছে যে, আমি নিদ্রিত ছিলাম না। তবে মনটা কেমন অবসন্ন ছিল, সেইজন্য সন্ধ্যার সময়ই শুইয়াছিলাম, কোন কারণ না থাকিলেও যেন দেহ মন অবসন্ন হইয়া আসিতে ছিল। আমি অর্দ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে আমার ঘরের প্রবেশদ্বারের দিকে চাহিয়াছিলাম, এমন সময় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে সেই বাবুটি মলিন

ভাবে আমার ঘরের সম্মুখের দ্বার দিয়া অতি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর আসিয়া আমার মাথার দিকে খাটের ধারে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন ! এবং আমায় সম্বোধন করিয়া অতি ধীর ও শান্ত ভাবে বলিলেন, যে "মেনি, আমি আসিয়াছি !" তিনি প্রায়ই আমায় "মেনি" বলিয়া ডাকিতেন। আমার বেশ মনে আছে যে যখন তিনি ঘরের মধ্যে আসেন তখন আমার দৃষ্টি বরাবর তাঁর দিকেই ছিল। তিনি খাটের নিকট দাঁড়াইবামাত্র আমি চমকিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "একি ! তুমি আবার কেন আসিয়াছ ?" তিনি যেন কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি যাইতেছি তাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।" তাঁহার কথা কহিবার সময় কোনরূপ চঞ্চলতা বা অঙ্গ চালনা কিছুই ছিল না, যেন মাটীর তৈয়ারী পুতুলের মতন মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল ! আমার একবার মাত্র মনে হইল যে তিনি একটু সরিয়া আমার দিকে হাত তুলিলেন। একটু ভয়ও হইল, আমি ভয়ে কিছু পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া বলিলাম, "সে কি। তুমি কোথায় যাইতেছ ? আর এত দুর্ব্বল হইয়াছ কেন ?" তিনি যেন আরও বিষণ্ণ ও স্থির হইয়া বলিলেন, "ভয় পাইও না আমি তোমায় কিছু বলিব না, আমি বলিয়াছিলাম যে আমি যাইবাব সময় তোমায় বলিয়া যাইব, তাই বলিতে আসিয়াছি, আমি যাইতেছি !" এই কথা বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় সেই দরজা দিয়াই চলিয়া যাইলেন !

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন উপর হইতে উচ্চৈঃস্বরে আমার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলাম, "মা উপরে কে আসিয়াছিল ?" মা বলিলেন, "কে উপরে যাইবে ? আমি তো এই সিঁড়ির নীচেই বসিয়া রহিয়াছি।" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ মা অমুক বাবু যে আসিয়াছিলেন !" আমার মা হাসিয়া বলিলেন, "দরজায় মিশির বসিয়া আছে, আমি সদর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি, কে আসিবে ? তুই স্বপ্ন দেখ্‌লি নাকি ? (মিশির আমাদের দরওয়ান) কোন ব্যক্তি বাহির হইতে আসিলে অগ্রে সে খবর দেয়।" তখন আর কিছু না বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া মনে করিতে লাগিলাম, যে কি হইল ? সত্য কি স্বপ্ন দেখিলাম নাকি ? তাহার পর দিবস সন্ধ্যায় আমি বাটীর ভিতর বারান্দায় বসিয়া আছি, আর আমার মাতা কি কার্য্যবশতঃ সদর দরজায় গিয়াছিলেন। এমন সময় রাস্তার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি একখানা ঠিকাগাড়ীর ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, ওগো গিন্নি !

শুনিয়াছ, গত কল্য সন্ধ্যার সময় বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। সেই লোকটা মৃত ব্যক্তির একজন কর্ম্মচারী! তাহার কথা রাস্তা হইতে আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলাম সত্যই কি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি সত্যপালন করিয়া গেলেন। পূর্ব্ব দিনের স্মৃতি আসিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার শরীর যেন বরফের মত শীতল অনুভব হইতে লাগিল।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা লিখিবার উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নহে, মৃত্যুর পর মানুষ যে স্ব-রূপে কোন জীবিত ব্যক্তির নয়নগোচর হইতে পারে, ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু অন্য কেহ কখন যদি এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনের বিশ্বাসকে আরও একটু বলবান করিবার জন্য ইহা লিখিলাম।

আর একটী ঐরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা আমার একজন আত্মীয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যদিও সে ঘটনার সঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি সাদৃশ্য বোধে লিখিলাম।

আমার কনিষ্ঠা কন্যার যখন মৃত্যু হয়, সেইদিন ঠিক সেই সময়ে আমার সেই কন্যা অথবা তাহার ছলনাময়ী মূর্ত্তি সেই আত্মীয়টীর প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমিও যেমন আলস্য-জড়িত-দেহে শুইয়াছিলাম মাত্র, তিনিও সেইরূপ সুষুপ্তি হইতে অন্তরে ছিলেন। আমার কন্যা-মূর্ত্তিকে দেখিয়া বলেন, "একি! কালো! তুই এখানে?" তিনি তখন কলিকাতার বাহিরে বাহিরে বাস করিতেছিলেন। মূর্ত্তি উত্তর করিল, "হ্যাঁ!" আত্মীয় তাহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! এত অসুস্থ শরীরে তুই এলি কি করে মা?" ছায়াময়ী উত্তর করিল, "এলুম!" দুটী তিনটী কথা কহিয়া তিনি যেমন উঠিয়া বসিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না! নিমেষে অদৃশ্য হইল! মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণাম মৃত্যু! কিন্তু তাহার শেষ গতি কি তাহার মীমাংসা কে করিবে? বহু দার্শনিকের বহু প্রকার সিদ্ধান্ত! কাজেই লেখনী এখানে মূক! তবে মৃত মনুষ্য যে কথা কহিতে পারে ইহাও আশ্চর্য্য! হইতে পারে আমার ভ্রম এবং অনেকেও তাহা বলিতে পারেন। যদি কেহ কখন মৃত আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন, তবে তিনিই আমার কথা সত্য বলিয়া মানিতে পারেন! কিন্তু আত্মা যদি অবিনাশী হয় এবং ইচ্ছাশক্তিতে যদি দেহের গঠন হয় তবে এইগুলি বোধ হয় অবিশ্বাস্য নয়।

আমার এই ক্ষুদ্র কথার ভিতর ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে লিখিবার অন্য উদ্দেশ্য নাই; তবে, যে ষ্টার থিয়েটার স্বদেশে, বিদেশে, সুযশে, সুনামে পরিপূর্ণ ছিল— আমি এক্ষণে সে ষ্টার থিয়েটার হইতে বহু দূরে; হয় তো আমার স্মৃতি পর্য্যন্ত

এক্ষণে তাহার নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেননা সে বহু দিনের কথা! চিরদিন কখন সমান যায় না। আজ জগৎ জোড়া যশের বোঝা লইয়া সংসার ক্ষেত্রে যে "ষ্টার থিয়েটারে"র নাম উন্নত বক্ষে অবস্থান করিতেছে, সেও একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে বিশেষ আত্মীয়া বলিয়া মনে করিত। এক্ষণে শত আবাধনায় যাহাদেব একবারমাত্র দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু এমন দিন গিয়াছে যে এই অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি আত্মত্যাগ না করিলে হয় তো কোন্ আঁধারের কোণে কাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত! তাই বলি চিরদিন কখন সমান যায় না! লোকে দিন পায়, আবাব সেদিনও চলিয়া যাইতে পারে! হৃদয় শোকে তাপে বিজড়িত হইলে, যাতনায় অস্থির হইলে, যাহাদের আপনাব মনে করা যায় বা যাহারা এক সময় অতিশয় আত্মীয়তা জানাইযাছিল, তাহাদেব নিকট সহানুভূতি পাইতে আশা করে, তাই আপনা হইতে পূর্ব্ব স্মৃতি মনে আসে। সেজন্য পূর্ব্ব কথা তুলিলাম। ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। আব আমাব মত ক্ষুদ্রপ্রাণা স্ত্রীলোকের এক্ষণকাব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কোন অতিরঞ্জিত কথা বলিবার সাহস কেন হইবে, আব আমি গর্ব্ব করিয়াও কোন কথা বলি নাই! যে স্বার্থ আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ কবিযাছিলাম, তাহাব জন্য অপবে বাধ্য নহে। শুদ্ধ বুদ্ধিহীনা স্ত্রীস্বভাবেব দুর্ব্বলতা বশতঃ একথা উঠিল, নচেৎ এ ক্ষুদ্র কথা উল্লেখযোগ্যও নহে এবং ইহা বহুদিনেব কথা বলিয়া হয় তো কোন কোনটা গোলও হইতে পারে, ইহার জন্য এখন যাঁহারা আমার সহিত মৌখিক সদ্ভাব রাখিয়াছেন তাঁহারা না বিরূপ হযেন। বহুদিনের ঘটনা মনে করিয়া লিখিতে গেলে হয় তো তাহাব দু' একটী গোলও হইতে পারে।

এই ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে জীবনের প্রথম উদ্ভাসিত অবস্থায় দিন কাটিয়া গিয়াছিল। বাহ্যিক অবস্থা তো বড়ই ঘৃণিত, পতিত। কিন্তু যাঁহাবা এই ক্ষুদ্র লেখা দেখে ঘৃণা বা উপহাস করিবেন, তাঁহারা যেন এ পুস্তক পাঠ না করেন। কেন না রমণী জীবনে যাহা প্রধান ক্ষত স্থান তাহাতে লবণ দিয়া নাই বিরক্ত কবিলেন। যাঁহারা দুঃখিনী হতভাগিনী বলিয়া একটুখানি দয়া করিয়া সহানুভূতি দেখাইবেন তাঁহারা যেন এ হৃদয়ের মর্ম্ম ব্যথা বুঝেন। এই ভাগ্যহীনা হতভাগিনীর হৃদয় যে কত দীর্ঘশ্বাসে গঠিত, কত মর্ম্মভেদী যাতনার বোঝা হাসিমুখে চাপা, কত নিরাশা হা-হুতাশ, দিবানিশি আকুলভাবে হৃদয় মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে— কত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত বাসনা, যাতনার জলন্ত জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে— তাহা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে

আশ্রয়াভাবে বারাঙ্গনা হয় বটে, কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণী-হৃদয় লইয়া সংসারে আসে। যে রমণী স্নেহময়ী জননী, তাহাবাও সেই রমণীর জাতি! যে রমণী জ্বলন্ত অনলে পতি সনে পুড়িয়া মরে, আমরাও সেই একই নারী-জাতি। তবে গোড়া হইতে পাষাণে পড়িয়া আছাড্ পিছাড্ খাইতে খাইতে একেবারে চুম্বক ঘর্ষিত লৌহ যেরূপ চুম্বক হয়, আমরাও সেইরূপ পাষাণে ঘষিত হইয়া পাষাণ হইয়া যাই! আরও একটী কথা বলি, সকলেই সমান নহে, যে জীবন অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহা এক রকম নির্জীব ভাবে জড পদার্থের মত চলিয়া যায়। কিন্তু যে জীবন দূরে দূরে উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করিতেছে অথচ পতিত হইয়া আত্মীয়, সমাজ, স্বজন-বন্ধন হইতে বঞ্চিত তাহাদের জীবন যে কতদূব কষ্টকব, যন্ত্রণাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে পারিবে না। বাবাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? জননী জঠর হইতে তো একেবারে ঘৃণিতা হয় নাই? জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদেব জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না? ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে? কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চিব কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নবক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পুজিত আদৃত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন্ কি? যাঁহারা লোকালয়ে ঘৃণা দেখাইয়া লোক চক্ষুর অগোচবে পরম প্রণয়ীব ন্যায় আত্মত্যাগের চবম সীমায় আপনাকে লইয়া গিয়া ছলনা কবিয়া বিশ্বাসবতী অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন কবিয়া থাকেন, হৃদয়ের ভালবাসা দেখাইয়া আত্ম-সমর্পণকারী বমণী হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালাইয়া অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলিয়া অন্তর্হিত হন, তাঁহারা কিছুই দোষী নহেন। দোষ কাহাদের? যে সকল হতভাগিনীরা সুধাবোধে বিষপান করিয়া চিরজীবন জর্জ্জরিত হইয়া হৃদয়-জ্বালায় জ্বলিয়া মরে, তাহাদের কি? যে ভাগ্যহীনা বমণীরা এইরূপে প্রতারিতা হইয়া আপনাদের জীবনকে চির শ্মশানময় করিয়াছে, তাহারাই জানে যে বারাঙ্গনা জীবন কত যন্ত্রণাদায়ক! যাতনার তীব্রতা তাহারাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। আবার এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্য ঐ অবলা-প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন। যেমন ভাগ্যহীনাদেব সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহারা যদি তাহাদের সুকুমারমতি-বালক-বালিকাদের সৎপথে রাখিবার জন্য কোন বিদ্যালয়ে বা কোন

কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রেরণ করে, তখন ঐ সমাজপতিরাই শত চেষ্টা দ্বারা তাহাদের সেই স্থান হইতে দূর করিতে যত্নবান হন। তাঁহাদের নীতিজ্ঞতার প্রভাবে অভাগা বালক বালিকারাও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পাপ পথের পথিক হইতে বাধ্য হইয়া বিষ-দৃষ্টির দ্বারা জগতের দিকে চাহিয়া থাকে। সুকুমারমতি-বালিকাদের পবিত্র সরলতা হৃদয় হইতে যাইতে না যাইতে, তাহাদের হৃদয়ে মধুরতা সমাপ্ত হইতে না হইতে, তাহাদের কচি হৃদয়খানি অবিশ্বাস অনাদরের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে। এমন পুরুষপ্রবর অনেকে আছেন, যে নিজের নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, আত্মদমনে অক্ষম হইয়া, একজন অবলার চিরজীবনের শান্তি নষ্ট করিয়া—সমাজে ঘৃণিত, স্বজনে বঞ্চিত, লোকালয়ে লাঞ্ছিত, মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করিয়া পৌরুষ জ্ঞান করেন। হায়! ভাগ্যহীনা রমণী, কি ভুল করিয়াই আত্মবিনাশ কর! পঙ্কে যে পদ্ম ফুল ফুটে তাহা দেবতা মস্তক পাতিয়া লন, কেননা তিনি ঈশ্বর। আর মানুষেরা সুকুমারমতি বালিকাগণকে লতা হইতে বিচ্যুত করিয়া পদে দলিত করেন, কেননা ইহারা মানুষ! যাক্। সে ভুল সারাজীবনকে বিষময় করে, তাহা যে কি ভয়ানক ভুল, তাহা এই ভাগ্যহীনারাই বুঝে! শত দোষ করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু "নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ।"

এক্ষণে নানাকারণ বশতঃ থিয়েটার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখময় জীবন নির্জ্জনে অতিবাহিত করিতেছিলাম। এই নানা কারণের প্রধান কারণ যে আমায় অনেক রূপে প্রলোভিত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া আমার সহিত যে সকল ছলনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। থিয়েটার বড় ভালবাসিতাম তাই কার্য্য করিতাম। কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই। তাই অবসর বুঝিয়া অবসর লইলাম। এই দুঃখময় জীবনের একটী সুখের অবলম্বন পাইয়াছিলাম। একটী নির্ম্মল স্বর্গচ্যুত কুসুমকলিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া এ কলঙ্কিত জীবনকে শান্তিদান করিতেছিল। কিন্তু এই দুঃখিনীর কর্ম্মফলে তাহা সহিল না। আমায় শান্তির চরমসীমায় উপস্থিত করিবার জন্য সেই অনাঘ্রাত স্বর্গীয় পারিজাতটী আমায় চিরদুঃখিনী করিয়া এই নৈরাশ্যময় জীবনকে জ্বালার জ্বলন্ত পাবকে ফেলিয়া স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। সে আমার বড় আশা ও আদরের ধন ছিল। তাহার সরল পবিত্র চক্ষু দুটীতে স্বর্গের সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িত! সেই স্নেহময় নির্ভর পরায়ণা হৃদয়টীতে দেবীর পবিত্রতা, ফুলের অসীম সৌন্দর্য্যরাশি, জাহ্নবীর পবিত্র কুল কুল ধ্বনি, বিকশিত পদ্মের ন্যায়, মধুময় হৃদয়ের পবিত্রতা রাশি সদাই উথলিয়া আমার জীবনকে আনন্দময় করিয়া

রাখিত। তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা-রহিত নির্ম্মলতা কত উচ্চে আমাকে আকর্ষণ করিত। এ দেবতার দয়ার দান, অভাগিনীর ভাগ্য দোষে দেবতার দান সহিল না। আমার সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া আমার অন্ধকার হৃদয়ে বিষময় বাতি জ্বালিয়া দিয়া সে আমার চলিয়া গিয়াছে। এখন আমি একা পৃথিবীতে, আমার আর কেহই নাই, সুধুই আমি একা। এখন আমার জীবন শূন্য মধুময়! আমার আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, কার্য্য নাই, কারণ নাই! এই শেষ জীবনে ভগ্নহৃদয়ে জ্বালাময়ী প্রাণ লইয়া অসীম যন্ত্রণার ভার বহিয়া আমি মৃত্যু পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আশা, উদ্যম, ভরসা, উৎসাহ, প্রাণময়ী সুখময়ী কল্পনা, সকলই আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অহরহঃ সুধু যন্ত্রণার তীব্র দংশন! এই আমি—অসীম সংসার প্রান্তরে একটী সুশীতল বটবৃক্ষের একটু ছাওয়ায় বসিয়া কতক্ষণে চির শান্তিময় মৃত্যু আসিয়া দয়া করিবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছি। সেই সুবিশাল সুশীতল তরুই আমার এই জীবন্মৃত অবস্থার আশ্রয় স্থান! আমার অন্তর ব্যথা অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইলেও আমি ইহা লিখিলাম। কেননা লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার আর আমার ভয় নাই। লোকেই সে ভয় দূর করিয়াছে। তাহাদের নিন্দা বা সুখ্যাতি আমার নিকট সকলই সমান! গুণী, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা লিখেন লোকশিক্ষার জন্য, পরোপকারের জন্য, আমি লিখিলাম, আমার নিজের সান্ত্বনার জন্য, হয়তো প্রতারণা বিমুগ্ধ নরক পথে পদবিক্ষেপোদ্যতা কোন অভাগিনীর জন্য। কেননা আমার আত্মীয় নাই, আমি ঘৃণিতা, সমাজবর্জ্জিতা, বারবণিতা. আমার মনের কথা বলিবার বা শুনিবার কেহ নাই। তাই কালি-কলমে লিখিয়া আপনাকে জানাইলাম। আমার কলুষিত কলঙ্কিত হৃদয়ের ন্যায় এই নির্ম্মল সাদা কাগজকেও কলঙ্কিত করিলাম। কি করিব! কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ব্যতীত আর কি আছে?

প্রথম খণ্ডের শেষের দুটী কথা

এতদিনে আমার কর্ম্মতরু সম্পূর্ণরূপে ফলফুলে পুর্ণ হইয়া আমার অদৃষ্টাকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ছাইয়া উঠিল। এইবার সব ঠিক্।

কারণ কি তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি। অনেক দিবস হইল ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমার নাট্যজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি; তিনি ইহার প্রতি ছত্র, প্রতি লাইন দেখিয়া শুনিযা দেন, তিনি দেখিয়া ও বলিয়া দিতেন মাত্র, কিন্তু একছত্র কখন লিখিযা দেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে আমি সরলভাবে সাদা ভাষায় যাহা লিখি তাঁহাব নিকট সেই সকল বড ভালই বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে আমার জীবনী লিখিয়া **আমার কথা** নাম দিয়া ছাপাইবাব সঙ্কল্প করি। তিনিও এবিষযে বিশেষ উদ্যোগী হন। কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে রোগ যাতনা ভোগ করিবার জন্য ও নানা ঝঞ্চাটে কতদিন চলিযা যায়। পরে তাঁহাব পরিচিত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায ছাপাইবাব জন্য কল্পনা করেন। কিন্তু আমার কতক অসুবিধা বশতঃ হ্যাঁ—না, এইরূপ নানা কারণে তখন হয় নাই। তাহাব পর আমি মবণাপন্ন বোগগ্রস্থ হইযা চারি মাস শয্যাগত হইয়া পডিযা থাকি, আমার জীবনের কোন আশাই ছিল না, শত শত সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, নানাবিধ চিকিৎসা শুশ্রূষা, দৈবকার্য্য করিয়া, প্রায অনাহারে, অনিদ্রায বহু অর্থ ব্যয়ে দেবতাস্বরূপ আমার আশ্রয়দাতা দযামব মহামহিমান্বিত মহাশয় আমায মৃত্যুমুখ হইতে কাডিযা লইলেন। ডাক্তার, সন্ন্যাসী, ফকির, মোহন্ত, দৈবজ্ঞ, বন্ধু বান্ধব সকলে একবাক্যে বলিযাছিলেন, যে "মহাশয় সুধু আপনার ইচ্ছাব জোরে (Will force) ইনি জীবন পাইলেন।" সেই দযাময় তাঁহাব ধন সম্পত্তি, তাঁহাব মহজ্জীবন একদিকে, আর এই ক্ষুদ্র পাপীয়সীব কলঙ্কিত জীবন একদিকে করিয়া দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিলেন। আমি ব্যাধির যাতনায বিগত নাডী হইয়া জ্ঞান হারাইলে, তিনি আমার মস্তকে হাত রাখিযা স্নেহময় চক্ষুদুটী আমার চক্ষের উপর রাখিয়া, দৃঢভাবে বলিতেন, "শুন, আমাব দিকে চাহ, অমন করিতেছ কেন? তোমার কি বড যাতনা হইতেছে? তুমি অবসন্ন হইও না! আমি জীবিত থাকিতে তোমায **কখনও মরিতে দিব না**। যদি তোমার আয়ু **না থাকে** তবে দেবতা সাক্ষী, ব্রাহ্মণ সাক্ষী, তোমার এই মৃত্যুতুল্য দেহ সাক্ষী **আমার অৰ্দ্ধেক পরমায়ু তোমায় দান** করিতেছি, তুমি সুস্থ হও! আমি বাঁচিযা **থাকিতে তুমি কখনই মরিতে পাইবে না**।"

সেই সময় তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অমৃতময় স্নেহপূর্ণ জ্যোতিঃ বাহির হইয়া আমার রোগক্লিষ্ট যাতনাময় দেহ অমৃতধারায় স্নাত করাইয়া শীতল করিয়া দিত। সমস্ত রোগ-যাতনা দূরে চলিয়া যাইত। তাঁহার স্নেহময় হস্ত আমার মস্তকের উপর যতক্ষণ থাকিত আমার রোগের সকল যাতনা দূরে যাইত।

এইরূপ প্রায় দুই তিনবার হইয়াছিল; দুই তিনবারই তাঁহারই হৃদয়ের দৃঢ়তায় মৃত্যু আমায় লইতে পারে নাই। এমন কি শুনিয়াছি অক্সিজেন গ্যাস দিয়া আমায় ১২।১৩ দিন রাখিয়া ছিল। যাঁহারা সে সময় আমার ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহারা এখনও সকলে বর্ত্তমান আছেন। সেই সময় মাননীয় বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়, উপেনবাবু, কাশীবাবু প্রভৃতি প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া আমায় যত্ন করিতেন, সকলেই এ কথা জানিত।

বুঝি এইরূপ সুস্থদেহে অসীম যাতনার বোঝা বহিতে হইবে বলিয়া, অতি হৃদয়শূন্য ভাবে লোকের নিকট উপেক্ষিত হইতে হইবে বলিয়া, অবস্থার বিপাকে এইরূপ দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইবে বলিয়া, অসহায় অবস্থায় এইরূপ অসীম যাতনার বোঝা বুকে করিয়া সংসার সাগরে ভাসিতে হইবে বলিয়া, আমার ধ্রুবদৃষ্ট তাঁহার বাসনার সহিত যোগ দিয়াছিল! বোধহয় তাহাতেই সেই সময় আমার মৃত্যু হয় নাই। অথবা ঈশ্বর তাঁহার পরম ভক্তের বাক্যের ও কামনার সাফল্যের জন্যই আমায় মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া দিলেন! কেননা আমার হৃদয় দেবতা তিলেকে শতবার বলিতেন, যে "সংসারের কাজ করি সংসারের জন্য, শান্তি তো পাই না, তাই বলিতেছি যে তুমি আমার আগে কখন মরিতে পাইবে না।" আমি যখন তাঁহার চরণে ধরিয়া কাতরে বলিতাম, "এখন আর ও সকল কথা তুমি আমায় বলিও না। ত্রিসংসারে এ হতভাগিনীর তুমি বই আশ্রয় নাই। এ কলঙ্কিনীকে যখন সংসার হইতে তুলে আনিয়া চরণে আশ্রয় দিয়াছিলে তখন তাহার সকলই ছিল! মাতামহী, মাতা, জীবন জুড়ান কন্যা, বঙ্গভূমের সুখসৌভাগ্য, সুযশ, আশাতীত সম্পদ, বঙ্গ রঙ্গভূমের সমসাময়িক বন্ধুগণের অপরিসীম স্নেহমমতা সকলই ছিল, তোমারই জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছি, তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি ফেলে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াইব।" তিনি হাসিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, যে "সেজন্য ভেব না, আমার অভাব ব্যতীত তোমার অন্য কোন অভাবই থাকিবে না। এমন বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই যে এতদিন তোমায় এত আদরে, এত যত্নে আশ্রয় দিয়া, তোমার এই রুগ্ন অসমর্থ অবস্থায় তোমার শেষ জীবনের দারুণ অভাবের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাইব। তাহার প্রমাণ দেখ যে,

আমার আত্মীয়দিগের সহিত একভাবে তোমায় আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। এত জেনে শুনে যে তোমায় বঞ্চিত করবে—আমার অভিশাপে সে উৎসন্ন যাইবে!”

তাঁহার মত সহৃদয় দয়াময় যাহা বলিবার তাহা বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু কার্য্যকালে আমার অদৃষ্ট, তীক্ষ্ণ অসি হস্তে আমাব সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমার জীবনভবা সমস্ত আশাকে ছেদন করিতেছে! আজ তিন মাস হইল এই অসহায়া অভাগিনী কাহারও নিকট হইতে তিন দিনের সহানুভূতি পাইল না, অভাগিনীর ভাগ্য! দোষ কাহারও নয়—কপাল! প্রাক্তনের ফল!! পাপিনীর পাপের শাস্তি!!!

এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমি বৎসরাবিক উত্থানশক্তিহীন হইয়া জড়বৎ ছিলাম। পরে আমায় চিকিৎসকদিগের মতানুযায়ী বহুস্থানে, বহু জল-বায়ু পরিবর্ত্তন কবাইয়া, হৃদয়দেবতা আমাব স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে দান কবিয়া গিযাছেন।

এইরূপ নানা অসুবিধায় এই পুস্তক তখন ছাপান হইল না। ৺গিবিশবাবুও দারুণ ব্যাধিতে স্বর্গে গমন কবিলেন। তিনিও আমাব বলিযাছিলেন, যে “বিনোদ! তুমি আমার নিজের হাতেব প্রস্তুত, সজীব প্রতিমা। তোমাব জীবন-চরিতের ভূমিকা আমি স্বহস্তে লিখিয়া তবে মরিব”. কিন্তু একটা কথা আছে, যে “মানুষ গড়ে, আব বিধাতা ভাঙ্গে”, (“Man proposes but God disposes”) আমার ভাগ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পবে ভাবিলাম যে যাহা হয হইবে, বই হউক আর নাই হউক, আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা বড়ই ছিল যে আমি আমার অমৃতময় আশ্রয়-তরুর সুশীতল সুধামাখা শান্তি ছাওয়াটুকু এই বেদনাময় ব্যথিত বুকের উপর প্রলেপ দিযা চির নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িব, ঐ নিঃস্বার্থ স্নেহ ধারাব আচবণে আমার কলঙ্কিত জীবনকে আবরিত রাখিয়া চলিয়া যাইব। ওমা! কথায় আছে কিনা? যে “আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে।” একটী লোক একবার তাহার অদৃষ্টের কথা গল্প করেছিল, এখন আমার তাহা মনে পড়িল। গল্পটী এই:—

উপযুক্ত লেখাপড়া জানা একটী লোক স্বদেশে অনেক চেষ্টায় কোন চাকুরী না পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছিল। একদিন তাহার একটী বন্ধু বলিলেন, যে “বন্ধো! এখানে তো কোন সুবিধা করিতে পারিতেছ না, তবে ভাই একবার বিদেশে চেষ্টা দেখ না।” তিনি অনেক কষ্টে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন। সেখানেও কয়েক দিন বিধিমতে চেষ্টা করিয়া কিছু উপায় করিতে না পারিয়া, একদিন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ঘুরিয়া এক মাঠের উপর বৃক্ষতলায় বসিয়া

আছেন। এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে রৌদ্রের উত্তপ্ত বাতাসের সহিত পশ্চাৎ দিকে কে যেন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতেছে। সচকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?" উত্তর পাইলেন, "তোমার অদৃষ্ট"। তিনি বলিলেন, "বেশ বাপু! তুমিও জাহাজ ভাড়া করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছ? তবে চল, দেশে ফিরিতেছি, সেইখানেই আমায় লইয়া দড়িতে জড়াইয়া লাট্টু খেলিও।"

আমিও একদিন চমকিত হইয়া দেখি যে আমার অদৃষ্টের তাড়নায়, আমার আশ্রয় স্বরূপ সুধামাখা শান্তি-তরু, মহাকালের প্রবল ঝড়ে কাল-সমুদ্রের অতল জলের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া যাইল। আমার সম্পূর্ণ ঘোর ছাড়িতে না ছাড়িতে দেখি যে আমি এক মহাশ্মশানের তপ্ত চিতাভস্মের উপর পড়িয়া আছি। আবহকাল হইতে যে সকল হৃদয় অসীম যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া চিতার ছাইয়ে পরিণত হইয়াছে, তাহারাই আমার চারিধার ঘেরিয়া আমার বুকের বেদনাটাকে সহানুভূতি জানাইতেছে। তাহারা বলিতেছে, "দেখ, কি করিবে বল? উপায় নাই। বিধাতা দয়া করে না, বা দয়া করিতে পারে না। দেখ, আমরাও জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, তবুও যায় নাই গো! সে সব জ্বালা যায় নাই! শ্মশানের চিতা ভস্মে পরিণত হয়েও সে স্মৃতির জ্বালা যায় নাই! কি করিবে? উপায় নাই।"

তবে যদি কোন দয়াময় দেবতা, মানুষ হইয়া বা বৃক্ষরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন, তাহারা কখন তোমার মত হতভাগিনীকে শান্তি-সুধা দানে সান্ত্বনা দিতে পারেন। তাঁরা দেবতা কি না? পৃথিবীর লোকের কথার ধার ধারেন না। আর কুটিল লোকের কথায় তাঁহাদের কিছু আসে যায় না। সূর্য্যের আলোক যেমন দেব-মন্দির ও আঁস্তাকুড় সমভাবেই আলোকিত করে—ফুলের সৌরভ যেমন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সমভাবে গন্ধ বিতরণ করে—ইঁহারাও তেমনি সংসারের হিংসুক, নিন্দাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর লোকদিগের নিন্দা বা সুখ্যাতির দিকে ফিরেও চাহেন না।

তাঁহারা দেবলোক হইতে অপরিসীম স্নেহপূর্ণ সুধামাখা আত্মানন্দময় হৃদয় লইয়া মর্ত্ত্যভূমে দুঃখীর প্রতি দয়া করিবার জন্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহৃদয়তা দেখাইবার কারণ, বন্ধুর প্রতি সমভাবে সহানুভূতি করিবার ইচ্ছায়, সন্তানের প্রতি পরিপূর্ণ বাৎসল্য স্নেহ প্রদানে লালন পালন করিতে, পত্নীর প্রতি সতত প্রিয়ভাবে প্রেমদানে তুষ্ট করিতে, আজ্ঞাকারীর ন্যায় সকল অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সতত প্রস্তুত! প্রেমময়ীর নিকট অকাতরে প্রেমময় হৃদয়খানি বলি দিতে

—ভালবাসার আকাঙ্ক্ষিতাকে আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসিতে—আশ্রিতকে সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিপালন করিতে—পাত্রাপাত্র অভেদ জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষিতের অভাব পুর্ণ করিবার জন্য অযাচিতভাবে লুকাইয়া দান করিতে (কত সঙ্কুচিত হ'য়ে, যদি কেহ লজ্জা পায়)—ভগবানে অটল ভক্তি রাখিবার বাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিতে —আত্মসুখ ভুলিয়া দেবসেবা ব্রতে সুখী হইতে—প্রাণ ভরিয়া অক্লান্ত হৃদযে পরোপকার করিতে আইসেন। ওগো তোমাকে আর কতই বা বলিব ! তাঁহাদেব তুলনা স্বধু তাঁহারাই—যাহা লইয়া দেবলোকে দেবতা গঠিত হইয়া থাকে, তাঁহারা সেখানকার সেই সকলই লইয়া এই যন্ত্রণাময় মবজগতে অতি দুঃখীকে দয়া করিতে আইসেন। সংসারের গতিকে ক্রূর হৃদয়ের বিষদৃষ্টিতে যখন সেই মানবরূপ দেবতা বা তরুবর অবসন্ন হইয়া পড়েন, তখনই চলিয়া যান। যে অভাগাংও অভাগিনীরা সেই পবিত্র ছাওয়াব কোলে আশ্রয পাইযা চিরদিনেব মত ঘুমাইযা পড়ে, সংসাবেব যাতনাময় কোলাহলে আব না জাগিয়া উঠে, তাহাবাই হয় তো সেই দেবহৃদযের পবিত্রতাব স্পর্শে শান্তিধামে যাইতে পারে , আবার যাহারা অদৃষ্টের দোষে সেই শান্তি সুধাময় তরুচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত হয় , তাহারাই এই তোমার মত যাতনায় পোড়া শ্মশানের চিতাভস্মের উপর পড়িযা গড়াগড়ি যায। তোমাব মত দুর্ভাগিনী-দেব আর উপায নাই গো ! যাহাবা অমূল্য বত্ন পাইয়াও হারাইযা ফেলে, তাদেব উপায় নাই। আর তোমাদের মত পাপিনীদের হৃদয বড কঠিন হয় ও হৃদয় শীঘ্র পুড়েও না, ভাঙ্গেও না, এত জ্বালায় লোহাও গলিয়া যায়। তোমার মত হত-ভাগিনী বুঝি আমাদের মধ্যেও নাই, ও রকম কঠিন পাষাণ হৃদয়ের কোন উপায় নাই , তা কি কবিবে বল ? এই সকল কথা বলিয়া সেই জ্বালা যন্ত্রণায় পোড়া হৃদয়ের চিতাভস্মগুলি হায ! হায় ! করিয়া উঠিল। তাহাদেব সেই ভস্ম হইতে হায় ! হায় ! শব্দ শুনিযা আমার তখন খানিকটা চৈতন্য হইল। মনের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক আঘাতের মত আঘাত লাগিল, মনে পড়িল যে আমিও তো ঐরূপ একটী সুধাময তরুব সুশীতল ছাযায় আশ্রয় পাইযাছিলাম। তবে বুঝি সে তরুবরটী ঐ রকম দেবতাদেব জীবনীশক্তি দ্বারা পরিচালিত "দেবতরু !" ঐ চিতা-ভস্মগুলি যে সকল গুণেব কথা বলিলেন, তাহা অপেক্ষাও শত সহস্র গুণে সেই দেবতার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। দয়ার সাগর, সরলতার আধার, আনন্দের উচ্ছ্বাস-পুর্ণ ছবি, আত্মপরে সমভাবে প্রিয়বাদিতা, সতত হাস্যময়, প্রেমের সাগর, আপনাতে আপনি বিভোর, কনকোজ্জ্বল বরণ সুন্দর, রূপে মনোহর, বিনয় নম্রতা বিভূষিত, সুধামাখা তরুবর ! শুনিয়াছিলাম যে দেবতারাই সময়ে সময়ে দয়া

করিতে বৃক্ষ বা মানবরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র, গুহক চণ্ডালকে মিতে ব'লে স্নেহ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে ক্ষুদ খেয়েছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও যবন হরিদাসকে দয়া করিয়াছিলেন। দুঃখী অনাথকে দয়া করিতে কি দোষ আছে? কাঙ্গালকে আশ্রয় দিলে কি পাপ হয় গা? লৌহের স্পর্শে কি পরশ পাথর মলিন হয়? না কয়লার সংস্রবে হীরকের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে?

স্বর্গের চাঁদ যে পৃথিবীর কলঙ্কের বোঝা বুকে করিয়া সংসারকে সুশীতল আলোক বিতরণে সুখী করিতেছেন, পৃথিবীর লোক তাহারই আলোকে উৎফুল্ল হইয়া "ঐ কলঙ্কি চাঁদ ঐ কলঙ্কি চাঁদ" বলিয়া যতই উপহাস করিতেছে, তিনি ততই রজত ধারায় পৃথিবীতে কিরণ-সুধা ঢালিয়া দিতেছেন. আর স্বর্গের উপর বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন।

আমিও তো তবে ঐ দেবতারূপ তরুবরের আশ্রয় পাইয়াছিলাম! কৈ সেই আমার আশ্রয়স্বরূপ দেবতা? কৈ—কোথায়? আমার হৃদয়-মরুভূমির শান্তি প্রস্রবণ কোথায়? হু হু করিয়া শ্মশানের চিতাভস্মমাখা বাতাস উত্তর করিল, "আঃ পোড়া কপালি, এখনও বুঝি চৈতন্য হয় নাই? ঐ শুন চৈত্র মাসের ৺বাসন্তী পূজার নবমীর দিনে, মহাপুণ্যময় শ্রীরাম নবমীর শুভতিথির প্রভাতকালে ৭টার সময় সূর্য্যদেব অরুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ধরায় নামিলেন কেন, তাহা বুঝি দেখিতেছ না? পবিত্র ভাগীরথী আনন্দে উথলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, সাগর উদ্দেশে কেন ছুটিতেছে, তাহাও বুঝি দেখিতেছ না? ৺জীউ. গোপাল-মন্দির হইতে ঐ যে পূজারি মহাশয় ৺জীউর মঙ্গল-আরতি সমাধা করিয়া প্রসাদি পঞ্চপ্রদীপ লইয়া ঐ কাহাকে মঙ্গল-আরতি করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, চারিদিকে এত হরিসঙ্কীর্ত্তন, হরিনামধ্বনি, এত ব্রহ্মনামধ্বনি কেন গা? একি? সুরধুনির তীরে দেবতারা আসিয়াছেন নাকি? প্রভাতী-পুষ্পের সৌরভ বহিয়া বায়ু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? দেবমন্দিরে এত শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি কেন? কিরণছটা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যদেব কাহার জন্য স্বর্গ হইতে রথ লইয়া আসিয়াছেন? তাহাও কি বুঝিতেছ না?"

চমকিত হইয়া দেখি, ওমা! আমারই আজ ৩১ বৎসরের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইল! এই দীনহীনা দুঃখী প্রাণী আজ ৩১ বৎসরের যে রাজ্যেশ্বরীর সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল, মহাকালের ফুৎকারে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা কালসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল! অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া মস্তকে প্রস্তরের আঘাত পাইলাম, শত সহস্র জোনাকি-বৃক্ষ যেন চক্ষের উপর দিয়া ঝকমকিয়া চলিয়া গেল!

আবার যখন চৈতন্য হইল, তখন মনে পড়িল যে আমি "আমার কথা" বলিয়া কতকগুলি মাথামুণ্ড কি লিখিয়াছিলাম। তাহার শেষেতে এই লিখিয়াছিলাম যে "আমি মৃত্যুমুখ চাহিয়া বসিয়া আছি। মৃত্যুর জন্য তো লোকে আশা করিয়া থাকে, সেও তো জুড়াবার শেষের আশা!"

ওগো! আমার আর শেষও নাই, আরম্ভও নাই গো! ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের ১৪ই বুধবারের প্রাতঃকালে সে আশাটুকু গেল!

মবিবার সময় যে শান্তিটুকু পাইবার আশা করিয়াছিলাম তাহাও গেল, আর তো একেবারে মৃত্যু হবে না গো, হবে না। এখন একটু একটু করিয়া মৃত্যুর যাতনাটি বুকে করিয়া চিতাভস্মের হায়-হায় ধ্বনি শুনিতেছি। আর দেবতারূপ তরুবরের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া এই মহাপাতকিনীর কর্ম্মফলরূপ সুবিশাল শাখা প্রশাখা ফুল ও ফলে পূর্ণ তরুতলে বসিয়া আছি গো!

পৃথিবীর ভাগ্যবান লোকেরা শুন, শুনিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইও। আর ওগো অনাথিনীর আশ্রয়তরু, স্বর্গের দেবতা, তুমিও শুন গো শুন। দেবতাই হোক্, আর মানুষই হোক্, মুখে যাহা বলা যায় কার্য্যে করা বড়ই দুষ্কর! ভালবাসায় ভাগ্য ফেরে না গো, ভাগ্য ফেরে না!! ঐ দেখ চিতাভস্মগুলি দূরে দূরে চলে যাচ্ছে, আর হায়-হায় করিতেছে।

এই আমার পরিচয়। এখন আমি আমার ভাগ্য লইয়া শ্মশানের যাতনাময় চিতাভস্মের উপর পড়িয়া আছি। এখন যেমন অযাত্রার জিনিস দেখিলে কেহ রাম, রাম, কেহ শিব, শিব, কেহবা দুর্গা, দুর্গা বলেন, আবার কেহ মুখ ঘুরাইয়া লইয়া হরি, হরি বলিয়া পবিত্র হয়েন—যাঁহার যে দেবতা আশ্রয়, তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই মহাপাতকীর পাপ কথাকে বিস্মৃত হউন। ভাগ্যহীনা, পতিতা কাঙ্গালিনীর এই নিবেদন। ইতি—১১ই বৈশাখ, ১৩১৯ সাল, বুধবার।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : ক *

আমার অভিনেত্রী জীবন

জীবনের পথে ঘুরতে ঘুবতে, – সংসারের অতিথশালা থেকে যখন বিদায় নেবার সময় এসেছে, মরণের সিন্ধু-কুল থেকে আমাব জীর্ণশীর্ণ দেহখানিকে টেনে এনে, আমার সেই কতদিনের পুরাণ স্মৃতিকে ঘ'সে মেজে জাগিয়ে তোলার আবাব চেষ্টা কবছি কেন ? এ কেন'র উত্তব নেই। উত্তর খুঁজে পাই না। তবে একটা কথা আমার মনে হয়। মনে হয়, বালিকা ও কৈশোরে আমার শাদা মনের উপর প্রথমে লাল রঙেব ছোপ পড়ে, বহু বর্ষের বহু-বর্ণ-বিপর্য্যয়েও সে আদিম লালের আভা আজও আমার কুযাসাচ্ছন্ন মন থেকে একেবারে মিলিয়ে যায় নি। কালের যবনিকা ভেদ ক'বে এখনও সে রঙ্ মনেব মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে। কোন কিছু বলতে গেলে তাই আগে মনে পড়ে সেই কথা, যা আমার কাছে এখনো সুখ-স্বপ্নের মত মধুব, যার মাদকতার আবেশ ও আবেগ এখনও আমি ভুলতে পারি নি – আর যা বোধহয় আমাব জীবনেব শেষ দিন পর্য্যন্ত সঙ্গেব সাথী হয়েই থাকবে। তাই বোধ হয আমার এই অভিনেত্রী জীবনেব কথা বলবাব সাধ।

সাধ তো! কিন্তু ক্ষমতা আমার কতটুকু ? আর বলবোই বা কি ?

---

* ১৩৩১ সালে বিনোদিনী 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'আমার অভিনেত্রী জীবন' নামে ধারাবাহিকভাবে নিজের স্মৃতিকথা লেখেন। অবশ্য পত্রিকার মোট ১১টি কিস্তিতে (১২শ সংখ্যা, ৪ঠা মাঘ ১৩৩১ থেকে ২৮শ সংখ্যা, ২৬শে বৈশাখ ১৩৩২-এর মধ্যে) ঐ লেখাটি প্রকাশিত হলেও অজ্ঞাত কারণে বিনোদিনী লেখা বন্ধ করেন। তখন বিনোদিনীর বযস ৬২ বছর, অর্থাৎ তাঁব রঙ্গালয় ত্যাগের পর দীর্ঘ ৩৮ বছর পার হয়ে গেছে। এব আগে তিনি যে 'আমার কথা' প্রকাশ করেছেন তাবও এক যুগ উত্তীর্ণ। দীর্ঘদিন পবে স্মৃতি থেকে নিজের পুরনো জীবনের কথাগুলিকে তিনি এখানে লিখেছেন। খুঁটিনাটি অনেক তথ্যে ভ্রান্তি ঘটেছে, সব কথা স্মরণ নাই , আবার নতুন অনেক বোধ ও পরিণত উপলব্ধিতে এ-রচনা সমুজ্জ্বল। এই অসমাপ্ত স্মৃতিচারণায় বিনোদিনীর গদ্যরীতির বিস্ময়কর পরিবর্তনও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্পাদক।

কোন্ কথা রেখেই বা কোন্ কথা বলি? জানি না তো কিছুই। আজ-কালকার থিয়েটার মাঝে মাঝে দেখি, কেমন নেশা! সব কাজের মধ্যেও থিয়েটার যেন টানে। দেখি, আজ-কালকার সব নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী, সু-শিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, কত নতুন নাটক, কত দর্শক, কত হাততালি, সোরগোল, হৈ-হৈ, সেই ফুটলাইট—সেই দৃশ্যের পর দৃশ্য—সেই যবনিকা পড়ার সময় ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ,—আর কত কথাই না মনে পড়ে! আমরাও তো একদিন এমনি করে সাজতেম, সেই সেকালের মত দর্শক, সেই সেকালের মত রঙ্গসাথী, সেকালের সাজপোষাক, সেকালের নাটক, সেকালের গ্যাসের ফুটলাইট, সেকালের আবহাওয়া। দুর্ব্বল স্মৃতি সেকালে অতীতের কোন্ স্বপ্নরাজ্যে টেনে নিয়ে যায়; মনে হয় সেদিনকার কথা সব গুছিয়ে বলি—যাকে ভুলি নি, ভুলতে পারি নি যাকে সত্যিই প্রাণের সবটা দিয়ে ভালবাসতেম, আজও যার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি নি, তার কথা আজকার নব অভিনেত্রীদের কাছে গল্প করি। কিন্তু সব কেমন গুলিয়ে যায়। যাক্। তবু আমি সে দিনের কথা কিছু বলবো, বলবার চেষ্টা করবো। সরল, সত্য কথা, যা পড়ে আজ-কালকার পাঠক ও দর্শক বুঝবেন, কি মাটির তাল নিয়ে, পুকুর থেকে পাঁক তুলে—এদেশে যাঁরা থিয়েটারের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা কেমন সব পুতুল গড়েছিলেন, এবং তাঁদের হাতের সে গড়া পুতুল কি ভাবে কথা কইতো, ষ্টেজের উপর চলতো ফিরতো, দর্শকগণকে আনন্দ দিত, তৃপ্তি দিত।

আমি গরীবের মেয়ে ছিলেম। থিয়েটার করতে যাবার আগে থিয়েটার কখনও দেখি নি। কি ক'রে যে থিয়েটারের মধ্যে পড়লেম, সেই কথাই বলি। সে অনেক দিনের কথা, তারিখ ঠিক মনে নেই। বাগবাজারের নিয়োগীবাবুদের বাড়ীর শ্রীযুক্তবাবু ভুবনমোহন নিয়োগী তখন গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক; আমি এঁরই থিয়েটারে প্রথম যাই। তখন আমার বয়স নয় কি দশ, এমনি হবে। আমাদের বাড়িতে গঙ্গাবাঈ ব'লে একজন বড় গায়িকা থাকতেন, ইনি কালে একজন বড় অভিনেত্রীও হয়েছিলেন। এঁর কথা পরে বলবো। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ব্রজনাথ শেঠ দুজন ভদ্রলোক "সীতার বিবাহ" নামে একখানা নাটক খুলবেন ব'লে, এই গঙ্গামণিকে গান শেখাতে আসতেন। গঙ্গা তখনও পর্য্যন্ত কোন থিয়েটারে ঢোকেন নাই, এই বোধ হয় তাঁর প্রথম হাতে-খড়ি; তাঁরা যখন শেখাতেন, আমি খেলাধুলা ফেলে, চুপটী করে ব'সে সে সব একমনে শুনতেম। এঁরাই একদিন আমাকেও খেলাঘরের হাঁড়ি-কুড়ি, হাতা বেড়ীর

মাঝখান থেকে টেনে নিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের নাচঘরের মাঝখানে ফেলে দিলেন। ছোট্ট মেয়ে, কিছুই জানি না, কখনও অতগুলি ভদ্রলোকের মাঝখানে এর পুর্ব্বে যাইও নি ; থিয়েটার যে কি জিনিষ তাও জানি না। ভয়ে ভাবনায় লজ্জায় কেমন একরকম হয়ে গেলেম। ঠিক যেন হংস মধ্যে বক। আমার যাওয়ার কথাবার্ত্তা পূর্ণবাবু ও ব্রজবাবু ঠিক করে দিলেন। গিয়ে দেখলেম, পরে জেনে-ছিলেম গ্রেট্ ন্যাশনালের দলে অভিনেত্রী আছেন সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা যাদুমণি, ক্ষেত্রমণি, নারায়ণী, লক্ষ্মীমণি, কাদম্বিনী আব রাজকুমারী। হায়! যাঁদের নাম করছি আজ তাঁরা কোথায়!

রাজকুমারীকে সকলে রাজা বলে ডাকতো। থিয়েটারে তার খুব প্রতিপত্তিও ছিল। এই বাজা আমাকে বড স্নেহ কবতো। ছেলেবেলায় আমার স্বভাব ছিল বড চঞ্চল। ছট্‌ফটে ছিলেম ব'লে দলের সকলেই প্রায় আমাকে ধমকাতো, ব'কতো, আমি বকুনি খেয়ে জডসড হ'য়ে ব'সে থাকতেম, বকুনির মাত্রা বেশী হ'লে কখনও হয়তো কেঁদেও ফেলতেম, রাজা আমাকে আদর করতো, যত্ন করতো, কেউ আমায বকলে রাজা আমার হয়ে তার সঙ্গে ঝগডা করতো, কাজেই আমিও এই অভিনেত্রীব বড নেওটো হয়ে পডেছিলেম। আমি গরীবের মেযে ছিলেম, জামা কাপড়ের কোন পারিপাট্যই আমার ছিল না। জামাব অভাবে অনেকদিন আঁচল গায়ে ঢাকা দিয়ে থিযেটারে যেতেম, রাজা আমায় দুটো জামা তৈয়ারি কবে দিয়েছিল। ক্ষিদে পেলে এই রাজাই আমায় খাবার কিনে দিত। থিয়েটারে ঘুমিয়ে পডলে সে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে গাডিতে তুলে দিত। এ সব আজ কত বৎসরের কথা, কিন্তু রাজার এ স্নেহ রাজার সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের মতই আমার প্রাণের চারিধারে যেন সৌরভ ছডিয়ে দিচ্ছে। মানুষ সব ভোলে, কিন্তু স্নেহের ঋণ বোধ হয় কখনও ভোলে না!

আমি যখন গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম যাই, তার কত বৎসর পুর্ব্বে মনে নাই,—তখন শুনলেম যে জোডাসাঁকোর সান্যাল বাবুরা ছিলেন খুব বডলোক। তাঁদের বাডিতে টিকিট বেচে ন্যাশনাল থিয়েটার হয়েছিল, সে দলে কিন্তু অভিনেত্রী ছিল না, পুরুষে স্ত্রীলোকের "পার্ট" সাজতো। তারপর থিয়েটারে অভিনেত্রীব চলন করেন বেঙ্গল থিয়েটারের মালিকরা। বীডন ষ্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাডির সামনে বেঙ্গল থিয়েটার ছিল। খোলার চাল, মাটির মেঝে, শালের খুঁটী, তাকে খোলার ধাবড়া ব'ললেও চলে। ছাতুবাবুর দৌহিত্র ৺চারুচন্দ্র ঘোষ এবং ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ এই থিয়েটারের সৃষ্টি করেন। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বড়লোক এঁদের

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ (এঁকে সকলে ল্যাদাড়ু গিরিশ বলতো), ৺হরি বৈষ্ণব, মথুরবাবু প্রভৃতি। গ্রেট্ ন্যাশনালের আগে বেঙ্গল থিয়েটার। এঁদের দলে অভিনেত্রী ছিল,—এলোকেশী, জগত্তারিণী, শ্যাম এবং গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত)। এই বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত আমার অভিনেত্রী জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ থিয়েটারে আমি অনেকদিন কাজ করেছিলেম। কিন্তু এখানে নয়, সে কথা আমি পরে বলবো।

গ্রেট্ ন্যাশনালে আমার প্রথম পার্টের কথা বলি। হ্যাঁ, ভাল কথা।

বীডন ষ্ট্রীটে, যেখানে মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ী ছিল, সেইখানে এই গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল। কাঠের বাড়ী, করগেটের ছাদ, তখনকার মধ্যে বেশ ভব্যিযুক্ত। থিয়েটার হ'ত এই বাড়ীতে বটে, কিন্তু আমাদের রিহার্সাল হ'ত গঙ্গার ধারে নেউগী বাবুদের বৈঠকখানা বাড়ীতে। এখন যেখানে অন্নপূর্ণার ঘাট, উহারই নিকটে এই বৈঠকখানা বাড়ী ছিল, গঙ্গার গর্ভে এখন সে সুন্দর বাড়ী আত্মগোপন ক'রেছে। তার বুকের উপর দিয়ে এখন রেল চলে, মানুষ হাঁটে, মাঝিরা নৌকা বেয়ে যায়।

আমার যাওয়ার পর বেণীসংহার নাটকের মহলা আরম্ভ হয়।

আমার প্রথম "পার্ট" এই বেণীসংহার নাটকে। একটি পরিচারিকা বা দাসীর ভূমিকা। দুই চারি ছত্র কথা। মুখস্থ করেছি, রিহার্সেলও দিয়েছি। বক্তব্য সামান্য ; মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন, দুঃশাসনের রক্ত পান ক'রে, সেই রক্তমাখা হাতে অভিমানিনী দ্রৌপদীর বেণী বাঁধতে আসছেন, এই খবরটি আমায় দ্রৌপদীকে দিতে হবে। দিতে হবে তো দিতে হবে ; কিন্তু কে জানতো তখন যে এই সামান্য কথা ক'টা ষ্টেজে বেরিয়ে ব'লে আসার কি বিপদ,—অবশ্য প্রথম পার্ট নিয়ে বেরুনর দিন! সকলে যে যার "পার্ট" অভিনয় করে বেরিয়ে আসছে, শেষকালে এল আমার পালা! বেরুনর আগে বুকের ভেতর সে কি কাঁপুনি, ভয়ে তো জড়সড় হ'য়ে যাচ্ছি। অত লোকের সামনে বেরিয়ে বলতে হবে, এর আগে কখনও তো অত লোক এক সঙ্গে দেখি নি!

গরীবের মেয়ে ছিলাম আমি। একটি ভাই ছিল, সে ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল। খুব অল্প বয়সে আমার বিয়ে হয়। আমরা জাত-বৈষ্ণব ছিলাম, চার-পাঁচ বছর বয়সেই আমাদের তখন বিয়ে হ'ত। আমারও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে হয়েছিল এই পর্য্যন্ত ; স্বামী কখনও গ্রহণ করেন নি, তাঁকে আর কখনও

দেখিও নি। বিয়ে দেওয়া একটা রীতি ছিল বলেই বোধ হয় বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। মা তো ভাল ক'রে প্রতিপালন করতে পারতেন না; পাড়ার অবৈতনিক স্কুলে কিছু-কিছু পড়তাম, আর খেলা করে বেড়াতাম। মা-ই জোর করে থিয়েটারে দিয়েছিলেন, যদি পেটের ভাত করে খেতে পারি এই জন্য।

পার্ট নিয়ে বেরুবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কিন্তু পেটের ভাত চাল হ'য়ে গিয়েছে। উইংসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, পাও কাঁপছে, কি বলবো, কি করবো,—ভুলে গেছি। এক একবার মনে হ'চ্ছে আর বেরিয়ে কাজ নেই, ছুটে পালাই। কিন্তু ভয়ও আছে, সকলে কি ব'লবে, আর পালাবই বা কোথায়? ধর্ম্মদাসবাবু ছিলেন তখনকার গ্রেট্ ন্যাশনালের ম্যানেজার। সেই ধর্ম্মদাসবাবুর কথা আমাকে অনেকবারই ব'লতে হবে। ধর্ম্মদাসবাবু বাবু ভুবনমোহন নেউগীর বন্ধু ও প্রতিবেশী ছিলেন। শুনেছি, কলিকাতা গড়ের মাঠে লুইস্ থিয়েটার ব'লে একটা ইংরাজী থিয়েটার কোম্পানী আসে। এঁদেরই থিয়েটার বাড়ী দেখে ধর্ম্মদাসবাবু তারই আদর্শে ও অনুকরণে, গ্রেট্ ন্যাশনাল তৈয়ারী করেন। বাঙ্গালায় ষ্টেজ তৈয়ারির যা-কিছু বাহাদুরী তা নাকি সব-ই এই ধর্ম্মদাস বাবুর! তাঁরই বন্ধু ভুবনবাবুর টাকায় বাঙ্গালা দেশে প্রথম পাকা বাড়ীতে "থিয়েটার হাউস্" হয়, এর পূর্ব্বে কিন্তু খোলার চালে বেঙ্গল থিয়েটার হয়েছিল, সে কথা আগেই ব'লেছি। এখানে, গ্রেট্ ন্যাশনালের উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল, বোধ হয় সে কথা ব'ল্লে বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কথাটা যখন উঠলো, বলেই রাখি। অবশ্য এ সব আমার পরে শোনা কথা।

একদিন ভুবনবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু বেঙ্গল থিয়েটার দেখতে যান, বোধ হয় "পাশ" নিয়েই যান, কিম্বা এই রকম একটা কিছু, জানা শুনা ছিল, বন্ধু ভাবেই গিয়ে থাকবেন, ভেতরে গ্রীণ রুমের মধ্যেও যান। বেঙ্গল থিয়েটারে তখনকার কর্ত্তৃপক্ষগণ কিন্তু, কি কারণে ঠিক জানি না ওঁদের ভিতরে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। একটু বচসাও হয়। এই মনোমালিন্য হ'তেই গ্রেট্ ন্যাশনালের উৎপত্তি। ভুবনবাবু ধনবান ছিলেন, তিনি নীরবে এ অপমান সহ্য করতে পাল্লেন না; ধর্ম্মদাসবাবুর সাহায্যে তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে থিয়েটার ক'রলেন। তাঁর সেই থিয়েটারই গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার, আর তার প্রথম ম্যানেজার আমার যতদূর মনে হয়, স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর। তিনিই বাঙ্গালার প্রথম ও প্রধান ষ্টেজ ম্যানেজার।

তারপর যে কথা হচ্ছিল। আমার সেই প্রথম ষ্টেজে বেরুনর কথা। আমি

তো উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছি, বোধ হয় একটু বেরুতে দেরীও হ'য়ে থাকবে, ধৰ্ম্মদাসবাবু তাড়াতাড়ি এসে আমায় ঠেলে ষ্টেজের বা'র ক'রে দিলেন।

আমি বেরিয়েই দ্রৌপদীকে প্রণাম ক'রে, হাত জোর ক'রে, যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই আমার বক্তব্য যা ব'লে গেলাম। খুব সাজপোষাক-পরা গর্ব্বিতা পাণ্ডব মহিষীর সামনে যেমন সঙ্কুচিত হ'যে বলতে হয়, তেমনি সঙ্কুচিত ভাব আপনি আমার হয়ে প'ড়লো। দর্শকদেব দিকে ফিরেও চাই নি! কিন্তু তাঁরা আমার অবস্থা দেখে দয়া ক'রেই হোক, কিম্বা যে কারণে হোক— আমার বক্তব্য শেষ হ'লে আমায় খুব হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলেন। আমি কোন রকমে কাজ সেরে পিছনে হেঁটে—ধৰ্ম্মদাসবাবু উইংসের পাশ থেকে আমায় সেই রকম ক'রে চলে আসতেই বলেছিলেন,—ভিতবে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ধৰ্ম্মদাসবাবু আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে, আমার পিট চাপ্‌ড়ে ব'ল্লেন, "চমৎকার হ'য়েছে, খুব ভাল হ'য়েছে"—ইত্যাদি। কত আশীর্ব্বাদ করলেন। এখনও আমার ধৰ্ম্মদাসবাবুর সেই পিট-চাপ্‌ড়ান—সেই সস্নেহ আশীর্ব্বাদ মনে পড়ে, আর চোখ সজল হ'য়ে ওঠে। প্রথম জীবনেব কর্ম্মসঙ্গী সব—হাতে ধ'রে যাঁরা আমায় রঙ্গমঞ্চেব উপব দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের আজ হারিয়ে ব'সে আছি! হাত-তালি পেয়ে আব ধৰ্ম্মদাসবাবুর মুখে 'বেশ হয়েছে' শুনে ভারি আহ্লাদ হ'ল। ধৰ্ম্মদাসবাবু ব'ল্লেন, "যা-যা পোষাক ছেড়ে ফেলগে যা।" লাফাতে লাফাতে সাজ-ঘবে গেলাম। যেন দিগ্বিজয় ক'রে চ'লেছি। ৺কার্ত্তিক পাল, আমাদের তখনকার "ড্রেসার" (বেশকারী) ব'ল্লেন, "আয় পুঁটি, আয়. বেশ হ'য়েছে।" এই আমার অভিনেত্রী জীবনেব প্রথম "পার্ট"—একটি পরিচারিকাব। এর পরে, কালে, কত রানী সেজেছি, কত কি সেজেছি, কিন্তু জীবনের সুখ-স্বপ্নের মত—এই 'ছোট্ট দাসীর' পার্টটির কথা মনে করতে আজ কত আনন্দই না হয়!

তখনকার অভিনয়ে কোন আড়ম্বর ছিল না। একটা কিছু সেজেছি, একটা কিছু ক'রতে হবে, এ ভাব নয়। যেন সব ঘবকন্নার কাজ, ষ্টেজে বেরিয়ে সকলে করে আসছে। তখনকার শিক্ষকদের বিশেষ উপদেশ ছিল, দর্শকদের দিকে চেয়ে কখনও অভিনয় ক'রবে না, মনে ক'রে নিতে হবে দর্শক যেন কেউ নেই, আমরা আমাদের যে কাজ, তা আপনা-আপনির মধ্যে করে যাব। কেউ দেখছে কিনা, তারা কি বলবে বা ভাববে, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখবার দরকার নেই।

কালে বুঝতে পেরেছিলুম, এরূপ ভাবে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য ছিল অভিনয় বিষয়ে একাগ্রতা আনবার জন্যেই। সকল ভুলে, তন্ময় হয়ে যে যার কাজ যাতে ভাল ক'রে ক'রে যেতে পারি, এই নিমিত্ত।

বেণীসংহার নাটক কতদিন চলেছিল, তা ঠিক মনে নেই। এই বেণীসংহার নাটকের পরেই আমার মনে হ'চ্ছে "হেমলতা" নাটকের শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই নাটকের রচয়িতা ৺হরলাল রায়। হেমলতাই নায়িকা, তার নামেই বই। কথা উঠলো, কে হেমলতা সাজবে? নানা আলোচনার পর স্থির হ'ল, আমাকেই হেমলতা সাজতে হবে। আমার তখন কিন্তু হেমলতা সাজবার বয়স নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়গণ কেন যে আমাকেই মনোনীত করলেন, তা বলতে পারি না। আমাকেই হিরোইন সাজতে হবে, ভাবি আহ্লাদ, কিন্তু ভয়ও কম নয়। তবে ভরসার মধ্যে, ক্রমে একটু সাহসও তো বেড়েছে, আর শিক্ষকদের গুণ। সত্যসখা বোধ হয় এ বইয়ের 'হিরো' বা নায়ক। সে পার্ট দেওয়া হ'ল, একটি অল্পবয়স্ক যুবককে। এ সত্যসখার সত্য নামটি কি আমার মনে নেই। কিন্তু তার অভিনয়ের কিছু কিছু এখনও মনে আছে, বিশেষতঃ তার সেই পাগলের দৃশ্যের কথা। গেরুয়া পরা, গেরুয়া চাদরে কোমর বাঁধা, উত্তরীয় গেরুয়া, এলোমেলো ভাবে কতক কাঁধে কতক মাটিতে লুটুচ্ছে, আর সেই প্রাণপূর্ণ অভিনয়—"ভাঙ্গ্ ভাঙ্গ্, বাজা বেটাও বোকা ঐ—ঐ ভাঙ্গলে সব,—দুড়্ দুড়্ দুড়্ দুড়্ ক'রে সব ভাঙ্গলে", এ সকল এখনও মনে পড়ে। আর সেই বহু দিনের পুরানো স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়, সেই সব ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ, যাদের তখন কত আপনার মনে হ'ত!

বলেছি তো, এখনও মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখি, কত জাঁক-জমক, কত পোষাক, সিনের চটক, কিন্তু তখনকার সে প্রাণ-পূর্ণ অভিনয়, সে শাদা মাটা ভাব—তার অভাব যেন এখনও অনুভব করি। কিন্তু কেন, তা বলতে পারি না।

হেমলতার পর আমাদের যে নতুন নাটকের অভিনয় হ'ল, তার নাম "প্রকৃত বন্ধু"। এ নাটকে নায়ক সাজলেন স্বর্গীয় মাধুবাবু। এঁর পুরা নাম বাবু রাধামাধব কর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ৺ আর, জি, করের ভাই। আমি যখন থিয়েটারে যাই, তখন এই মাধুবাবুও আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন।

ইনি অভিনেতাও ছিলেন ভাল, সুগায়কও ছিলেন। শিক্ষক ব'লেও এঁর খ্যাতি ছিল খুব। মাধুবাবু নায়ক, আমি বয়সে ছোট হ'লেও নায়িকা। বইএর লেখা এমন কিছু নয়। সাদা কথা। গল্পটি এই,—রাজা আর তাঁর সখা এক

রাজকুমার মৃগয়া করতে এক বনে গেলেন। সে বনে একটি বন-বাসিনী যুবতী থাকতো। নাম বনবালা। তাকে দেখে রাজারও প্রণয় হ'ল, তাঁর সখারও প্রণয় হ'ল। কিন্তু এর কথা ও জানে না, ওর কথা এ জানে না। তারপর কিন্তু দু'জনেই, দু'জনের মনের কথা জানতে পারলে। রাজা নিজের চিত্তকে দমন ক'রে ব'ললেন— "সখা, তুমি এই বন-বাসিনীকে বিবাহ কর।" বন-বাসিনীও ভালবাসে রাজার সখাকে। রাজার সখার নাম কুমার রাধামাধব সিং। মাধববাবুর নামের সঙ্গে নাটকের যে নামের মিল, তারও একটা রহস্য আছে। যিনি নাটক লিখেছেন, তাঁর নাম ৺ দেবেনবাবু, কি পদবী আমার মনে নেই। তিনি মাধুবাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তাই বন্ধুর নামে নাটকের নায়কের নামকরণ করেছিলেন। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের চমৎকার নিদর্শন বটে! এদিকে বনবাসিনী নায়িকা বনবালা প্রেমের টানে, তার মা বাপকে ছেড়ে, তার সেই বনের কুটীর ছেড়ে, একাকিনী একেবারে রাজধানীতে এসে হাজির। রাজধানীর বাড়ী-ঘর দেখে, সে একেবারে হক্‌-চকিয়ে গেছে। হেঁটে হেঁটে— অভ্যাস তো নেই,— পরিশ্রমও হয়েছে খুব, নগরের গাছতলায় ব'সে সে জিরুচ্ছে আর ভাবছে, এমন সময় রাজবাড়ীর একটি দাসী কার্য্যোপলক্ষে সেখানে এল, সে মেয়েটিকে ব'সে থাকতে দেখে, তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, কথায় কথায় জানতে পারলে যে, মেয়েটি রাজার সখা কুমারকেই ভালবাসে আর তাঁর খোঁজেই, বন ছেড়ে, সেখানে এসে প'ড়েছে। দাসীর দয়া হ'ল, সে তাকে সঙ্গে ক'রে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেল। রাধামাধব সিংহের সঙ্গে তার দেখাও হ'ল, রাজার সঙ্গেও দেখা হ'ল। সখা কুমার রাজাকে বল্লেন, "সখা তুমি ইহাকে বিবাহ কর।" রাজা কিন্তু বনবালার মনের কথা জানলেন, জানলেন যে, সে তাঁর সখাকেই ভালবাসে, আর তার জন্যই সব ছেড়ে অতদূর এসেছে। রাজা উদ্যোগী হ'য়ে রাধামাধব সিংহের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। বাস্‌—নাটকের শেষ। মোট কথা এই, কিন্তু এর সঙ্গে উপসঙ্গ ছিল ঢের। সে সব কথায় আর কাজ নেই। এখন আমার পার্টের কথা, যা বলছিলেম, বনবাসিনী নায়িকাও ছিল যেমন বুনো সরল, আমিও তখন ছিলাম ঠিক তেমনি— একেবারে বুনো না হোক, সাদা সিধে, হাবা গোবা! কাজেই,— "পার্ট"টি ঠিকই মানিয়েছিল। তবে আমাকে সাজাতে বেশকারীর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। ছোট ছিলাম তো? কিন্তু সাজতে হত ধেড়ে যুবতী!

এমনি মনের আনন্দে তখন অভিনয় করতাম, ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান, ঐ খেলা। খুব ভাল লাগতো। নতুন নতুন পার্ট সাজবার সখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতো।

আমি যে অভিনয় করতাম, তা কিন্তু আমার গুণে নয় ; তখনকার শিক্ষকদের শেখাবার গুণে, তাঁদের পরিশ্রমে ও যত্নে। কি কষ্ট করেই না তাঁরা আমার মত একটা নেহাৎ বুনোকে 'হিরোইন' সাজিয়ে দর্শকদের সামনে ধ'রে দিতেন।

আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত শক্ত নাটকও প্লে হ'তে লাগলো। এবার দীনবন্ধুবাবুর সাহিত্য-বৃক্ষের সুন্দর ফুল সেই লীলাবতীর অভিনয় হ'ল। তাতে ললিতমোহন বোধ হয় মহেন্দ্রবাবু সেজেছিলেন, হেমচাঁদ কে সেজেছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে নদেরচাঁদ বেলবাবু আর কর্ত্তা নীলমাধববাবু, তা বেশ মনে আছে।

তারপর হ'ল নবীন তপস্বিনী, এতে অর্দ্ধেন্দুবাবু ছিলেন , তিনিই ছিলেন প্রধান অভিনেতা। 'জলধর' তিনিই সেজেছিলেন, আর ধর্ম্মদাদা 'বিজয়', আমি 'কামিনী', লক্ষ্মী ও নারায়ণী 'মালতী' ও 'মল্লিকা', রানী 'কাদম্বিনী' আর 'জগদম্বা' ক্ষেতুদিদি। যেমন জলধর তেমনিই জগদম্বা। দু'জনকেই কি সুন্দর মানিয়েছিল। এই জলধর সেজে অর্দ্ধেন্দুবাবু

"মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥"

এই দুটি চরণ বল্‌তে বল্‌তে ষ্টেজে এমনি অঙ্গভঙ্গী করে ঘুরে বেড়াতেন যে, সে এক অপরূপ দৃশ্য, সে এক বিচিত্র চিত্র ! সে লিখে বোঝাবার নয়, তখনকার জলধব না দেখ্‌লে কারুর মুখে শুনে বা কারু লেখা পড়ে তার সম্বন্ধে ধারণা করাই অসম্ভব।

সে সময় শুধু যে নাটক প্লে হ'ত তা নয়, মধ্যে মধ্যে অপেরাও হ'ত, প্রহসনও হ'ত। 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'আদর্শ সতী', 'কনক-কানন', 'আনন্দলীলা', 'কামিনীকুঞ্জ', এমনই ধারা কত অপেরা, আর 'সধবার একাদশী', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'চোরের উপর বাটপাড়ি', এমনি ধারা কত প্রহসন।

একবার অর্দ্ধেন্দুবাবুর মুখে-মুখে-গড়া একটি প্রহসন আমাদের প্লে করতে হয়েছিল। সে ভারি মজার। একদিন বড় বর্ষা। অভিনয় শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি আর থামে না। দর্শকবৃন্দ ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল। আমরাও যে কি করি বসে বসে তাই ভাবছি, এমন সময় অর্দ্ধেন্দুবাবু বললেন, "র'স, একটা কাজ করা যাক, ধর্ম্মদাস, তুমি বাইরে বেরিয়ে বল, মশায়রা ব্যস্ত হবেন না, একখানি ছোট প্রহসন দেখুন , আপনাদের শুধু শুধু বসে থাকতে হবে না ; আর তার মধ্যে বৃষ্টিও ধরে যেতে পারে।"

প্রহসনের নাম হ'ল "মুস্তফি সাহেব্‌কা পাক্কা তামাসা"। অর্দ্ধেন্দুবাবু হ'লেন মুস্তফি সাহেব, ক্ষেতুদিদি হ'ল তার মা, আর লালপেড়ে শাড়ী পরে আমি হ'লাম তার বৌ। রিহার্সাল মুখে মুখে চল্‌ল।

সঙ্গে সঙ্গে সিন সাজান হ'তে লাগল। একখানি ভাঙ্গা একতলা ঘরের সিন দেওয়া হ'ল। ইট সাজিয়ে পায়া করে তার ওপর তক্তা পেতে টেবিল করা হয়ে গেল, সাদা ছেঁড়া থানের খানিকটা সেই টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে চাদরের অভাব পূরণ করা হ'ল।

এদিকে দশ মিনিট বিশ্রামের পর কনসার্ট বাজতে লাগল। অর্দ্ধেন্দুবাবু সাজঘরে গিয়ে অনেক দিনের একটা পুরাণ ইজের আর একটা ছেঁড়া কোট পরে হাতে মুখে কালি মেখে ত বেরিয়ে পড়লেন। আমাকে সেই ভাঙা সিনের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে গেলেন, "তুই একবার একবার উঁকি মেরে দেখবি, আর ভয়ে মুখ সরিয়ে নিবি।" ক্ষেতুদিদিকে বড় কিছু বলতে হ'ত না, একটু আভাষ দিলেই সে সব ঠিক করে নিতে পারত।

মুস্তফি সাহেব ত বেরিয়ে সেই ভাঙা টেবিলের ওপর সাহেবী ধরনে বসে এক হাতে কুশী আর এক হাতে গুণ-ছুঁচ না নিয়ে শুক্‌নো পাউরুটি খেতে লাগলেন, আর সাহেবের মত ঘাড় বেঁকিয়ে দর্শকদের দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁর কিছু বলবার আগেই তাঁর সেই মিটির মিটির চাউনি আর সাহেবী ভাবভঙ্গী দেখে দর্শকরা ত হেসেই অস্থির। এর ওপর মুস্তফি সাহেবের কথা! যাক্!

সাহেব ছেলে, শুধু শুক্‌নো পাউরুটি দাঁত দিয়ে টেনে টেনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খাচ্ছে দেখে মা বধূকে বল্লেন, "আমাদের ছোলার ডাল আর একটু মোচার ঘণ্ট এনে দাও ত মা।" বালিকা-বধূ তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা বাটিতে ছোলার ডাল ও একখানি রেকাবিতে একটু মোচার ঘণ্ট এনে মা'র হাতে দিলেন। মা ভয়ে ভয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে অতি আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "বাবা শুধু রুটি খাচ্ছিস্, একটু ডাল আর এই তরকারিটুকু দিয়ে খা।" এই আর কোথা আছে! সাহেবকে বাঙালির তরকারি খেতে বলা! সাহেব ত লাফিয়ে উঠে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "কা! হামি বাঙ্গালা তরকারি খাতা?" রকম দেখে ভয়ে হাত পা কেঁপে মা'র হাত থেকে ডালের বাটি আর মোচার ঘণ্ট মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মা ভয়ে ভয়ে বৌয়ের হাত ধরে ঘরের ভেতর চলে গেল। কিন্তু সেই শুক্‌নো 'তেবাসি্টে' রুটি ত আর গেলা যায় না। তাই এদিক ওদিক চেয়ে সেই ছড়ান ডাল আর একটু মোচার ঘণ্ট মেঝের ওপর থেকে

তুলে নিয়ে খেয়ে সাহেব এমনই মুখভঙ্গী করলেন যে তাতে বেশ বোঝা গেল, তরকারিটুকু তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরজার দিকে তাকিয়ে "এমা, এমা, আম্‌মা" বলে ডাকা চারিদিকে চাওয়া ; ছেলের গলা পেয়ে মাব "কি বাবা কি বাবা" বল্‌তে বল্‌তে ব্যস্তভাবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান, সাহেবের সেই ছোলাব ডাল দেখিয়ে বলা, "এমা, এ-মাফিক কেয়া লে আয়া ? খেও তো হামাকে" ,-আর অমনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে "খাবে বাবা, আন্‌ব বাবা" বলে চলে যাওযা-সে সব দৃশ্য যে না দেখেছে সে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ক্ষেতুদিদির তখনকাব কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, কি তদ্গতভাব দৃষ্টি !

এমন সময় মিউনিসিপালিটির একজন চাপরাশি একখানা নোটিশ হাতে করে সেখানে এসে উপস্থিত। রাস্তায় একমুঠো জঞ্জাল ফেলা হযেছে এ তারই নোটিশ। সে এসে যেমন বলা, "সাপো নটিশ অছিঃ" অমনি সাহেব তাকে তেড়ে গিয়ে বল্‌লেন, "এই কালা বাঙ্গালী নীচু যা আবি।" উড়ে ত তাব রকম দেখে, দু'পা সবে গিযে বল্‌লে, "ও বাবা, নীচু যাব কোথা, পাতকোয়াব ভেতর না কি ?" এই বলে ত সে চলে গেল। তারপর মুস্তফি সাহেবের পা তুলে তুলে কি পল্‌কা নাচ, সে লম্বা লম্বা ঠ্যাং উঁচু করে কি লাফান, আর তার সঙ্গে গান। গানের ত মাথা মুণ্ডু নেই—

"হাম বডা সাব হায় দুনিযামে, তোম্‌ ছোট সাব হায় দুনিয়ামে।
তোম খাতা চিংড়ি মাছ, হাম খাতা হায় পেঁয়াজ।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দর্শকের দিকে সভঙ্গী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ। দর্শকদের মধ্যে যে কি রকম হাসির রোল পড়ে গেল, তা সবাই বুঝতে পারচেন, আমার না বল্‌লেও হয়।

এই ভাবে তিনি দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। বৃষ্টিও ধরে গেল, দর্শকরা আনন্দ করতে করতে যে যার বাড়ী চলে গেলেন। আমরাও হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বাড়ী ফিরলাম।

সেই থেকেই বোধ হয় অর্দ্ধেন্দুবাবুর 'সাহেব' নাম হ'যেচে। এখন অবশ্য চারিদিকে সে নাম খুব জাহির হয়ে গেছে।

মুস্তফি সাহেবের মুখে-মুখে-গড়া প্রহসনের ত এইভাবে অভিনয় হয়ে গেল। এমনই ভাবে কাপ্তেন বেলও (৺ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) আবার মাঝে মাঝে

ক্লাউন সেজে ষ্টেজে নামতেন। সে ক্লাউনের সাজ-সজ্জা, কথাবার্ত্তা, নাচা-গাওয়া সবই তাঁর নিজের গড়া। তখন নীলদর্পণের অভিনয় খুব সমারোহে চলছিল, সেই সময় ভুনিবাবু (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) আমাদের থিয়েটারে এলেন, এর আগে ত তাঁকে দেখি নি, শুনলাম ইনি জোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল বাড়ীতে যে থিয়েটার হয় তাতে নীলদর্পণে ছোটবৌ সাজতেন। এবারে আমাদের এখানে তাঁকে আর সেই ছোট বৌটি সাজতে হল না, সাজলেন তাঁর স্বামী বিন্দুমাধব। পর পর আরও অনেক নাটকের অভিনয় হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণ-কুমারী ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, ৺উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী, সুরেন্দ্র বিনোদিনী, ৺মনোমোহন বসুর প্রণয় পরীক্ষা ও জেনানা যুদ্ধ বলে আর একখানি প্রহসন। জেনানা যুদ্ধ যতদূর মনে হচ্ছে, বোধ হয় একখানা আলাদা বই নয়, দীনবন্ধুবাবুর জামাই বারিকের একটা অংশ—দু সতীনের ঝগড়া। আর কত বইয়ের বা নাম করব? একখানি বইয়ের অভিনয় যেমনি আরম্ভ হত অমনি সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি বইয়ের রিহার্সাল সুরু হয়ে যেত। নাটকের এই রিহার্সাল সন্ধ্যের পরই হ'ত, কেননা অনেকে আপিসে চাকুরী করতেন কিনা, আর দিনের বেলায় চলত অপেরার রিহার্সাল। সে সময় সবারের খুব উৎসাহ ও উদ্যোগ ছিল, রিহার্সালের সময় কেউ বড় কামাই করতেন না।

কেন জানি না, আমার ত কেবলই মনে হ'ত, কখন্ গাড়ী আস্‌বে, কখন আমি থিয়েটারে যাব। অন্য অন্য সকলে কেমন করে চলা-ফেরা করে গিয়ে তাই দেখব। আমার ত খাওয়া শোয়াই মনে থাকৃত না, বাড়ীতে যতক্ষণ থাক্‌তাম ঘরের ভেতর লুকিয়ে এই 'কাদু' এমনই করে বলেছিল, ঐ 'লক্ষ্মী' এমনই করে বলেছিল, এই করতাম! তখন ত আমার বয়স বেশী ছিল না, নিজের আলাদা ঘরও ছিল না, কাজেই আমায় সকলে দেখে ফেলত আর হাসত, আমি অমনই ছুটে পালিয়ে যেতাম।

আমার থিয়েটারে প্রবেশ করবার কতদিন পরে ঠিক মনে নেই, আমাদের থিয়েটার পশ্চিমে অভিনয় করতে বেরুল। আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। মা আমাকে একলা ছেড়ে দিতেন না, তিনিও আমার সঙ্গে গেলেন।

যতদূর মনে পড়ছে, আমাদের প্রথমে দিল্লীতেই যাওয়া হয়। গেলুম ত দিল্লী। গিয়ে দেখি সে মুসলমানের রাজ্য, বাঙ্গালীর মুখ বড় দেখতে পেতাম না। সব কেমন চেহারা, রকমারী দাড়ি, রকমারী সাজ-পোষাক, কথা বোঝবার যো নেই,

এক একজনের চেহারা দেখলে ভয়ে প্রাণ আঁৎকে ওঠে। বাঙ্গালা থেকে অতদূরে এমন একটা আজগুবি দেশে গিয়ে আমি ত ভয়েই কেঁদে অস্থির। আমাদের সে কি কান্না! সে কান্নার কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। সেখানে ভিস্তিতে আমাদের জল দিত, সে জল আমরা কোন দিনই খাই নি, এমন কি প্রথম প্রথম আমরা সে জলে নাইতামও না। ইঁদারা থেকে ঘটি করে জল তুলে খেতাম আর নাইতাম। ক্রমে থাক্‌তে থাক্‌তে আমাকে ভিস্তির জলেই নাইতে হ'ল। রঙ্‌ ত ধুতে হবে, অত রাত্রে কে জল তুলে দেবে, মা যে তখন ঘুমিয়ে পড়বেন। তবে মা কোনদিন সে জল স্পর্শও করতেন না, নিজে জল তুলে সব করতেন। আপনি রসুই করে একবেলা খেতেন, রাত্রে একটু দুধ আর এক আধটা ফল খেয়ে থাক্‌তেন। তিনি আমার জন্য কত কষ্টই না সহ্য করেছেন। আমার একটি ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না, কিছুদিন আগে আমার সেই ভাইটি দশ বছরের হয়ে মারা যায়। তারপর থেকে স্নেহময়ী মা আমার সব সময় আমায় কাছে রাখতেন, এক দণ্ডের জন্য কাছ-ছাড়া করতে চাইতেন না। কলকাতায় তিনি প্রায় রোজই আমার সঙ্গে থিয়েটারে আসতেন, কাজ শেষ হওয়া অবধি বসে থাক্‌তেন, তার পর আমায় সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতেন।

যাক্‌, দিল্লীতে অভিনয় সাত আটদিন হয়েছিল। সেখানে বড় সুবিধে হয় নি! তবে আমরা আরও দিন সাতেক সেখানে ছিলাম। যা যা দেখবার, আমাদের সব দেখান হয়েছিল। একদিন ত আমরা সবাই গরুর গাড়ী চেপে কুতব মিনার দেখতে গেলাম। পথের মাঝখানে এক মহা বিপদ। একটা বাঘ আমাদের গাড়ীর গরুকে তাড়া করে ছুটে এল। চারিদিকে হৈ চৈ চীৎকার, মশাল জ্বালা, তার সঙ্গে আমাদের কান্না। সে কি কাণ্ড! তবে বাঘটা গরু ধরতে পারে নি, আমাদের সঙ্গে অনেক অনেক লোক ছিল কিনা। সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে আমরা দিল্লী ছেড়ে লাহোরে রওনা হ'লাম।

লাহোরে আমরা অনেকদিন ছিলাম। তবে অভিনয় রোজ হ'ত না, বোধ করি দশ বার দিন মাত্র হ'য়েছিল। নাচগানের বইই সেখানে বেশী চলত, নাটকের অভিনয় বড় হ'ত না।

অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে আসর জমিয়ে নিয়েছিলেন, প্রায়ই বড় বড় লোকদের বাড়ী তাঁর নিমন্ত্রণ হত। তাঁরই জন্যে আমাদের সেখানে অত বেশী দিন থাক্‌তে হয়েছিল। আমরা সকলেই কিন্তু সেখানে বেশ আমোদ আহ্লাদের মধ্যে ছিলাম।

সেখানকার রাবি নদীতে আমরা এক একদিন নাইতে যেতাম, এক একদিন-

বা নাওয়া দেখতে যেতাম। বৃন্দাবনের গোপীদের মত সেদেশের মেয়েরা সব পাড়ের ওপর কাপড় রেখে জলে নাইতে নামতেন। বোধ হয় আমাদের বসন-চোরার মত কালাচাঁদ সে দেশে ছিল না তাই রক্ষে, নইলে রোজ কাপড় কিনে দিতে দিতে গৃহস্বামীদের হায়রান হতে হ'ত।

সেই সব মেয়েরা ঐ অবস্থায় জলের মধ্যে লাফালাফি মাতামাতি করতেন, পাড়ের ওপর দিয়ে কত লোক যাতায়াত করছে, সেদিকে দিগঙ্গনাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না, যেন কুকুর বিড়াল বানর চলে যাচ্ছে এমনই তাঁদের ভাব। এই ব্যাপার দেখে আমরা যত হাসি, তাঁরাও তত হাসেন।

তা ছাড়া আমরা প্রায়ই গোলাপ বাগে বেড়াতে যেতাম, জানি না এর মত সুন্দর বাগান পৃথিবীতে আর ক'টি আছে। সে বাগানের দৃশ্য আমি কোনদিন ভুলব না। তিন তলা বাগান, বেশ থাক-করা, তবে তার ভাগ নীচে থেকে ওপর নয় ওপর থেকে নীচে। ঝরণার জল তেতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে একতলায় অবিশ্রান্ত পড়ে বয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটা খুব বড় চৌবাচ্চা আছে, তাকে ছোট-খাট পুকুর বললেও চলে, চারদিকে তার শ্বেত পাথরের গাঁথনি, সেটি প্রায় বিশ হাত লম্বা পনর হাত চওড়া, গভীরও মন্দ নয়,—অর্দ্ধেন্দুবাবুর মত লম্বা মানুষের একগলা-ডোব জল সব সময় থাকে। তার চারদিকে পর পর প্রায় হাজার কুলুঙ্গি, বেগমরা নাকি যখন সেই চৌবাচ্চায় নাইতে আসতেন তখন এই সব কুলুঙ্গিতে এক একটি করে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হ'ত। তারই ঠিক সামনে একটি শ্বেত-পাথরের বেদি, সেই বেদির ওপর বসে বাদশা তাঁদের স্নান দেখতেন, বেদির চার পাশে নালি কাটা আছে, জল বেশী হ'লে সেই নালি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাগানে পড়ত। দেখতে দেখতে আমার মনে হত ঝরণার এই জলবিন্দু যখন সুধামুখী সুন্দরী নবযৌবনোদ্ভাষিতা রমণীদের মুখে মাথায় পড়ত, তখন তাঁদের মুখের কি শোভাই না হ'ত! আর বাদশা সেই বেদির ওপর বসে সোনার গুড়গুড়িতে মুক্তার ঝালোর দেওয়া সরপোষে ঢাকা অম্বুরি তামাক টানতে টানতে রূপসী বেগমদের রূপের নেশায় বিভোর হ'য়ে তাঁদের সেই জলকেলি দেখতেন।

তারপর ফুলের কথা আর কি বলব, চারদিকে কত রকমের যে ফুল! তার মধ্যে গোলাপেরই বাহার বেশী। যে দিকে তাকাই সে দিকে কেবল গোলাপ—শত শত সহস্র সহস্র গোলাপ। আমার যে কি আনন্দ হ'ত তা আমি বলতে পারি নি। ছেলেবেলা থেকেই ফুল আমি বড় ভালবাসতাম, এ বৃদ্ধ বয়সেও আমি

ফুল ঠিক তেমনই ভালবাসি। গোলাপই আমার বেশী প্রিয়। আমি বাগান থেকে কোঁচড় ভরে ফুল তুলে আনতাম, এবং কত যত্ন করে সেগুলি সাজিয়ে রাখতাম, ফুল পেলে আমি কাজ-কর্ম্ম সব ভুলে যাই। কেউ ফুল ছিঁড়লে আমার ভারী কষ্ট হয়, মনে হয় ফুলের কত লাগে!

গোলাপ বাগ যাঁর জেম্মায় ছিল, তাঁর সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুবাবু খুব আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলেন। কাজেই সে বাগানে আমাদের অবারিত গতি ছিল। আমার যখন ইচ্ছে হত সেখানে যেতাম, যত ইচ্ছে ফুল তুলে আনতাম, বারণ করবার ত কেউ ছিল না। একদিন আমরা ক'জন মিলে সেই চৌবাচ্চায় না পড়ে, মাতামাতি জুড়ে দিলাম। ধর্ম্মদাসবাবু বাদশার জন্যে তৈরী সেই বেদির ওপর বসে বকাবকি আরম্ভ করলেন। ভয়ে ভয়ে ত সবাই উঠে পড়ল, আমি কিন্তু উঠলুম না। আমি চিরদিনই আহ্লাদে-গোপাল কিনা। নীলমাধববাবুও সেখানে ছিলেন, তিনি না এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে টেনে তুলে আমার সেই ভিজে কাপড় নিঙড়ে আমার গা মুছিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর দু'খানা শুকনো চাদর আমায় দিলেন, একখানা দু' পাট করে পরলুম, আর একখানা গায়ে দিলুম। এমনই ভাবে ত সে দিন বাড়ী গিয়ে পৌঁছলুম।

আমরা যে বাড়ীখানায় ছিলুম, সেটা পাঁচ তলা। তবে বাইরে থেকে দেখলে মনে হ'ত দোতলা, কেন না তার তিনটে তলা মাটির নীচে। সেখানকার লোকের মুখে শুনলুম, এখানে বড় গরম বলে এই রকম ব্যবস্থা। তা ছাড়া মুসলমানদের যখন রাজত্ব ছিল, তখন মেয়েদের ওপর পাছে অত্যাচার হয় এই ভয়ে তাদের লুকিয়ে রাখবার জন্যে এই রকম মাটির নীচে ঘর করা হ'ত। বাড়ীটায় সাপের বড় ভয় ছিল। অনেকে নাকি সাপ দেখেওচে—সাত আট হাত লম্বা সাপ নাকি! আমি কিন্তু কোনদিন দেখি নি। মেয়েদের ওপরে ওঠবার জন্যে ভেতর দিকে আলাদা সিঁড়ি ছিল, একটা সরু লম্বা গলি দিয়ে ভেতর মহলে যেতে হ'ত। নীলমাধববাবু সেখানে দাঁড়িয়ে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতেন, সাপেরাও নাকি আস্তে আস্তে সরে যেত, তারপর মেয়েরা ভেতরে ঢুকত। আমি কিন্তু ভয়ে সে সিঁড়ির দিকে যেতাম না—আমি বাইরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতাম। এ সিঁড়ি দিয়ে অবশ্য মেয়েদের ওঠা বারণ ছিল, সে কথা কে শোনে? আমার যে সাত খুন মাপ! তবে এই সাপ দেখার কথা সত্যি কি না, সে বিষয়ে আমার এখনও কেমন সন্দেহ আছে, হয় ত

"হাটে গেছল খায়ের মা
দেখে এসেছিল বাঘের ছা,
তুমি বল্লে আমি শুনলুম ,
হে দেখ্ মা, বাঘ দেখলুম।"

যাক্, ক্রমে আমাদের বিদায় নেবার সময় এল। শেষ অভিনয়ের দিন অর্দ্ধেন্দুবাবু একটি গান বেঁধে দেন, তাব একটি লাইন আমার মনে আছে , গানটি এই, –

"লাহোরবাসী, লইতে বিদায়
দুঃখে প্রাণে আমাদের সকলের – "

গানটি গাওয়া হ'ল,

"নিদয় বিধাতা, কেনবে আমারে,
ভারতে পাঠালে বমণী করিয়া – "

এই স্বরে। অভিনযেব পর একটি সভা হয়, আমবা সবাই এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে চোখের জলেব মধ্যে লাহোববাসীদেব কাছে বিদায় নিই।

আমাকে নিয়ে এখানে একটা ভাবি মজার ব্যাপার হযেছিল, ঠিক যেন গল্প। গোলাপ সিং বলে একজন মস্ত বড লোক সেখানে ছিলেন, তাঁকে সবাই রাজা বলে ডাক্‌ত ' তাঁব খেযাল হ'ল আমায় তিনি বিয়ে করে জাতে তুলে নেবেন। মাকে তিনি ৫০০০ পাঁচ হাজাব টাকা দিয়ে দেশে পাঠাতে চাইলেন, আর এ কথাও বল্লেন, মা যদি সেখানে থাকতে চান, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই , মাসে তিনি ৫০০৲ কবে দেবেন। মা ত কেঁদেই অস্থিব, তাঁব ভয় হ'ল যদি তিনি আমায় কেড়ে নেন। ধর্ম্মদাসবাবু তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, "না গো ওঁরা ভদ্রলোক, ওরা অসদ্ব্যবহার করবে না। আর আমরাও শিগ্‌গিব চলে যাচ্ছি, ভয় কি।" আমি সিংজিকে দেখেছিলুম, খুব স্থন্দর, কিন্তু যে তার লম্বা দাড়ি! দেখেই ভয় হ'ত, আমি ছোটবেলা দাড়িওলা লোক মোটেই দেখতে পারতুম না। হ্যাঁ একটা কথা বলা হয় নি, – 'সতী কি কলঙ্কিনী'তে আমি রাধিকা সেজেছিলাম, সেই সাজে আমায় দেখে তাঁর বিয়ে করতে খেয়াল হ'য়েছিল। শেষটা গল্পের মতই হ'ল, আমাদের বিয়ে আব হ'ল না।

এ ত সামান্য টাকা, – আমাব এই অভিনেত্রী-জীবনে দু'তিনবার পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে এসেছিল, থিয়েটাবের মায়ায় তা আমি ধুলোর মত দূরে নিক্ষেপ করেছিলাম। এখন সত্যি তার জন্যে অনুতাপ হয়, – যাক্ গতস্য শোচনা নাস্তি!

লাহোর থেকে আমরা মিরাট যাই, সেখানে মাত্র তিন দিন অভিনয় হয়েছিল। তারপর আমরা লক্ষ্ণৌ গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে একটা খুব হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সে কথা এর পরে বলব।

মিরাট থেকে লক্ষ্ণৌ যাবার মাঝখানে আমরা দিনকতক আগ্রায় "প্লে" করি, আগ্রায় আমরা বেশিদিন ছিলুম না। বোধ হয় সেখানে টিকিট বিক্রয় বড় বেশী হ'ত না। মাত্র তিন চার দিন আমরা আগ্রায় ছিলাম। রাত্রে অভিনয় হ'ত, আর দিনের বেলায় আমাদের কাজ ছিল, যমুনার ধার, আর বড় বড় সব বাড়ী দেখে বেড়ান। ধর্ম্মদাসবাবু এবং অবিনাশবাবু আমাদের এই সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁদের উপ'র নির্ভর করে আমরা যেমন বিদেশে গেছিলাম, তাঁরাও তেমনি যত্ন ক'রে আমাদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে বেড়াতেন, তাঁদের ব্যবহারে কোন দোষ ধরবার ছিল না। আগ্রায় অভিনয় করবার সময়ই কথা উঠলো, বৃন্দাবনের এত কাছে এসে, গোবিন্জী না দেখে দেশে ফেরাটা নিতান্তই অ-হিন্দুর মত হয়, কাজেই দলের সকলেরই মত হ'ল, লক্ষ্ণৌ যাবার আগে একবার শ্রীবৃন্দাবনধামে যাওয়াই উচিত, যেমনি কথা উঠলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'যে গেল। তখন আগ্রা থেকে বৃন্দাবন যাবার রেল হয় নি। আমাদের সব উটের গাড়ীতেই যেতে হ'ল। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে গাড়ীতে উঠলেম। উটের গাড়ীখানা দোতলা ছিল, আমি ত আগেই দোতলার ওপর উঠে বসলাম; লক্ষ্মী নারায়ণী আমার সঙ্গেই ওপরে এসে বসল। মা, ক্ষেতুদিদি এরা নীচেই বসলো,—কাদম্বিনীও তাদের সঙ্গে বস্‌লো। তিনি আমাদের সঙ্গে বড় মিশতেন না, তিনি একটু গম্ভীর হয়েই থাক্‌তেন, একে গায়িকা, তাতে আবার তখনকার বড় অভিনেত্রী—যাক, তারপর সমস্ত দিন রাত হটর হটর ক'রে উটের গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে পরদিন সকাল সাতটায় বৃন্দাবনে পৌছান গেল। যাবার সময় পথে সকলের কি আনন্দ, দেবদর্শনের জন্য সকলের কি উৎসাহ! থিয়েটার করতে এসে জীবনের একটা মস্ত সাধ পূর্ণ হবার সুযোগ গোবিন্জী করে দিয়েছেন। তখনকার দিনে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি ছিল। আমার মা ও ক্ষেতুদিদির আনন্দ যেন সকলের চেয়ে বেশী। যমুনার ধারে একটা মস্ত আধ্ ভাঙ্গা বড় বাড়ী, অট্টালিকাবিশেষ বললেও চলে, সেখানে গিয়েই আমি উঠলাম। পাণ্ডা ঠাকুর বোধহয় আগে থেকেই বাড়ীটা আমাদের জন্য ঠিক করে রেখেছিলেন। তারপর সব ধূলোপায়ে গোবিন্জী দেখবার ধূম। অর্দ্ধেন্দুবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু এঁদেরই উদ্যোগ

বেশী। সকলের জন্য জলখাবার কিনে বাসায় রেখে সবাই ধূলোপায়ে বেরিয়ে পডলেন, আমাব দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে কিন্তু সে সময়ে দেবদর্শনে নিয়ে যেতে কেউ রাজী হলেন না। সবাই বল্লেন, ঘুরে আসতে বেলা পডে যাবে, এ দুপুর রোদ্দুরে আমাব গিয়ে কাজ নেই, আমি বরং বাসায় বসে সকলের খাবার আগলাই। সন্ধ্যার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি কিন্তু যাবার জন্যে খুব কাঁদা-কাটা করলাম , কিন্তু সে কান্না আমার অরণ্যে রোদনই হ'ল। অর্দ্ধেন্দু-বাবু আমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রেখে গেলেন। তবে বন্দোবস্ত হ'ল, আমি দরজা বন্ধ ক'রে একলাটি ঘরে বসে থাকবো। কারণ, দরজা খোলা থাকলে বাঁদরে এসে উৎপাত ক'রতে পাবে। বৃন্দাবনে বড বাঁদরের উপদ্রব তখনও এখনও।

আমি কি করি! অগত্যা তাতেই সম্মত হ'লাম। খানিক পরে, একলাটি আর ভাল লাগে না। ক্ষিদেও যে না পেয়েছে তাও নয়, খাবাবের ঝুড়ি থেকে কিছু খাবার নিযে জানলায় ব'সে খেতে আরম্ভ কবলুম। মোটা লোহার গরাদ দেওয়া জানালা। এক কামড খেইছি , দেখিনা, একটা বাঁদর এসে জানালার ওপারের ছাদেব উপব ব'সে হাত পেতে খাবার চাইছে। কৌতূহল হ'ল, তাকে একটু খাবার ভেঙ্গে দিলাম। বাস , আর কোথায আছি , দেখতে দেখতে একে একে, দুইএ দুইএ বানর এসে ছাদে জমতে লাগলো। আমারও উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে বেডে উঠতে লাগলো। আমি তাদের সকলকেই খাবার দিতে আরম্ভ ক'রলাম। খানিক পরে দেখি ও দিককার ছাদে একপাল বাঁদর — আর এদিকে আমার খাবাবের চুবডী খালি। দু' একটা বাঁদর জানলার গরাদে ধ'রে নাডা দিতে লাগলো। আমি ভয়ে অস্থির! নিরুপায় হয়ে কেঁদে ফেললাম। বাঁদর কিন্তু আমার কান্নার মর্ম্ম কিছুই বুঝল না ; কোন বাঁদরই বোধ হয় বুঝে না। সেই লাফালাফি, দাপাদাপি আর হাত পেতে খাবার চাওয়া! আমি যত বলি, — "ওরে বাপু, আমার ভাঁডারে আর কিছু নেই" — তারা তত লাফায়, আর দাঁত খিঁচোয়। ছাদে বাঁদর আব ঘরের মধ্যে আমি, ঐ বাঁদরদেরই মত একজন, সব খাবার বিলিয়ে দিয়ে কাঁদছি, এমন সময়, আমাদের থিয়েটারের সকলে বাসায় ফিরলেন , আমি তাডাতাডি দোর খুলে দিলাম। সব খাবার নষ্ট করেছি, ভযে আড়ষ্ট। আমার মা, ক্ষেতুদিদি সবাই আমায় বকতে লাগলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু হেসে ব'ল্লেন, "বেশ ক'রেছে, সব ব্রজবাসীদের খাইয়েছে! যেমন ওকে নিয়ে যাও নি, তার উপযুক্ত ফলই ফলেছে।' সন্ধ্যের পর তাঁরা আমায় গোবিন্জী দর্শন করাতে নিয়ে গেলেন, দেখে যে আমার মনের অবস্থা কি হ'ল তা লিখে বোঝাবার নয়।

তার পরদিন 'নিধুবন' দেখতে যাওয়া হ'ল। যাবার সময় পাণ্ডারা বলে দিলেন, খুব সাবধান, দেখবেন কেউ কোন খাবার সঙ্গে নেবেন না, তা হ'লে ভারি মুস্কিলে পড়বেন, বাঁদররা ভারি উৎপাত করবে। আমরা এমনই আনন্দে বিভোর হ'য়েছিলাম যে, পাণ্ডার কথা কানেও তুললাম না। নিধুবনের কাছে এক জায়গায় ছোলা বিক্রি হচ্ছিল, আমি এর তার কাছ থেকে দু'একটা পয়সা চেয়ে নিয়ে ত ছোলাভাজা কিন্‌লাম, কিনে না নিয়ে কোঁচড়ে পুরে বেশ ক'রে চেপে ধরে সকলের আগে আগে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চললাম। চল্‌তে চল্‌তে যেমনই আমি দল থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়েছি, অমনই ঠিক আমারই মত অত বড় একটা বাঁদর কোত্থেকে এসে, আমার কাপড় চেপে ধরে বসে রইল। আমি আর কি করি, তাড়াতাড়ি ছোলাভাজা ফেলে দিয়ে ভয়ে চোখ বুজে পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগলাম। তখন দলের সব ছুটে এল, বাঁদরটাও পালিয়ে গেল। পাণ্ডারা বল্লেন আমি যখন ছোলাভাজা কিনি তখনই ঐ বাঁদরটা তা দেখেছিল এবং বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল।

শ্রীবৃন্দাবনধাম থেকে পরদিনই আমরা সেই উটের গাড়ী চড়ে আগ্রায় ফিরলাম। সেখানে এক রাত্রি বিশ্রাম ক'রে আমরা লক্ষ্ণৌয়ে রওনা হ'লাম।

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম থেকে পর দিনই আমরা ফিরে এসে একরাত্রি বিশ্রাম করা হ'ল। তারপর আমরা সদলবলে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলাম। আমাদের যাবার আগে সেখানে আমাদের একজন লোককে পাঠান হয়েছিল, সে গিয়ে আমাদের জন্যে একটা বাসা ঠিক করে রেখেছিল। আমরা গিয়ে ত সেখানে উঠলাম। সেখানে ছত্রমঞ্জিলে ধর্ম্মদাসবাবু সিন খাটিয়ে এক রকম ক'রে ষ্টেজ সাজিয়ে নিলেন, সে বেশ দেখতে হয়েছিল। কল্‌কাতার নামজাদা ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনয় করতে এসেছে শুনে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসতে লাগ্‌ল, থিয়েটার দেখবার জন্যে মারামারি পড়ে গেল। মস্ত বড় এক বাড়ীর মধ্যে আমাদের ষ্টেজ বাঁধা হ'য়েছিল। চারদিকে গ্যাসের আলো জ্বলছিল, সমস্ত বাড়ীটা লোকে ভরে গিয়েছিল, অভিনয়ের সময় বেশ জমজম করতে লাগল।

প্রথম দিন লীলাবতীর অভিনয় হ'ল। তারপর একখানি অপেরা, 'সতী কি কলঙ্কিনী', কি 'কামিনীকুঞ্জ' এমনই একখানি কি অপেরা, এই দু'খানি অপেরাই বেশী হ'ত।

দু'দিন অভিনয় করবার পর একদিন বিশ্রাম করবার জন্য অভিনয় বন্ধ রইল।

সে দিন আমরা বেড়াতে বার হ'লাম। কত বাগান, বেগম মহল আমরা দেখে বেড়াতে লাগলাম। তারপর আমরা নবাবের কেল্লা দেখতে গেলাম। মিউটিনির সময় একটা মস্ত বাড়ীর ওপর গোলা এসে পড়েছিল, সেই বাড়ীটা আমরা দেখ্‌লাম। তখনও দেওয়ালের গায়ে সেই সব গোলার দাগ রয়েছে, কোথাও বা অনেকটা বালি চুণ খসে গেছে, কোথাও বা খানিকটা জায়গা ভেঙ্গে রয়েছে।

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নেমন্তন্ন করে আসা হ'ল। যত বড় বড় সাহেব মেম ও ওখানকার যত সব বড় লোক, সবাই সে দিন থিয়েটার দেখতে আসবেন। তাই স্থির করা হ'ল 'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটকখানির অভিনয় সব চেয়ে সুন্দর হ'ত, সব চেয়ে জম্‌ত। সে নাটকখানি অভিনয় করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা!

নীলমাধববাবু কর্ত্তা সাজতেন, নবীনমাধব সাজতেন মহেন্দ্রবাবু, বিন্দুমাধব ভোলানাথ বলে একজন নতুন লোক, উড সাহেব অর্দ্ধেন্দুবাবু, তোরাব মতিলাল সুর, আর রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশ কর। অবিনাশবাবু দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, তার ওপর তাঁর স্বভাবটা ছিল একটু কাট্‌কাট্ মারমার গোঁয়ার গোবিন্দ গোছের, তাই নীলকুঠির সেই নির্দ্দয় স্বেচ্ছাচারী সাহেব সাজলে তাঁকে ভারি সুন্দর মানাত, দেখলেই মনে হ'ত হ্যাঁ সত্যিকারেরই রোগ সাহেব। আর মানাত উড সাহেবের ভূমিকায় মুস্তফি সাহেবকে—আড়ে বহরে লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা। তারপর মতিলাল সুরের তোরাব, সে তোরাব আর হ'ল না। যেমন তাঁকে মানাত, অভিনয়ও করতেন তিনি তেমনই সুন্দর। বিন্দুমাধবটি ভালমানুষ, কর্ত্তাও নিরীহ গোছের লোক।

ফিমেল পার্টে—ক্ষেতুদিদি সাবিত্রী, কাদম্বিনী সৈরিন্ধ্রী, আমি সরলা, লক্ষ্মী ক্ষেত্রমণি, আর সেই দাসীটি সাজতেন নারায়ণী।

পশ্চিমে আরও ক'জায়গায় নীলদর্পণের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের এই ঘেরা বাড়ীতে যেমন জমেছিল, এমনটি আর কোথাও জমে নাই।

সেদিন বাড়ী একেবারে লোকে ভরে গিয়েছিল। বড় বড় সাহেব মেম অনেক এসেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী, সামনে তাকালেই খালি লাল মুখ। মুসলমান অনেক ছিলেন, তবে বাঙ্গালী খুব কম।

অভিনয় ত আরম্ভ হ'ল। হ্যাঁ ভাল কথা, সে দিনকার প্রোগ্রাম ছাপা হয়েছিল ইংরাজীতে, এবং তার সঙ্গে দু'চার কথায় মোটামুটি গল্পটা লিখে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সেদিন যেন কেমন ভয় ভয় করছিল,—কিন্তু অভিনয় যতই

এগিয়ে যেতে লাগল, আমাদের সে ভয়ও ক্রমে ভেঙ্গে গেল। আমরা খুব উৎসাহ ক'রে অভিনয় করতে লাগলাম।

ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে, আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার করে বলছে, "ও সাহেব তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে।" তারপর তোরাব এসে রোগ সাহেবের গলা টিপে ধরে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ হয়েছে, অমনই সাহেব দর্শকদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফুট-লাইটের কাছে জমা হতে লাগল—সে একটা কি কাণ্ড! কতকগুলো লালমুখো গোরা তরওয়াল না খুলে ষ্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচজনে তাদের ধরে রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহুড়ি, কি ছুটোছুটি! ড্রপ ত তখনই ফেলে দেওয়া হ'ল,—আর আমাদের সে কি কাঁপুনি, আর কান্না! ভাবলাম, আর রক্ষে নেই, এইবার ঠিক আমাদের কেটে ফেলবে!

যাক, কতক সাহেব চলে গেল, যারা তখনও ক্ষেপে ষ্টেজের ওপর উঠে এল, তাদের আর পাঁচজনে ঠেকাতে লাগল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই কেল্লায় লোক পাঠিয়ে এক দল সৈন্য নিয়ে এলেন,—সে যে কি ব্যাপার তা আর কি বলব। সৈন্য আসতে তখন গোলমাল কতটা ঠাণ্ডা হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনই অভিনয় বন্ধ করে দিলেন এবং ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। কোথায় ধর্ম্মদাসবাবু চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না! অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পাওয়া গেল, পেছন দিকে ষ্টেজের নীচে তিনি চুপ করে বসে আছেন। কার্ত্তিক পাল ত তাঁকে ধরে টানাটানি করতে লাগলেন;—তিনি কিছুতেই উঠবেন না। তিনি যখন কিছুতেই গর্ত্ত ছেড়ে বেরুলেন না, তখন সহকারী ম্যানেজার অবিনাশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলে দিলেন, "এখানে আর অভিনয় করে কাজ নেই, পুলিস সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিমেলদের বাসায় পৌঁছে দিন। আজ রাত্রে সেখানে পুলিশ পাহারা দেবে। সাহেবেরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই।"

আমরা ত দুর্গা নাম ক'রতে ক'রতে গাড়ীতে উঠে বাসার দিকে রওনা হলাম। অনেক অভিনেতাও আমাদের গাড়ীর পেছন পেছন এক্কা করে আসতে

লাগলেন। সিন্ ড্রেস সব সেই খানেই পড়ে রইল, অবশ্য পুলিসের জিম্মায়। ঠিক হ'ল, সকালে এসে সব জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় এসে পড়লাম। সে ছাই বুকের কাঁপুনি কি আর যায়! খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠে গেল, অনেকেই কিছু খেলে না। সকালে কখন কি ক'রে কলকাতায় ফেরা যাবে তারই পরামর্শ হ'তে লাগল। সে রাতটা আর কারু চোখে ঘুম এল না, ঘুম কি আর আসে!

সকাল বেলা উঠে, ধর্ম্মদাসবাবুও আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে চলে গেলেন। সিন ড্রেস দেখে আসবার কথা উঠ্‌ল। ধর্ম্মদাসবাবু বল্লেন, "আমি ওখানে আর যাচ্ছি না, সিন ড্রেস থাক পড়ে।" সেখানে যে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁরা আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা নিজেরা কুলি পাঠিয়ে সিন্ ড্রেস সব আনিয়ে বেঁধে ছেঁদে লাগেজ ক'রে দিলেন। তাঁদের ভারি ইচ্ছে ছিল আরও দু'এক দিন এখানে অভিনয় হয়, তারা সব ষ্টেশনে এসে সে কথাও বল্‌লেন, "ষ্টেশনের মাঠে ষ্টেজ বেঁধে আপনারা আরও দু'টো দিন অভিনয় করুন।" কিন্তু কেউ আর সেখানে থাকতে রাজি হ'লেন না।

গাড়ী ছাড়বার অনেক আগে, আমরা ষ্টেশনে গিয়ে বসে ছিলাম। তখন ভয়টা আমাদের কমে এসেছিল, আর কি, ষ্টেশনে এসে পৌছেছি, এইবার গাড়ীতে উঠ্‌তে পারলেই ত কল্‌কাতায় পৌছে যাব। মনে সখেরও উদয় হ'ল, লক্ষ্ণৌ এলাম এখানকার কোন জিনিষ পত্তর ত নেওয়া হ'ল না। নীলমাধববাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তিনি তাই শুনে আমাব জন্যে কতকগুলো কাঠের খেলনা আর একখানি ফুলকাটা চাদর কিনিয়ে আনালেন। জিনিষগুলো পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হ'ল তা আর কি বল্‌ব। ভয়টয় সব কোথায় দূর হ'য়ে গেল। আমি খেলনাগুলো নিয়ে খেলতে বসে গেলাম! আমি ভারি চঞ্চল ছিলাম, তাই অনেকেই আমায় দেখতে পারত না। কনসার্টের লোকেদের ত আমি দু' চোখের বিষ ছিলাম। মাঝে মাঝে তাদের ঘর থেকে এটা ওটা নিয়ে আমি পালিয়ে আস্‌তাম কি না। তবে অর্দ্ধেন্দুবাবুও আমায় স্নেহ করতেন, আমায় মিষ্টি কথা বলতেন।

আর একটা কথা এখানে বলা দরকার। নীলমাধববাবুর সেই কবেকার সেই স্নেহের দান লক্ষ্ণৌয়ের সেই ফুলকাটা চাদরখানি এখনও আমার কাছে আছে, আমি সেখানি যত্ন করে তুলে রেখেছি।

যাক, দু'রাত ট্রেনে কাটিয়ে আমরা কল্‌কাতায় এসে পৌছে শেষ হাঁফ ছেড়ে

বাঁচলাম। তিন মাস কলকাতায় ছিলাম না, সব যেন কেমন নতুন নতুন মনে হ'তে লাগল।

এমনি ক'রে তিন চার মাস পশ্চিমে ঘুরে আমরা আবার দেশে ফিরে এলাম। আমার যতদূর মনে হয়, ন্যাশনাল থিয়েটারের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন থিয়েটার কোম্পানী এতদিন ধ'রে বিদেশে কাটান নি। প্রথম আমলে আমাদের মত ঘরবাসী বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে অতদিন ধ'রে বিদেশে ঘুরে বেড়ান একটা কম কথা নয়। এখনকার অভিনেত্রীদের বল্‌লে সহজে বড় কেউ অতদিন বিদেশে বেড়াতে রাজি হন কিনা সন্দেহ। নতুন জিনিষের আদর কদর চিরদিনই বেশী, থিয়েটারটা তখন আমাদের কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ, এই থিয়েটার যাতে ভাল চলে, দেশ বিদেশের লোককে এই থিয়েটার দেখাতে হবে, এই রকম একটা উৎসাহ এই বিদেশ বেড়ানর মূলে ছিল নিশ্চয়ই। নতুবা শুধু পয়সার খাতিরে সহজে কি আর বেদেদেব মত টোল্ ফেলে কেউ প্রবাসে ঘুরে বেড়াতে যায়? আর তখন থিয়েটারে পয়সাই বা কি ছিল, এখনকাব হিসাবে তখনকার মাহিনা এত কম যে, সে কথা না তুলাই ভাল। তখন দলের অধিকাংশই থিয়েটার ক'রতেন সখের খাতিরে, দেশে একটা নতুন জিনিষের প্রচারের জন্য, সম্পূর্ণ পেটের জন্য নয়। আব আমার মনে হয় গোড়ায় এমনি ক'রে তাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন বলেই আজ বাঙ্গালা থিয়েটারের এই আর্থিক উন্নতি হয়েছে।

কলকাতায় ফিরে এসে আমি মাস খানেক, কি দু'মাস ন্যাশনাল থিয়েটারে কাজ করেছিলাম, তারপর কি কারণে ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ন্যাশনাল থিয়েটার উঠে যাওয়াব জন্যই আমি বেঙ্গল থিয়েটারে ভর্ত্তি হই। পুর্ব্বেই বলেছি বেঙ্গল থিয়েটারের তখন মালিক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সাতুবাবুর দৌহিত্র ৺ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এবং ৺ চারুচন্দ্র ঘোষ। বেঙ্গল থিয়েটারে আগে খোলার চাল ছিল, এবারে গিয়ে দেখলুম, খোলার বদলে করগেট হ'য়েছে, বাইরেরও অনেক অদল বদল হয়েছিল। কিন্তু হ'লে কি হয়। প্লাটফরম সেই মাটির ঢিপিই ছিল। প্লাটফরমের আগাগোড়া মাটি—মাঝে খানিকটা তক্তা বসান, নীচে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ষ্টেজের ভেতর হতে বরাবর অডিটোরিয়ামে যাওয়া যেত। যারা কনসার্ট বাজাত তারা ঐ পথ দিয়েই যাতায়াত করত। মাটির প্লাটফরমের কারণ এই—বেঙ্গল থিয়েটারের ষ্টেজে অনেক নাটকে ঘোড়া বার করা হ'ত। শরৎবাবুর ঘোড়ার সখ ছিল খুব; তিনি খুব ভাল সওয়ার ছিলেন, তখন শুনতাম, তাঁর মত

ঘোড়ার সওয়ার বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিল না। শরৎবাবু তাঁর এই ঘোড়া চড়া নিয়ে অনেক গল্প বলতেন ; আমরাও দেখেছি, ষ্টেজে ঘোড়া বেরিয়ে দুষ্টুমি করছে, কিন্তু যেই শরৎবাবু ঘোড়াব গায়ে হাত দিলেন, অমনি সে শান্ত শিষ্ট, যেন কিছুই জানে না। শরৎবাবুর একটা সখের টাট্টু ঘোড়া ছিল। তিনি সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে তাঁদের বাড়ীতে, একতলা থেকে, সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলায়, ঠাকুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। আর তাঁব ঠাকুরমা, ঠাকুরের প্রসাদী ফল-মূল ঘোড়াকে খেতে দিতেন।

আমি যখন বেঙ্গল থিয়েটারে যাই, তখন সেখানকার অভিনেতা ছিলেন স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরি বৈষ্ণব, গিরিশ ঘোষ (ল্যাদাড়ু), মথুরবাবু(এখনও জীবিত), শরৎবাবু নিজেও অভিনয় করতেন ; শরৎবাবুর এক ভাগিনের উমিচাঁদ বাবু প্রভৃতি , আর সব নাম মনে নেই। অভিনেত্রী ছিলেন গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলাকেশী, ভূনী, তারপর আমি গিয়ে যোগ দিই। বেঙ্গল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন অনেক। ডিবেক্টাবদের মধ্যে ছিলেন কুমার বাহাদুর, পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী, ব্রহ্মব্রত সামাধ্যাযী, হালদার মহাশয় ব'লে একজন ব্যারিষ্টার কি উকিল, ভূষণবাবু ইঁহাবা প্রাং রোজই আসতেন, আর সকল পরামর্শের মধ্যে থাকতেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহারা বাঁচিয়া আছেন, জানি না। আর কারও সঙ্গে দেখাও হয় না। আরো সব গণ্য মান্য শিক্ষিত কত ভদ্রলোকই যে আসতেন, তাঁদেরই বা কি উৎসাহ। তখনকার থিয়েটার একটা সাহিত্য আলোচনার স্থান ছিল। কত রকমের কথা, কত প্রসঙ্গ যে চলত, তখন কিই-বা বুঝি ! তবে দেখতাম যে, থিয়েটার একটা বিশিষ্ট ভদ্র সম্প্রদায়ের বৈঠক ছিল।

পূর্ব্বে যে উমিচাঁদ বাবুর কথা বলেছি, তাঁর মৃত্যুর কথা মনে হ'লে এখনও প্রাণ কেঁদে ওঠে। ওঃ – সে কি – হৃদয় বিদারী দৃশ্য !

আমাদের কোম্পানী কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে অভিনয় করবার জন্য আহূত হয়েছে। আমরা সব দল বেঁধে, যে যার মোট ঘাট নিয়ে শিয়ালদহে গাড়িতে গিয়ে উঠেছি। রিজার্ভ করা গাড়ী। আমরা দলে চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন হব, সব এক গাড়ীতেই আছি। কলকাতা থেকে ছেড়ে, গাড়ী কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে দাঁড়াল, ছোট বাবু (স্বর্গীয় চারুবাবু) বল্লেন, "উমিচাঁদ জলখাবার নেওয়া হয় নি, বড় ষ্টেশন, দেখত যদি কিছু খাবার পাও।" উমিচাঁদবাবু খাবার আনতে গাড়ী থেকে নামলেন। খানিক পরে খাবার নিয়ে ফিরেও এলেন, কিন্তু কি একটা ভুল হওয়ায়

আবার তিনি দোকানে ছুটলেন। দৈব-দুর্ব্বিপাক। তাঁর ফিরে আসবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, ছোটবাবু "উমিচাঁদ উমিচাঁদ" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় বা উমিচাঁদ—গাড়ী ছেড়ে দিলে। ছোটবাবু গাড়ীর দরজা খুলে, গলা বাড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, "উমিচাঁদ উমিচাঁদ।" উমিচাঁদবাবুকে দেখা গেল! তিনিও ছুটতে ছুটতে এসে চলন্ত গাড়ীতে উঠে পড়লেন, ছোটবাবু এক রকম তাঁর হাত ধ'রে টেনে তুললেন। কিন্তু তুল্‌লে কি হবে? গাড়ীতে উঠেই উমিচাঁদবাবু একখানা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে কথা নেই, সর্দ্দি-গরমী হয়েছে, গাড়ী কিন্তু তখন ছুটে চলেছে। জল, জল—চারিদিকে রব উঠলো—জল—জল। কিন্তু কি গ্রহের ফের, আমরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক আছি বটে, কিন্তু আমাদের কারও কাছে এক ফোঁটাও জল নেই। গাড়ীর মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। কি হবে! মৃত্যু পথের যাত্রী—কিন্তু তাঁর পিপাসার্ত্ত কণ্ঠে দেবার জন্য এক ফোঁটাও জল নেই! হায়, হায়, ভেবে দেখুন, তখন আমাদের কি অবস্থা! আমাদের মধ্যে অভিনেত্রী ভূনীর কোলে তখন একটি ছোট মেয়ে। কোন উপায় না দেখে, ভূনীর স্তন-দুগ্ধ ঝিনুকে ক'রে গেলে, উমিচাঁদবাবুর মৃত্যু-মুখে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তাতে কি হবে? উমিচাঁদবাবু দু'চার ঝিনুক দুধ খেতে না খেতেই সকল মায়া কাটিয়ে পরপারে চ'লে গেলেন, গাড়ীশুদ্ধ সকলে কেঁদে উঠলো! ছোটবাবু বালকের মত কাঁদতে লাগলেন—"উমিচাঁদ, তোর মা'কে কি বলবো, কি ক'রে তাঁকে মুখ দেখাব? তুই যে তোর মা'র এক সন্তান?" পাছে, সোরগোল শুনে গাড়ী কেটে দিয়ে যায়, এই ভয়ে সকলেই চুপ ক'রে রইল, কারও মুখে একটিও কথা নাই। উমিচাঁদবাবুকে একখানা চাদর চাপা দিয়ে রাখা হ'ল, যেন ঘুমুচ্ছে! ঘুমুচ্ছেই বটে! কিন্তু সে ভাঙ্গবার ঘুম নয়, জাগবার ঘুম নয়!

যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে থামলে, ছোটবাবুরা সকলে লাস জ্বালাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এমনি করে উমিচাঁদকে পথের মাঝে হারিয়ে আমরা কৃষ্ণ-নগরে পৌঁছিলাম। অভিনয়ও হ'ল। কিছুই আটকাল না। সংসার নাট্যশালায়ও এমনি ত নিত্য হ'য়ে থাকে। কার জন্য কিছু আটকায় না, যে যাবার সেই যায়। যারা থাকে, তারা তাদের নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা নিয়মিতভাবে অভিনয় ক'রে চলে যায়। উমিচাঁদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। দুদিন বাদে কেউ আর তার কথা বড় মনে ক'রে রাখে না। এই দুনিয়া!

কৃষ্ণনগর থেকে আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন কারু মুখে হাসি ছিল না,

সকলেরই মুখে গভীর বিষাদের ছায়া। উমিচাঁদের এই আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।

যাক্, এইবার যা বলছিলাম তাই বলি। তখন বেঙ্গল থিয়েটারে মহাকবি মাইকেলের অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ'কে নাটকাকারে পরিণত ক'রে তার অভিনয়ের আয়োজন চলছিল। কি ক'রে 'মেঘনাদ বধ'কে একখানি অভিনয়যোগ্য নাটক করা যায়, সে সম্বন্ধে গিরিশবাবু নাকি সাহায্য করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এই নাটকখানি অভিনয় করতে আমায় বিশেষ মেহনত করতে হয়েছিল। প্রথমে আমরা ত তার ভাব ও ভাষা ঠিক রেখে ভাল ক'রে পড়তেই পারছিলাম না। আমাদের মত অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের পক্ষে ঐ ছন্দ আয়ত্ত করা যে কিরূপ দুরূহ তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারেন। তবে যাঁদের উপর আমাদের শিক্ষার ভার ছিল, তাঁদেরই কৃতিত্বে আমরা অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলাম। তাঁদের শিক্ষার পদ্ধতি চমৎকার ছিল। তাঁদের কথামত আমরা প্রথমে আমাদের পার্টটি বার কয়েক পড়ে যেতাম। তারপব তাঁরা ভাবটা আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। আমরা যখন বেশ বুঝতে পারতাম, তখন সেইখানে বসে বসে মুখে মুখে আমাদের আবৃত্তি কবতে দিতেন। তারপর তাঁরা অভিনয় উপযোগী করবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের যে কি পরিশ্রম করতে হ'ত, তা লিখে বোঝাবার নয়। তাঁদের কি অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল!

আমি পুর্ব্বে একবার বলেছি, স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত দিনের বেলায়। রিহার্সেল শেষ হ'ক আর না হ'ক রাত্রি ১০টার পর আর কোন কাজ হ'ত না। ১০টাব পর আর সেখানে কেউ থাকত না।

বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী এই বেঙ্গল থিয়েটারেই প্রথম খোলা হয়। দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎ সিংহ সাজতেন শরৎবাবু, ওসমান হরি বৈষ্ণব, কতলু খাঁ বিহারীবাবু, বিমলা গোলাপ, আশমানী এলোকেশী, আয়েষা আমি ও তিলোত্তমা ভূনী। কিন্তু সময় সময় আয়েষা ও তিলোত্তমা দুইই আমায় সাজতে হ'ত, কেন না ভূনির আসার কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না, সে সময়ে অসময়ে কামাই করত। আয়েষা ও তিলোত্তমার একটি জায়গা ছাড়া মুখোমুখী আর কোথাও দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। তবে ঐ একটি জায়গার জন্য কোন অসুবিধা হ'ত না, কেননা মূর্চ্ছিতা-বস্থায় তিলোত্তমার সঙ্গে আয়েষার দেখা, তিলোত্তমার ত আর কথাবার্ত্তা ছিল না। কিন্তু ঐ দুইটি বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয় করতে আমার ভারি কষ্ট পেতে হ'ত।

মৃণালিনী নাটকে পশুপতি কিরণবাবু, হেমচন্দ্র হরি বৈষ্ণব, বক্তিয়ার ছোটবাবু, অভিরামস্বামী বিহারীবাবু, দিগ্বিজয় ল্যাদাড়ু গিরিশ, মৃণালিনী ভুনি, মনোরমা আমি, গিরিজায়া গোলাপ। এই মনোরমা অভিনয়ের সমালোচনাকালে তখনকার বড় বড় ইংরেজী খবরের কাগজ আমায় 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ ষ্টেজ' 'সাইনোরা বিনোদিনী' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

কপালকুণ্ডলাও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। নবকুমার সাজতেন হরি বৈষ্ণব, আর কাপালিক সাজতেন বিহারীবাবু। কাপালিক সেজে বিহারী চাটুয্যে মশায় যখন ষ্টেজে দাঁড়াতেন, তখন তাঁকে দেখতে কি ভয়ানক হ'ত। আমি তখন কপালকুণ্ডলা সাজতাম, আর মতিবিবি সাজতেন গোলাপ। কাপালিকের সাম্‌নে এসে যখন দাঁড়াতাম ভয়ে আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠত।

এ সব কত দিনের পুরাণ কথা। এ সমস্ত স্মৃতি আমার মনে বেশ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হ'য়ে আছে। তখনকার অভিনয় কি সুন্দর সহজ স্বাভাবিক হ'ত। অভিনয় যে কি রকম জীবন্ত হ'য়ে উঠত, তা আমি লিখে ঠিক বোঝাতে পারচি না, পারবও না। সে সব চিত্র আমার মনের ভেতর বুকের ভেতর ছুটোছুটি করছে, লুটোপুটি খাচ্ছে, কিন্তু আমি তাদের বের করে ঠিক ভাবে সবাইয়ের সাম্‌নে ধরতে পারছি না। সে যে বুঝিয়ে বলবার জিনিষ নয়, অনুভূতির জিনিষ। এখনও আমি প্রায়ই থিয়েটার দেখ্‌তে যাই, সেখানে গিয়ে যেন কি খুঁজি—কিন্তু তা আর খুঁজে পাই না! সময় সময় এমন অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই যে এদের সব অভিনয় অঙ্গভঙ্গীকে ঠেলে ফেলে সেই পূর্ব্ব স্মৃতি মূর্ত্তি ধরে সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়, তাঁদের সেই ভাব ভঙ্গী গতিবিধি দপ দপ ক'রে আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে জ্বলে ওঠে।

সে সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের অশ্রুমতি ও সরোজিনী নাটকের অভিনয় হ'য়েছিল। সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জমত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখ্‌তেন সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হ'য়ে যেতেন। একদিনকার ঘটনার উল্লেখ করলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। আমি সরোজিনী সাজতাম। সরোজিনীকে বলি দেবার জন্যে যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল, রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা ক'রে রাজা স্বদেশের কল্যাণ কামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন, উত্তেজিত রণজিৎ সিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারি

হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাট্‌তে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বল্‌লেন, "সব মিথ্যে সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর," অমনই সমস্ত দর্শক এত বেশী উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন যে তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হ'ল , তাঁদের ষ্টেজের উপর থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রূষা করতে লেগে গেল! তাঁরা যখন প্রকৃতিস্থ হ'লেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হ'ল।

একটা কথা আমি না বলে থাক্‌তে পাচ্ছি না। আমরা সেজে গুজে যখন ষ্টেজে নামতাম, তখন আমরা আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে যেতাম। আমাদের নিজেদের সত্তা অবধি ভুলে যেতাম। সে সব কথা মনে হ'লে এখনও গা শিউরে উঠে!

'সরোজিনী' নাটকের একটী দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জলছে, সে আগুনের শিখা দু'তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্ করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের ওপর ৪।৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাট জেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের শাডী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই

"জ্বল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
দেখ্‌বে যবন দেখ্‌রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥"

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে পডছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠছে, তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু

বা কাপড় ধরে উঠছে—তবুও কারু ভ্রূক্ষেপ নেই—তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হ'ত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।

একবার আমি প্রমীলা সেজে চিতারোহণ করতে যাচ্ছি। এমন সময় আমার মাথার রুক্ষ চুল ও চেলির কাপড়ের খানিকটা আঁচলে আগুন ধরে গেছল—আমি তখন এমনই আত্ম-বিস্মৃত হ'য়েছিলাম যে কিছুই অনুভব করতে পারি নি। আমার চুল জ্বলছে কাপড় জ্বলছে আমার হুঁস নেই। আমি সেই অবস্থায় আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। উপেন্দ্র মিত্র মহাশয় রাবণ সেজেছিলেন, আমার এই বিপদ না দেখে, তিনি ত সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে দু' হাত দিয়ে থাব্‌ড়ে সেই আগুন নিবুতে লাগলেন। তখন যবনিকা সবে অর্দ্ধেক পড়েছে। যাই হ'ক আর পাঁচজন ছুটে এসে কোন রকমে আমাকে ত সে যাত্রা পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। উপেনবাবুর হাত ঝল্‌সে গেছল, আমার দেহের স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়েছিল।

এখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা পরস্পর পরস্পরকে কি চোখে দেখে তা আমি ঠিক বল্‌তে পারি না,—তবে তখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে বিশেষ স্নেহ মমতার বন্ধন ছিল, পরম আত্মীয়ের মত একজন আর একজনকে দেখ্‌ত।

অভিনয় করতে গিয়ে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাঝে মাঝে আরও কত রকম বিপদে পড়তে হয়। আমারও হ'য়েছিল। এখানে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করব। একবার গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারে ব্রিটেনিয়া সেজে আমি শূন্য পথে আসছি, এমন সময় হঠাৎ তার ছিঁড়ে গিয়ে আমি ধপ্ করে ষ্টেজের মাঝে এসে পড়লাম। গিরিশবাবু মহাশয় ক্লাইভ সেজে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি ঠিক তাঁর সাম্‌নে এসে ত পড়লাম। আমাকে হঠাৎ ধপ্ করে পড়তে দেখে তিনি ত চম্‌কে উঠলেন। আমার বাঁ হাতে ছিল ইংলণ্ডের মানচিত্র, আর ডান হাতে ছিল রাজদণ্ড। আমি ত কোন রকমে সেই রাজদণ্ডের সাহায্যে মুখ থুবড়ানর থেকে নিজেকে সাম্‌লে নিলাম, নিয়েই অভিনয় আরম্ভ করে দিলাম—"ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি রে বাছনি—" গিরিশবাবু যেন নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচলেন। ওদিকে সুধী দর্শকবৃন্দের হাতের তালি হাতেই রয়ে গেল। ধর্ম্মদাসবাবু ছিলেন ষ্টেজ ম্যানেজার, গিরিশবাবু ভেতরে এসে তাঁকে এই মারেন ত এই মারেন।

আর একবার ষ্টার থিয়েটারে নল-দময়ন্তী অভিনয় হচ্ছে। তাতে একটি

সরোবরের দৃশ্য ছিল, সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে। মধ্যস্থলের পদ্মটি সবচেয়ে বড়, সেই পদ্মের মধ্য থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন, বের হয়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটি কম্পমান পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন। এমনই ভাবে একে একে ছয় জন কমলবাসিনী বার হয়ে আস্‌তেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গানও গাইতে হ'ত। প্রত্যহ বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত গিরিশবাবু নিজে দাঁড়িয়ে সখিদের শেখাতেন। এই নৃত্যগীত অভ্যাস করতে গিরিশবাবুর কাছে তাদের যে কত গাল খেতে হ'যেছিল !

সরোবরের এই দৃশ্যটি দেখতে ভারি সুন্দর হ'ত। জহর ধর মহাশয় এই সিন্‌টা সাজিয়েছিলেন, তিনি সত্যিকারের একজন কলাবিদ্‌ ছিলেন।

আমি দময়ন্তী সেজে সাজঘর থেকে বেরিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দর্শকবৃন্দেরা খুব হাততালি দিয়ে উঠ্‌লেন। শুন্‌লাম একজন সখি না আসায় সব গোলমাল হ'য়ে গেছে—সিন্‌ তুলতে দেরী হচ্ছে, তাই এই ঘন ঘন হাততালি। আর ত দেরী করা চলে না, গিরিশবাবু এসে আমায় ধরলেন, "বিনোদ তোকে বেরুতে হবে।" আমি ত হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সর্ব্বনাশ ! সেই কম্পমান পদ্মের ওপর সখীদের দেখলেই যে ভয়ে আমার বুকটা দুড়দুড় করে উঠ্‌ত। আর আমাকেই কিনা সেই পদ্মের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে, আমি যে একদিনও অভ্যাস করি নি। এ ত দেখছি ভারি বিপদে পড়া গেল। তার ওপর আমি দময়ন্তী সেজে মাথার চুল সব ফিটফাট ক'রে এসেছিলাম, ফুলের মুকুট পরে কমলবাসিনী সাজ্‌তে গেলে যে আমার সব চুল খারাপ হ'য়ে যাবে। তখনকার দিনে এত রকমের পরচুলো পাওয়া যেত না। আমায় কখনও পরচুল পরতে হয় নি। আমার নিজের চুলকে আপন ইচ্ছামত তৈরী করে নিতাম। ভগবানের কৃপায় আমার চুলের খুব বাহার ছিল, আমার ঘন চুল এমন নরম ছিল যে যেমনভাবে ইচ্ছে তাকে কুঁচকিয়ে ঘুরিয়ে নিতে পারতাম। তাই আমায় কখনও ধার-করা চুল পরতে হয় নি। তখনকার দিনে এই কেশ প্রসাধনের জন্য আমার বেশ খ্যাতি ছিল। যাক্‌ সে কথা, গিরিশবাবু ত আমায় আদর করে মিষ্টি কথা বলে সখি সাজিয়ে ঠেলে ঠুলে ষ্টেজে পাঠিয়ে দিলেন। একটা চলতি কথা আছে না 'খোঁড়ার পা খালে পড়ে'। 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।' আমার ঠিক তাই হ'ল। যেমন ক্রেনে চড়ে ওপরে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছি, অমনই আমার এলো চুলের রাশি পাক খেয়ে দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেল—আর চড়চড় করে চুল ছিঁড়তে আরম্ভ হ'ল। আমার অর্দ্ধেক মুখ তখন পদ্ম থেকে বেরিয়েছে, নেমেও পড়তে

পারি না, ওদিকে চুল ছেঁড়ার সে কি জ্বালা! 'আরে চুল গেল চুল গেল' বলতে বলতে দাশুবাবু না একখানা কাঁচি এনে তিন চার জায়গা কেটে আমার মাথাকে ত ছাড়িয়ে দিলেন।

ভেতরে এসে রাগে আমি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলুম। আমি গোঁ ধরে বস্লুম আমি আর সাজব না, কিছুতেই সাজব না।

তখন গিরিশবাবু এসে কেমন আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল্লেন, "ও এমন কত হয়। তোর খানিকটা চুল নষ্ট হ'য়ে গেছে বলে তুই কাঁদছিস, আর জানিস্ বিলেতের বড় বড় অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকের মাথায় একেবারেই চুল থাকে না, মুখে একটা দাঁতও থাকে না। তুই চুলের জন্যে কাঁদবি কেন? একটা গল্প বলি শোন, গল্প শুন্তে শুন্তে পোষাকটা পরে নে।" এই বলে তিনি গল্প আরম্ভ করলেন, "বিলেতের একজন খুব বড় অভিনেত্রী, অভিনয় শেষ করে বাড়ীতে ফিরে এসে প্রথমে পোষাকটি ছেড়ে ফেললেন, তারপর মাথার সেই কোঁকড়ান বাহারে পরচুলের রাশ খুলে রাখলেন, তাঁর দুপাটি দাঁতই বাঁধান ছিল, তা মুখ থেকে টেনে বার করলেন। তাঁর ৫।৬ বছরের একটা মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলে, তারপর তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর নাক ধরে টানাটানি করতে লাগল। তার ধারণা হয়েছিল, তার মা'র নাক-কানও বুঝি জোড়া দেওয়া।" আর কি রাগ থাকে, কোন রকমে হাসি চেপে আমি বললাম,—"যান মশায় আমার সঙ্গে আর কথা বলবেন না।" এই বলে হাসতে হাসতে আমি ষ্টেজে গিয়ে নামলুম: তিনিও কাজ উদ্ধার ক'রে দিয়ে হাস্তে হাস্তে চলে গেলেন।

গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার জোর জবরদস্তি, মান অভিমান রাগ প্রায়ই চলত। তিনি আমায় অত্যধিক আদর দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন। আমিও তাই বড্ড বেড়ে উঠেছিলুম, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করতুম, কিন্তু তার জন্য তিনি আমায় একটি দিনের জন্যও তিরস্কার করেন নি, অনাদর অযত্ন ত করেনই নি। তবে আমিও একটি দিনের জন্য এমন কোন কাজ করি নি, যাতে তাঁর এতটুকু ক্ষতি হয়।

পরিশিষ্ট : খ *

বাসনা

বি নো দি নী দা সী

সাধনা।

নিতুই নূতন ভাবে গাঁথি ফুলহার।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, বনফুল কত সাজে
প্রেমডোর দিয়ে তারে বাঁধি অনিবার
সে মালা কি ভালবাস প্রাণেশ আমার ? ॥

স্বাধীন বনের ফুল স্ব-ইচ্ছায় ফোটে
কণামাত্র মধু ল'যে, কণ্টকের বোঝা ব'য়ে
সাধ ক'রে ঝরে পড়ে প্রিয় পায় লুটে
তাহাতে কি প্রেমময় তব মন উঠে ?

---

* বাংলা ১৩০৩ সালে বিনোদিনী 'বাসনা' নামে কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করে নিজ জননীকে উৎসর্গ করেছিলেন। তখন বিনোদিনীর বয়স ৩৩ বছর এবং প্রায় দশ বছর থিয়েটারের সঙ্গে সংস্রবশূন্য। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৪ এবং মোট ৪১টি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে মাত্র ১৯টি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করা হল। এ থেকেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন, শুধু অভিনেত্রী বলেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিনোদিনীর কবিতাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার কোনো যুক্তি নেই। বাংলা সাহিত্যে সেকালের মহিলা কবিদের কাব্যের তুলনায় বিনোদিনীর কোনো-কোনো কবিতা বোধ হয় নিন্দনীয় নয়। বিনোদিনীর অভিনয়-প্রতিভার গভীরে একটি কবি-প্রতিভাও বর্তমান ছিল, তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ এই কবিতাগুলির মধ্যে। বিনোদিনীর মানসিক প্রবণতা ও স্বভাবের চমৎকার প্রতিফলন এতে দেখা যাচ্ছে। এর পরে ১৩১২ সালে বিনোদিনী 'কনক ও নলিনী' নামে একটি ক্ষুদ্র কাহিনীকাব্য রচনা করে নিজ বালিকা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলা দাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। বইটি একটি 'কাব্যোপন্যাস' নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। অন্যত্র তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হয়েছে। দ্র. পরিশিষ্ট : গ।

চাঁদেতে চকোরে খেলে আকাশের গায়
বসিয়ে লতাবিতানে, আনন্দ বিভোর প্রাণে
বনপাখি নাচে গায় প্রেমোদিত কায়
কুল কুল তানে যবে নদী ব'য়ে যায় ॥

স্বপনসঙ্গিনী ল'য়ে নীরব নিশীথে
কত ভাবে খেলা করি, কতই যতনে ধরি।
বিনা সূতে গেঁথে হার তোমায় বাঁধিতে,
ভাল কি বাস না নাথ! তাতে বাঁধা দিতে?

ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার কোলে বিজলীর হাসি
মধুর মলয়নলে, সোহাগে কুসুম টলে
কোকিলের কুহুতান পথিকের বাঁশি।
ঘুমন্ত শিশুর মুখে সরলতারাশি ॥

এসব সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ বলে ধরাবাসী,
আমার নয়ন মন, তব প্রেমে নিমগন;
অসীম সৌন্দর্য্য হেরে ও মুখের হাসি।
তোমার প্রণয় প্রাণ সদা অভিলাষী ॥

নিকটে বা দূরে থাক তুমিই কামনা,
তুমি হৃদয়ের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি,
প্রেমভাবে সদা তোমা করি আরাধনা।
সিদ্ধ যেন হই নাথ! ইহাই বাসনা ॥

—

স্মৃতি।

স্মৃতি লো বিষের জ্বালা দিও নাকো আর,
এ সংসারে চিরদিন কিছুই না রয়,
তবে কেন দুঃখ তুমি দাও অনিবার।
তুমি মনে হলে প্রাণে জ্বালা অতিশয় ॥

অস্থায়ী সংসারে কিছু চিরস্থায়ী নয়,
সুখ দুঃখ চিরদিন ঘোরে সমভাবে ;
কালের কবলে সবে হয়ে যাবে লয়।
অনন্ত নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমাবে ॥

কালে নব ভুলে সব কালেতে বিলীন,
চিরদিন নাহি কিছু রহে সুখ আর।
তথাপি সকলে রহে তোমার অধীন ,
সকলি ভুলিতে পারে তোরে ভোলা ভার

যা হবার হইয়াছে পুড়েছে হৃদয়,
কেবল বিষের জ্বালা স্মরণে তোমার।
এখন জীবন মম শ্মশান আলয়।
তবুও তোমার চিন্তা দহে অনিবার ॥

দয়া ক'রে ভুল মোরে শক্তিস্বরূপিণী,
স্মৃতি হ'তে বিস্মৃতিতে অধিক সন্তোষ।
ছাড়িয়ে আশার আশা হ'য়েছি দুঃখিনী ,
আপনা ভুলিলে পরে আরো পরিতোষ ॥

—

সোহাগ।

আসে সন্ধ্যা দেখি সব নাচে ফুলচয়
হাসে কলি, গায় পাখী
সোনার বরণ মাখি
হেলে দুলে তরতরে বহিছে মলয় ॥

পরশে মলয়ানিল কলিকা সকল
কেহ চমকি চাহিল
(মৃদু) হাসি কেহবা হাসিল
অনিল পরশে কেহ হইল বিকল ॥

মৃদু মৃদু ধীরে ধীরে বহিল পবন
ফুটিল গোলাপকলি
রূপের ঘোমটা খুলি
আদরেতে সমীরণ চুমিল বদন ॥

সোহাগে গোলাপ কয় যাও নাথ যাও
এখন কহিছ কত
প্রেমকথা নানা মত
মল্লিকা পাশেতে গেলে ফিরে নাহি চাও ॥

জানি হে পুরুষজাতি নিঠুর-নিদয়
থাকে যবে যার কাছে
যেন সে তাহার আছে
অদর্শনে কোন কথা প্রাণে নাহি রয়।
যাও যাও প্রাণনাথ আদর এ নয় ॥

পিপাসা।

তৃষিত চাতকী প্রাণ কাতর রহিল,
জীবন শুকাল তবু বারি না মিলিল ;
নবীন নীরদ পানে, চাহিত তৃষিত প্রাণে
এই আশা ছিল মনে বুঝি বারি পাব ,
জানি না জগতে আমি এরূপে শুকাব ॥

শীতল বারির তরে কাতর হইয়া
শত বজ্র ধরিয়াছি হৃদয় পাতিয়া
খেলিত দামিনী-বালা, গগন করিয়ে আলা
এ হৃদয়ে দিত ঢেলে আঁধারের রাশি।
আমারে দেখিয়া হাসিত ঘৃণার হাসি ॥

ঘনঘটাপরিপূর্ণ যে দিকে হেরিত,
কাতর পরাণ মম সেখানে ধাইত,
শুধু বজ্রাঘাত পেতো হৃদয় ভাঙ্গিয়া যেতো
ভাঙ্গা হৃদে কতবার জোড়াতাড়া দিয়ে
তথাপি নীরদ পানে থাকিতাম চেয়ে ॥

শুধু আকাঙ্ক্ষিত প্রাণ রহিল এখন,
কখন না পেলে বিন্দু বারির সিঞ্চন ॥
এখনও রয়েছে মোর, দারুণ আশার ঘোর
নিবেও নিবে না তাহা খালি হাহাকার,
এরূপ জীবন শেষ হইল আমার ॥

সারাদিন।

সারাদিন সমীরণে খেলিয়া বেড়াই
সন্ধ্যার আলোক জ্বলে, প্রাণের নিভৃত কোলে
নিশ্বাস লুকায়ে রেখে পথ পানে চাই
একটি তারার আলো দেখিবারে পাই ॥

সারাদিন ঘুমঘোরে অবশ হৃদয়
সন্ধ্যার আলোক পেয়ে, একবার দেখে চেয়ে
মিলন মলিন ভাবে গায় প্রেমগান।
বায়ুর নিশ্বাস সনে মিশে সেই তান ॥

সারাদিন স্বপনের ছায়াপথে বসে
সন্ধ্যার বিষাদ-মাখা, আধ ছায়া আধ ঢাকা
ভাসিয়া ডুবিয়া তাতে ভাবি অবিরাম।
মরমের গ্রন্থি-মাঝে গাঁথা যেই নাম ॥

সারাদিন ছায়াপথে প্রাণ কোথা যায়,
শূন্যে গিয়ে ফিরেঘুরে, কার অন্বেষণ করে,

কাতর প্রাণের কথা সমীরণে গায়।
সন্ধ্যার আলোক সনে ফিরে যে ধরায়॥

সারাদিন প্রাণ মোর জাগিয়া ঘুমায়,
কিবা চাই কিবা পাই, এই আছে এই নাই,
ভাবি মনে ঘুমঘোরে দিন কেটে যাক্।
ববির উত্তাপ তাপে সন্ধ্যা আলো পাক্॥

সারাদিন স্বপ্নে বসে গাঁথি ফুলহার
সাঙ্গ হ'লে ফুলহার, চেয়ে দেখি চারিধার।
ন্ধ্যার আলোক মাঝে ভাসে এক তারা।
না ফেলিতে অশ্রুকণা, হয় পথ-হারা॥

—

কি যেন।

নীবব যামিনী মাঝে বসি নদীকুলে।
দূর স্বপ্ন স্মৃতি যেন,
মনেতে উদয় হেন
জীবনের কোন পথ গেছি যেন ভুলে॥

সুখ স্মৃতি কিবা যেন আসে যায় মনে
গহনে নির্ঝর সনে,
বসি যেন দুইজনে,
চেয়ে যেন মুখ পানে প্রফুল্ল বদনে॥

কি যেন সুখের কথা বলেছিল তার।
নির্ঝরের ঝর্ ঝরে
মিশি যেন তার স্বরে
নূতন মধুর কিবা হয়েছিল আর॥

সজল উজ্জ্বল যেন নয়ন যুগল
আধ যেন হাসি হাসি,
আধ যেন জলে ভাসি,
কাতর করুণাপুর্ণ হৃদয় কমল ॥

কবে যেন যত্ন করে গেঁথেছিনু হার,
নিজ হাতে ফুল তুলি,
বেছেছিনু সবগুলি
কোথা কি কণ্টক কিবা কীট আছে তার ॥

কি যেন আশার আশে হৃদয় মগন।
আগমন প্রতীক্ষায়,
দূরে যেন প্রাণ ধায
শুষ্ক পত্র পতনেতে সলাজ নয়ন ॥

নিরাশা-পুরিত প্রাণে পুর্ব স্মৃতি কেন।
শুষ্ক তৃণ শয্যা যাব,
মহা রত্ন স্বপ্ন তাব ,
মরুভূমি মাঝে কেন মরীচিকা হেন ॥

—

অনুতাপ।

১

এখন কি সেইরূপ ভালবাস মোরে।
এখন কি দয়া হয়, এখন মমতাময়,
আছে কি হৃদয় তব এ দাসীর তরে ॥

২

কঠিন পাষাণ আমি ভুলেছি তোমায়।
ভুলেছি তোমার দয়া, ভুলেছি তোমার মায়া
ভুলিয়াছি অকারণ জ্বালাতে জ্বালায় ॥

৩

ভুলিয়াছি সেই দিন, যে দিন তোমায়
বিনা দোষে দোষী করে, থাকিতাম রাগ ভরে,
যতনে ধরিয়া কর সাধিতে আমায় ॥

৪

আদরে ধরিলে কর যেতাম চলিয়া,
অতিশয় কাতর হয়ে থাকিতে যে পথ চেয়ে
দীর্ঘশ্বাসে যেত কত মরম দহিয়া ॥

৫

আবার হেরিলে মোরে সোহাগে তখন,
ভাসিত যুগল আঁখি, হৃদয়ে আনন্দ মাখি,
কতই যতন করি তুষিতে যে মন ॥

৬

লইয়া গোলাপ ফুল দিতে গেলে করে,
ফুলে যদি ব্যথা পাই, দিব কিনা দিব তাই,
এই কথা বার বার ভাবিতে কাতরে ॥

৭

ক্ষণে ক্ষণে করিতাম কত জ্বালাতন,
নিদারুণ বাক্যবাণে, সতত দাহিতে প্রাণে,
তবু অযতন মোর করনি কখন ॥

৮

চাঁদেরে দেখিতে ভাল বাসিতাম বলে।
বলিতে সোহাগ ভরে শশী কোথা কহ মোরে
গগনেতে শশী কিবা রয়েছে ভূতলে ॥

৯

কি দেখিছ সুবদনি চাঁদ মুখ তুলে।
ও ত ধনী শশী নয় তব প্রতিবিম্ব হয়
আকাশেতে খেলা করে মম হৃদি ভুলে ॥

১০

তোমার আদরে আমি এত আদরিণী।
শিখায়েছ অভিমান তাই নাহি পুরে প্রাণ
তুমিই করেছ মোরে এত গরবিণী ॥

১১

সকল হৃদয় ঢেলে তুষিতে আমায়।
তোমার আদরে মোরে সংসারে আদর করে,
কেন আঁধারের কোলে ছিলাম কোথায় ॥

১২

প্রাণ ভরা প্রেম পুরা আদর তোমার।
কেনা জানে অভিমান লুকায়ে বিকায় প্রাণ
এত জেনে অযতন কেবা করে আর ॥

১৩

নারী আবরণ মাত্র উপরে আমার।
ভিতরে পাষাণ দিয়া গড়েছে কঠিন হিয়া
পাষাণ কি গলে কভু দিলে অশ্রুধার ॥

—

শিখাও আমায়।

আজিকে শশাঙ্ক বড় সেজেছ সুন্দর।
কালিমা হৃদয়ে,
পরাণ গলায়,
আনন্দেতে মত্ত হয়ে হয়েছ বিভোর ॥

কাহার হৃদয় শশী করিতে রঞ্জন
লয়ে ফুল হাসি
খেলা কর শশী
মেঘেতে ঢালিয়ে কায় কোথায় গমন ?

লইয়া কলঙ্ক রেখা হাসিছ কেমন
কলঙ্কিনী নাম
ঘোষে ধরাধাম
দেখ এ হৃদয়শূন্য তম-আবরণে
যুগান্তেব জ্বালা শশী সহিছ কেমনে ॥

দেখ হে সুধাংশু নিতি হইলে নির্জ্জন
বসি তরুতলে
নয়নসলিলে
ধুইয়া করিতে চাই কলঙ্ক বর্জ্জন।
ততই হৃদয় মাঝে দহে হুতাশন ॥

একটি বচন তুমি রাখ আজি মোব।
হৃদয়ে কলঙ্ক
লইযে শশাঙ্ক
কেমন হইয়া থাক সুখেতে বিভোব।
আমারে শিখাও শশী দাসী হব তোব ॥

—

কেন যে এমন হল।

বিষাদিত প্রাণ মন কিসের কারণ,
কেন এত ভাঙ্গা ভাব হৃদয়-মাঝারে,
কেন ছলে ঘুরে এসে দেয় আবরণ।
মরমে মরমে পিযে প্রাণের সুসারে ॥

যেন কোন দেশান্তরে হারায়েছি প্রাণ,
শূন্য দেহ বহি সদা ঘুরিয়া বেডাই,
চারিদিকে দেখি সব জনশূন্য স্থান,
সংসারে বাসনা মম কিছু যেন নাই ॥

চিত্রিত সংসার যেন শূন্যভারে দোলে,
চিত্র করা ফল ফুল যেন শব্দহীন,
আঁকা তরু আঁকা পাখী আঁধারের কোলে
সকলই শূন্যে ভরা চেতনাবিহীন ॥

পূর্ণ শশী কাঁদে শুয়ে যামিনীর গায়,
ভেঙ্গে ভেঙ্গে বয়ে যায় মলয়পবন,
দিনমানে প্রেম খেলা পাখি ভুলে যায়।
তমসায় ডোবে সব আশার স্বপন ॥

কি চাই কি নাহি পাই কিসের কারণ,
সদাই কাতর প্রাণ মন উচাটন,
ছায়া আবরণে যেন কাটাই জীবন,
চির আঁধারের কোলে করিয়া শয়ন ॥

—

কি কথাটি তার।

কি যেন প্রাণের কথা বলে গেল কে ?
যেন কোন দূর দেশে, কি যেন প্রাণের আশে
কিসের তরে কোথায় যেন গিয়েছিল সে
কি যেন প্রাণের কথা বলে গেল কে ?

যেন সে চাঁদের কোলে তারার সনে
খেল্‌তো দিবা নিশি।
যেন সে ফুলের সনে হেলে দুলে
নাচতো সুখে ভাসি ॥

যেন সে মধুর আলো গায়ে মেখে
চল্‌তো বাতাস ভরে
যেন সে শূন্যে মিশে
যেতো ভেসে দেশ দেশান্তরে।

যেন সে প্রাণের ভিতর ধরত কত
সোহাগের ফুল
আপন মনে থাক্‌তো সদা
ঘুমে ঢুলু ঢুল।

জ।নতো যেন আকাশেতে
বাড়ী ঘর তার।
আর কি কোথায় আছে কিনা
জানতো নাকো আর ॥

যেন সে ভেসে ভেসে দেশে দেশে
ধরতো ফুলের হাসি।
কত সাধ করে আপন গলায়
পরতো প্রেমের ফাঁসি ॥

যেন সে চাঁদের চুমোয় বিভোর হয়ে
হতো আপন হারা
মলয়নিলে কোলে কোরে
ভাবতো পাগল পারা ॥

যেন সে ঘুমের ঘোরে চম্‌কে উঠে
চাইতো চারি ধার।
দেখতো কাছে সদা আছে
মুখখানি কার ॥

এখন যেন সেখান হতে যাচ্ছে চলে সে
কি যেন প্রাণের কথা বলে গেল কে ॥

—

একটি গোলাপ।

কার তরে ফুটেছ লো গোলাপ সুন্দরী
কে তোরে আদর করে
কে রাখে হৃদয় পরে
কার জন্যে ছড়াতেছ রূপের মাধুরী ॥

বল কার আদরেতে তুমি আদরিণী
কে তোমায় ভালবাসে
কার সুখ-সাধ আশে
পরেছ সুন্দব সাজ ওলো সোহাগিনী ॥

কিবা কথা বল্ তোর সমীরণ সনে
দুলে দুলে ঢলে ঢলে
হেসে হেসে গলে গলে
আদরে সোহাগ ভরে আনন্দিত মনে ॥

জাননা কি চিরকাল থাকে না আদর
আজি প্রফুল্লিত মনে
মিশায়ে সোহাগ সনে
যার কথা কহিতেছ আনন্দ অন্তর ॥

দুই দিন পরে তুমি দেখিও আবার
তোমার সে প্রাণধন
আনন্দে বিভোর মন
অন্য ফুলে করে পান মধু অনিবার ॥

এখন আদরে তোরে হৃদয়ে ধরেছে
কালি নাহি রবে ঘোর
ভাঙ্গিবে স্বপন তোর
দেখিবি অন্যের প্রেমে সোহাগে মজেছে ॥

ত্যজি তোর ভালবাসা ভুলেছে সকল
কাঁদিলে না ফিরে চাবে
সাধিলে না কথা কবে
কমল হৃদয়ে সাব হবে অশ্রুজল ॥

—

হৃদয়বত্ন।

এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়রতন।
অনন্ত শূন্যেতে সদা করি অন্বেষণ ॥
বাসনা বিবশ আজি খুঁজিয়া তোমায়।
তাইতে কাতর প্রাণ স্মরণ যে চায় ॥
জ্ঞানময় চিদানন্দ চৈতন্যস্বরূপ।
বিরাজিত আছে যাঁর প্রতি লোমকূপ ॥
হেরিব কোথায় সেই বিশ্বের চেতন।
পরমাত্মা জীবাত্মায় কোথায় মিলন ॥
যোগময় কোন যোগে নিদ্রায় মগন।
স্বরূপ চৈতন্য কোথা আছে অচেতন ॥
ব্রহ্মময় ব্রহ্মরূপ কেমন মহিমা।
উৎপত্তি বা লয় যাহা কোথা তার সীমা ॥
কালস্রোতে ভেসে গিয়ে মিশে কোন জলে।
কালের মিশ্রিত জল স্থিতি কোন স্থলে ॥
কোথা সে অনন্ত যার অন্ত নাহি পাই।
কোথা জ্ঞানরূপ যাতে আপন হারাই ॥
যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহাতেই লয়।
কেমন আধার তাহা দেখি সাধ হয় ॥

—

আর একবার।

একদিন এ জীবনে চাহি দরশন।
ইহাই জানিবে মম শেষ আকিঞ্চন॥
স্মৃতির বিষম জ্বালা সহি অনিবার।
মধুময় বাক্যে তোষ আর এক বার॥
ফুলের সুবাস সহ কোথা গেছ ভেসে।
ঘুমঘোরে আছ কোন জোছনার দেশে॥
দূর কাননের কোলে পাখী যেন গায়।
সেইরূপ স্মৃতি মম তোমারে জাগায়॥
মম দরশন-আশে বিজন কাননে।
একাকী থাকিতে তুমি আপনার মনে॥
দুই তিন দিন যদি এভাবে যাইত।
তবু অসন্তোষ হৃদে স্থান না পাইত॥
মম আগমন শব্দ শুনিলে শ্রবণে।
বিমল আনন্দ তব ভাতিত নয়নে॥
দূর হতে যেন মম আহ্বানের তরে।
নয়নের জ্যোতিঃ তব আসিত ঠিকরে॥
নীরব বাসনাপূর্ণ হৃদয় তোমার।
এ জীবনে দেখি নাথ আর একবার॥
কত দিন কত নিশি অভিমান ভরে।
থাকিতাম শুধু তোমা কাঁদাবার তরে॥
ক্ষণেকের তরে যদি চাহিতাম হাসি।
ভাসিত আনন্দকণা অশ্রুসনে আসি॥
স্বর্গীয় শোভায় তব নয়ন ভরিত।
মূর্ত্তিমতী ক্ষমা যেন নয়নে উদিত॥
হেরে সে স্নেহের ছায়া বিমল বদনে।
অনুতাপ উপজিত আপনার মনে॥
আর একবার তুমি তেমন করিয়া।
দেখা দেও সেইরূপ মধুর হাসিয়া॥

বহুদিন শুনি নাই সে মধু বচন।
বহু দিন দেখি নাই উজ্জ্বল নয়ন॥
বহু দিন পাই নাই প্রাণের আদর।
বহু দিন হেরি নাই সরল অন্তর॥
বহুদিন হারায়েছি প্রেমের চুম্বন।
বহু দিন ছিঁড়িয়াছে হৃদয় বন্ধন॥
এখন হৃদয় মন পাগল আমার।
আর একবার দেখি এই শেষবার॥

—

কে বা গায়।

নীরব নিশীথ মাঝে কে ওই গাইছে রে?
গাইছে দুঃখের গান, সমীরণে মিশে তান।
ধীরে ধীরে স্বর-মালা ভাসিয়া যাইছে রে
নীরব নিশীথ মাঝে কে ওই গাইছে রে?

শ্রান্ত ক্লান্ত স্বর ওই গগনে মিশায়,
প্রফুল্লতা নাহি স্বরে, তথাপি যে সুধা ক্ষরে
সুখস্বাদ অবসান নিরাশ আশায়
বসিয়ে বিজন দেশে কেবা ওই গায়॥

বিস্বাদেতে মাখা ওই সঙ্গীত সুন্দর
দিগন্ত ব্যাপিয়া ধায়, যেন সে জানাতে চায়
প্রত্যেক লহরী তার অশ্রুবারিময়
সমীরণে ডাকি যেন দুঃখকথা কয়॥

প্রফুল্লতা কভু যেন ছিল সেই স্বরে
আজি সে উৎসাহ নাই, হৃদয় হয়েছে ছাই,
প্রতিবর্ণ প্রতিছত্র আবরণ করে
শীতের শিশির মাঝে যেন ডুবে মরে॥

পূর্ণ না হইতে যেন মনের বাসনা
ভেঙ্গেছে হৃদয় তার, আশা বাসা নাহি আর
সংসারে তাহার কিছু নাহিক কামনা
ধীর ভাবে শিখিয়াছে সহিতে যাতনা ॥

যেন সে মরম গাঁথা মরমে লুকায়
অতটুকু হৃদে তার, সহে যে দারুণ ভার
আপনার প্রাণে সদা লুকাইতে চায়
তাই সেই মৃদু তানে সুধা ভেসে যায় ॥

আবার চাঁদ।

শশি রে সুন্দর সাজ কে দিয়েছে তোরে।
ভাল বাস ভাল বাসি, আনন্দ সাগরে ভাসি
বুক ভবা মুখ ভবা ঐ হাসি হেরে ;
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা কে শিখাল তোরে ॥

চাঁদ রে শুধাই তোরে বল একবার।
এমন মধুর প্রাণ, সুধা ভরা কাণে কাণ
অঙ্কিত করেছ কেন কলঙ্ক রেখায়
এতরূপে হৃদি কালী ঢাকা নাহি যায় ॥

বল শশি। কি বেদনা প্রাণেতে তোমার
কেন ও হৃদয় মাঝে, কলঙ্কের রেখা সাজে
কি আঘাতে ভেঙ্গেছে ও নির্ম্মল হৃদয়।
(আহা) না জানি হৃদয় তব কত ব্যথা সয় ॥

আমারে বলিতে শশি! দোষ নাহি কিছু
সমব্যথী হলে পরে, বেদনা জানায় তারে
ব্যথিত হৃদয় তার হয় যে সান্ত্বনা
শশি রে মনের দুঃখ আমায় বল না!

একটি কালীর দাগে এত তব যাতনা
দেখ এ হৃদয় মাঝে, কত শত দাগ সাজে
দেখ কত শিখিয়াছি সহিতে বেদনা।
শশি রে মনের দুঃখ আমায় বল না॥

—

স্বপ্নে আশা।

একদিন ঘুমঘোরে দেখিনু স্বপন।
ফুটেছে সুবর্ণ পদ্ম সলিল শোভন॥
পূজিতে বাসনা করি, যতনে করেতে ধরি,
তুলিনু সে স্বর্ণপদ্ম মানসমোহন।
আচম্বিতে ইষ্টদেব হলো অদর্শন॥

বলে গেল যেন ফিরে আসিবে আবার।
যতনে লইবে মম এই উপহার॥
সেই রূপ সেই থেকে, দিন গুনি একে একে,
এলো গেল কতদিন সে তো এলো নাই।
কোথায় রয়েছ ভুলে সংবাদ না পাই॥

আগে যদি জানিতাম আসিবে না আর।
আসি বলে যেতে হয় সেই যাওয়া তার॥
তা হ'লে কি ফুল লয়ে, থাকিতাম পথ চেয়ে,
তুলিয়ে কি এই পদ্ম মৃণাল হইতে।
দিতাম কি মৃণালেরে সলিলে ডুবিতে॥

উঠেছে আকাশে রবি প্রবলপ্রতাপে।
শুকায় বিমল পদ্ম আতপের তাপে॥
তথাপি রয়েছে ঘোর, ভাঙ্গে নি স্বপন ঘোর,
ডুবিল যে মৃণালিনী তাপিত অন্তরে।
পুড়িল নলিনী বালা উষ্ণ রবিকরে॥

এলো দিন গেল চলে সকল নিবিল।
ছায়া সম স্বপ্ন কথা মনেতে রহিল ॥
কেটে গেল যুগান্তর, তবু কেন এ অন্তর,
আসে আসে এই আশা ছাড়িতে নারিল।
কত দিন হয়ে গেল আশা না পুরিল ॥

ওরে আমার খুকি মাণিক।

নেচে নেচে খেলা করে ওরে যাদুধন
নেচে নেচে তালি দিয়ে, এস যাদু মা বলিয়ে,
জুড়াক আমার প্রাণ হেরিয়ে বদন।
ওরে মোর খুকুরাণী অমূল্য রতন ॥

কত সুধা ঝরে রাণী ও কোচি অধরে
তালি দিয়ে নেচে চল, কোটি চাঁদ ঝল মল,
কনক কিরণ কণা পড়ে ঝরে ঝরে।
অনিমেষে হেরি তবু প্রাণ নাহি ভবে ॥

কি দিয়ে গড়েছে বিধি কিসে প্রাণ ভরা
চাঁদের ঘুমান হাসি, তোমার অধরে আসি,
ফুলের কমল কায় আবরণ করা।
মধুর মাধুরীময় প্রাণমনহরা ॥

বল দেখি এত সুধা কোথা তুমি পাও
ক্ষুদ্র ও হৃদয়খানি, সুধা রসে পূর্ণ জানি,
দুঃখিনী মায়েরে কত যতনে বিলাও।
আমি কেন যেবা চায় তারে তুমি দাও ॥

ননীর পুত্তলি মম ওরে খুকুরাণী
কত জন্ম পুণ্য ফলে, ও চাঁদ পেয়েছি কোলে,

জুড়ায় তাপিত প্রাণ হেরি মুখখানি।
আমার দুখের মেয়ে ওরে পুঁটু রাণী ॥

কত কথা কও রাণী আধ আধ স্বরে
মা মা বলি ছুটি ছুটি, এস রাণী গুটি গুটি,
কতই সুন্দর হাসি খেলে ও অধরে।
কোটি কোটি শশী যেন একত্র বিহরে ॥

কত জ্বালা ভুলি রাণী হেরি চাঁদ মুখ
যখন গলাটি ধরে, মা বোলে ডাক আদরে,
মনেতে পড়ে না আর সংসারের দুঃখ।
মরুভূমি মাঝে তুমি স্বরগের সুখ ॥

শত কোটি নমি আমি শ্রীহরির পায়
তাঁহার কৃপার বলে, তোমারে পেয়েছি কোলে,
দয়া করে দীর্ঘজীবী করুন তোমায়।
করযোড়ে নমে দাসী, এই ভিক্ষা চায় ॥

—

কোথা গেলি।

আয়রে প্রাণের পাখি
হৃদয় মাঝারে তোরে লুকায়ে রাখি
গহন কানন মাঝে
কোথা তুই হারাইয়া যাবি
হৃদয় বিহঙ্গ তুই মোর
পথ কোথা পাবি ॥
চিরদিন বাঁধা ছিলি
হৃদয় পিঞ্জরে ;
আজিকে কেন রে পাখি
গেলি তুই উড়ে।
বড় যে যতন কোরে
রেখেছিনু হৃদ্‌পিঞ্জরে

বলনা তুই কেমন কোরে
পলাইয়ে গেলি।
মনের মতন সাধের পিঞ্জর
আবার কোথায় পেলি ॥
বাঁধা ছিলি প্রেমশিকলে
কেমনে তা ফেল্লি খুলে
ক'ইতিস কত প্রেম কথা
সব কি তুই গেলি ভুলে
অজানা অচেনা দেশে
কেমনে বেড়াবি ॥
মনের মতন সাধের শিকল
আবার কোথায় পাবি ॥
হৃদয় পিঞ্জরে তুই
থাক্‌তিস সদা সুখে
বল দেখিরে প্রাণের পাখি
উড়্‌লি কোন দুঃখে।
সাধ করে দিয়েছিলি ধরা
সাধ করে উড়্‌লি
সাধ করে যে গড়্‌নু খাঁচা
শূন্য করে গেলি ॥

—

শকুন্তলা।

রাখ একটি বচন
ক'রো নাকো আঁধার জীবন
না হয় ফিরায়ে দাও
সে প্রেম মিলন।
নির্জ্জন কানন মাঝে
বসিয়ে বকুল তলে
সোহাগে ধরিয়ে হাত

বলেছিলে প্রাণনাথ
এস প্রিয়ে বাঁধি তোমা
প্রেমের বন্ধনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে
নিঠুর সংসার ভুলে
এস খেলি দুইজনে
সুখের স্বপনে।
সাক্ষী থাক লতাগণ
আর মলয় পবন
গোলাপ মালতীফুল
আর এই তরুমূল
গগনবিহারী ঐ
বিহঙ্গিনীগণ।
গগনে হাসিছে তারা।
চাঁদে ঢালে সুধা ধারা
দেহ প্রিয়ে অধীনেরে
প্রেমেব চুম্বন ॥
বিনিময়ে নাও এই
দেহ প্রাণ মন।
সেই ত তটিনী কূল
সেই সব বনফুল
সেই ত গগনে শশী
সেই তরুতলে বসি
বিষাদে মলিন কেন
বিমল বদন।
নয়নে সে জ্যোতি কই !
অধরে সে হাসি কই
আজি অবনত কেন
উজ্জ্বল নয়ন ॥

পরিশিষ্ট : গ *

কনক ও নলিনী

বি নো দি নী দা সী

১

"নলিনীরে আয় ভাই, দেখ আর বেলা নাই,
এতক্ষণ এসেছেন পিতা যে কুটীরে।
যপমালা কুশাসন, আহ্নিকের আয়োজন,
করি নাই, দেখ ব'ন রবি বৃক্ষ শিরে॥
শুষ্কপত্র জড় ক'রে রাখিয়াছি শয্যাতরে,
বাতাসেতে উড়ে বুঝি গিয়েছে সকল।
গেল বেলা একেবারে, চল ব'ন যাই ঘরে,
সারাদিন নদীতীরে বেড়াবে কেবল?"
ছোট ভগ্নী নলিনীরে, কনক ডাকিছে ধীরে,
আসিল নলিনীবালা কনকের কাছে।
এলোচুল মাথাভরা, ফুলমালা তাতে পরা,
গলাবেড়া বনফুল কেমন দুলিছে॥
মধুর উজ্জ্বল ভাতি, দশন মুকুতাপাতি,
নবীনা নধরবালা যেন বনফুল।
হাসি হাসি মুখচাঁদ, যেন সুধামাখা ফাঁদ,
নবম বর্ষিয়া বালা রূপেতে অতুল॥

---

* বিনোদিনীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কনক ও নলিনী' ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয়। দুটি বালক-বালিকার মধুর সম্পর্ক ও শোচনীয় পরিণাম নিয়ে এই ৪৫ পৃষ্ঠার কাহিনীকাব্যখানি বিশেষ যত্নসহকারে মুদ্রিত ক'রে বিনোদিনী নিজ "স্বর্গগতা ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলা দাসীর উদ্দেশে" উৎসর্গ করেছিলেন। সেই কাব্যের কিছু অংশ নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত হল। সম্পাদক।

কনক নলিনী দুটি, তাপসের ঘরে ফুটি,
বেড়াইত আলো ক'রে এই তপোবন।
তাপস তনয়া তারা সরলা সুধার ধারা,
মূর্তিমতী বনদেবী মূরতি মোহন॥
নাহি জানে মাতৃস্নেহ, পিতা বই নাই কেহ,
জানে শুধু পিতা আর তারা দুটি ব'ন।
সঙ্গিনী হরিণীগণ, নদী আর এ কানন,
ইহা ভিন্ন আছে কিছু ভাবেনি কখন॥
কনক পড়েছে এবে, ত্রয়োদশ বর্ষ সবে,
হাসে, ভাষে, আসে আশে, পুনঃ ফিরে চায়।
হেনভাব যৌবনের, মনে ঘুরে কনকের,
ছুটে সে হরিণী সনে আবার দাঁড়ায়॥
বেড়ায় আপন মনে, 'আকাশে নক্ষত্র গণে,
পাখীদের গান শুনে নদীতীরে বসি'।
গাছের আড়েতে গিয়ে, চাঁদ দেখে উঁকি দিয়ে,
বলে, – দেখ আমাদের দেখিতেছে শশী॥
যৌবন আসিতে চায়, কিশোর সম্মুখে ধায়,
ছেলেখেলা দেখে পুনঃ লাজেতে পালায়।
প্রজাপতি উড়ে যায়, কনক ধরিতে ধায়,
আবার দাঁড়ায় হেরে ফুল সুষমায়॥
ফুলেতে ভ্রমর বসে, দেখিয়ে কনক হাসে,
অলির পরশে ফুল ভাবে ঢল ঢল।
ভ্রমরের সাধাসাধি, ফুল যেন কত বাদি,
তা' দেখি কনকবালা হাসে খল-খল॥
কুটীরের দ্বারে এসে, দেখে পিতা আছে ব'সে,
শিশির সহিত করে শাস্ত্র আলাপন।
ছুটিয়ে নলিনীবালা, ধরিয়ে পিতার গলা,
বলে, – 'পিতা কুটীরেতে আসিলে কখন?'
হাসিয়ে তাপস কয়, 'এই কতক্ষণ হয়,
সবেমাত্র করিয়াছি সন্ধ্যা সমাপন।

বৃদ্ধ তাপসের তরে, কিছু আয়োজন ক'রে,
না রাখিয়ে কোথা বাছা ছিলি এতক্ষণ ?
দেখ সন্ধ্যা হয় হয়, এখনও কি বনে রয়,
শিশির করিয়ে দিল সব আয়োজন।'
কনক কহিছে ধীরে, 'খুঁজিতে যে নলিনীরে,
রবি অস্তাচলে পিতা, করিল গমন ॥
পাখীদের গান শোনা, আকাশের তারা গণা,
এতক্ষণে নলিনীর হলো সমাপন।
আমি খুঁজি বনে বনে, ছুটে ও হরিণী সনে,
বলি ব'ন ঘরে এস, না শুনে বচন ॥'

—

২

একবিংশ বয়ক্রম শিশির এখন।
শান্ত ধীর সুপণ্ডিত মধুর বচন ॥
তীর্থ পর্য্যটন গিয়ে দ্বারকা ভুবন।
পাইয়ে অনাথ শিশু আনে তপোধন ॥
পিতা মাতা কেহ তাব ছিল না সংসারে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক পালিত তাহাবে ॥
এবে তাপসের হাতে ক'রে সমর্পণ।
জীবনের পরপার করেছে গমন ॥
কুটীরে আনিয়ে তায় পিতার মতন।
যতনে তাপস তারে করেন পালন ॥
বড বুদ্ধিমান সেই বালক শিশির।
শান্ত ধীর নম্র অতি সরল সুধীব ॥
শাস্ত্র আলাপনে হয় গুরুর সমান।
প্রাণ দিয়ে খুঁজে সদা তাঁহার কল্যাণ ॥
রূপ গুণ সমভাবে এক সাথে রয়।
তাহাতে যৌবন আসি হইল উদয় ॥

ছেলেখেলা গেল সব দেখিয়ে যৌবন।
সদাই প্রফুল্ল প্রাণ উজ্জ্বল নয়ন॥
কনক নলিনী সনে খেলে বনে বনে।
ফুল তুলে মালা গেঁথে সাজায় দুজনে॥
ফুলের মুকুট দিয়া দু জনার শিরে॥
হাত ধ'রে লয়ে যায় সরসীর তীরে॥
বলে,—দেখ দুই ব'নে সেজেছে কেমন।
লক্ষ্মী স্বরস্বতী যেন আলো করে বন॥
জ্যোৎস্না রাত্রিতে ব'সে চাঁদের কিরণে।
বলে,—দেখ এক শশী রাজিছে গগনে॥
ভূতলেতে দুই শশী কাননে বেড়ায়।
পক্ষ অন্তে শশী উঠে গগনের গায়॥
দিনে দিনে কলা পূর্ণ হয় শশধর।
নলিনী কনক চাঁদ পূর্ণ নিরন্তর॥
সমভাবে দুই জনে সতত আদরে।
দ্বিধা কিছু নাহি মনে সরল অন্তরে॥
কিন্তু কনকের মন কখন কেমন।
কি যেন কিসের আশে হয় নিমগন॥
কি অভাব মনোমাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়।
এই বুঝি এই নয় কোথায় পলায়॥
ফুল প্রজাপতি খেলা দেখিয়া এখন।
কনকের নাহি আর পূরে প্রাণমন॥
খেলিতে এখন আর হরিণীর সনে।
ধায় না কনকবালা দূরতর বনে॥
ফাঁকি দিয়া নলিনীরে খেলিতে পাঠায়।
আপনি একাকী সদা থাকিবারে চায়॥
অশোকের ডালে বসি কপোতকপোতী।
প্রেম-খেলা খেলে সদা আনন্দিত মতি॥
এক মনে শুনে বসি বিহঙ্গিনী-গান।
বুঝিবা হইতে সাধ তাদের সমান॥

কখন আকাশ পানে শূন্যভাবে চায়।
কি এক অভাব ঘুরে খুঁজিয়া না পায় ॥
অস্তাচলে দিনদেব করিলে গমন।
কাতরে নলিনী মুদে কমল নয়ন ॥
নদীর তীরেতে বসি কনক নেহারে।
'দিদিগো এসনা ঘরে' নলিনী ফুকারে ॥
থাকিতে দণ্ডেক দিবা কনক তখন।
নলিনে ডাকিতে বলে ঘরে এস ব'ন ॥
এখন নলিনী খুঁজে কোথায় কনক।
সন্ধ্যা হয়ে গেল তবু না ভাঙ্গে চমক ॥

পরিশিষ্ট · ঘ *

কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়?

গি রি শ চ ন্দ্র ঘো ষ

আমার প্রিয়তমা ছাত্রী—সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর নাম, যাঁহারা আমায় ভালবাসেন, এবং আমার রচিত নাটকাবলী পাঠ করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই সকল মহাত্মাদিগের নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত। "কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়," সে কথা সহজে ও সরল ভাষায় বুঝাইতে হইলে, বিনোদিনীর জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করি। তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকট আমি সম্পূর্ণ ঋণী, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার "চৈতন্যলীলা", "বুদ্ধদেব", "বিল্বমঙ্গল", "নলদময়ন্তী" প্রভৃতি নাটক, যে সর্ব্বসাধারণের নিকট আশাতীত আদর লাভ করিয়াছিল, তাহার আংশিক কারণ, আমার প্রত্যেক নাটকে শ্রীমতী বিনোদিনীর প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ও সেই সেই চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন। অভিনয় করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত, আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া এমন একটি অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, সে সময় অভিনয়—অভিনয় বলিয়া মনে হইত

* অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে দুটি সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩১৭ থেকে আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৭ পর্যন্ত) বিনোদিনীর আত্মকথার প্রথম সূচনা। 'অভিনেত্রীর আত্মকথা' নামে ষ্টার থিয়েটারের সূত্রপাত (বর্তমান সংস্করণের ৩৪ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়। অবশ্য লেখাটি কিঞ্চিৎ বর্জিত ও সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহেই বিনোদিনী এ কার্য্যে ব্রতী হন এবং অসম্পূর্ণ এই রচনাকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে দু-বছর পরে 'আমার কথা' বইটি প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্র 'নাট্যমন্দির' পত্রে বিনোদিনীর ঐ আত্মকথার যে একটি ভূমিকা রচনা করেছিলেন এটি সেই ভূমিকা। বিনোদিনীর জীবনী পাঠ করলেই বড় অভিনেত্রী হওয়ার রহস্যটি জানা যায়—এত বড় কথা নিজের ছাত্রী সম্পর্কে বলতে গিরিশচন্দ্র বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। সম্পাদক।

না, যেন সত্য ঘটনা বলিয়াই অনুভূত হইত। বাস্তবিক সে ছবি এখনও আমার চক্ষের উপর প্রতিফলিত রহিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর অভিনেত্রী হইতে কেমন করিয়া সে অতি উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, কিরূপ সাধনা, কিরূপ প্রাণপণ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া সে সমগ্র বঙ্গবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা জানিবার বিষয় হইতে পারে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ যদিও বহুবার যাবৎ কোনও রঙ্গালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, কিন্তু সে যে সুনাম—যে সুযশ—যে সুখ্যাতি—যে আদর—যে আপ্যায়ন সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আদর্শ অভিনেত্রী বলিয়া সকল অভিনেত্রীর জিহ্বায় আজ পর্য্যন্ত যাহার নাম উচ্চারিত হয়, সুবিখ্যাত "ভারতবাসী" পত্রিকায় রঙ্গালয় সম্বন্ধে যাহার পত্রাবলী ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, বঙ্গ রঙ্গভূমির সে যে একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিল, এবং সে স্তম্ভচ্যুত হইয়া দেশীয় রঙ্গমঞ্চ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি অভাগিনী পীড়িতা হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং জগদীশ্বরের কৃপায় কথঞ্চিৎ রোগমুক্ত হইয়া সে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করে, "সংসারের পান্থশালা হইতে বিদায় লইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। রুগ্ন, আশাশূন্য, দিনযামিনী এক ভাবেই যাইতেছে; কোনরূপ উৎসাহ নাই, নিরাশার জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া অপরিবর্ত্তিত স্রোত চলিতেছে। আপনি আমাকে বার বার বলিয়াছেন, যে ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতে সংসারে আসে, সকলেই তাঁহার কার্য্য করে, আবাব কার্য্য শেষ হইলেই দেহ পবিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আপনার এই কথাগুলি কতবার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু আমার জীবন দিয়া আমি তো বুঝিতে পারিলাম না, যে আমার দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য্য হইয়াছে, আমি কি কার্য্য করিয়াছি, এবং কি কার্য্য করিতেছি? আজীবন যাহা করিলাম, ইহাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? কার্য্যের কি অবসান হইল না?" আমি তাহাকে উত্তর দিই, "তোমার জীবনে অনেক কার্য্য হইয়াছে, তুমি রঙ্গালয় হইতে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছ। অভিনয় স্থলে তোমার অদ্ভুত শক্তির দ্বারা যেরূপ বহু নাটকেব চরিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছ, তাহা সামান্য কার্য্য নয়। আমার "চৈতন্য লীলায়" চৈতন্য সাজিয়া বহু লোকের ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিযাছ ও অনেক বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। সামান্য ভাগ্যে কেহ এরূপ কার্য্যের অধিকারী হয় না। যে সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া তুমি প্রস্ফুটিত করিয়াছিলে. সে সকল চরিত্র গভীর ধ্যান ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না। যদিচ

তাহার ফল অদ্যাবধি দেখিতে পাও নাই, সে তোমার দোষে নয়—অবস্থায় পড়িয়া, কিন্তু তোমার অনুতাপের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে অচিরে সেই ফলের অধিকারী হইবে।" পরিশেষে তাহার চঞ্চল চিত্তকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য, আমি তাহাকে তাহার "নাট্য জীবনী" লিখিতে অনুরোধ করি। বিনোদিনী সে কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছে। নিম্নে তাহার স্বরচিত নাট্য জীবনের প্রয়োজনীয় অংশ সকল মুদ্রিত হইল। অনাবশ্যক বোধে কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেমন করিয়া বড অভিনেত্রী হইতে হয়—তাহা আর আমায় নূতন করিয়া লিখিতে হইবে না। বিনোদিনীর "নাট্য জীবন" উক্ত প্রবন্ধের সম্যক উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

[নাট্যমন্দির, ভাদ্র ১৩১৭।]

পরিশিষ্ট : ঙ*

বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী

গি রি শ চ ন্দ্র ঘো ষ

বঙ্গ-রঙ্গভূমিব কয়েকজন উজ্জ্বল অভিনেতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, কখনও শোকসভায়, কখনও বা সংবাদপত্রে, কখনও বা রঙ্গমঞ্চ হইতে আমার আন্তরিক শোকপ্রকাশের সহিত তাহাদেব কার্য্যদক্ষতা সংক্ষেপে উল্লেখ করি। যখন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখব মুস্তফীর শোকসভা সমাবেশিত হয়, তখন আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ কবি। ষ্টাব থিয়েটাবেব সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, তিনিও তাঁহার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং সেই শোকসভার অব্যবহিত পরেই তিনি আমায় একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন, যাহাতে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ বর্ণিত থাকে। অমৃতবাবু মনে করেন, আমার দ্বারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইলে এবং কোন্ সময়ে কি অবস্থায় তাহারা কার্য্য করিয়াছে, তাহা বিবৃত থাকিলে, এক প্রকাব বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিবে। এ পুস্তকে জীবিত ও মৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিষয় যাহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়, ইহাই অমৃতবাবুর অনুরোধ। কিন্তু সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহস করি নাই। আমার যাহারা ছাত্র এবং যাহাদের সহিত একত্র কার্য্য করিয়াছি, তাহাদের বিষয়ও লিখিতে গেলে হয়তো একজনের প্রশংসায় অপরের মনে আঘাত লাগিতে পারে, হয়তো বহুদিনের কথা স্মৃতির ভ্রমে, স্বরূপ বর্ণিত হইবে না। তার পর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বর্ত্তমান অবস্থা সমাজের চক্ষে এরূপ উন্নত নয় যে, এক নাট্যামোদী পাঠক ব্যতীত অপর সাধারণের নিকট তাহার মূল্য থাকিবে। আর এক বাধা এই যে, তাহাদের নাট্যজীবনের সহিত আমার নাট্য-

* বিনোদিনীর 'আমার কথা' গ্রন্থের ভূমিকারূপে গিরিশচন্দ্র এটি বচনা করেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে রচনাটি প্রকাশিত হয় না—গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় (নব) সংস্করণে (১৩২০) বিনোদিনী ভূমিকাটি প্রকাশ করেন। এর বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান সংস্করণের 'অধীনার নিবেদন' অংশে আছে। সম্পাদক।

জীবন এরূপ বিজড়িত যে, অনেক স্থলে আমার আপনার কথাই বলিতে বাধ্য হইব। এ বাধা বড সাধারণ বাধা নহে। পৃথিবীতে যত প্রকার কঠিন কার্য্য আছে, তন্মধ্যে আপনার কথা আপনি বলিতে যাওয়া কঠিন কার্য্য। অনেক সময়ে প্রকৃত দীনতাও ভাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, স্বরূপ বর্ণনায় অতিরঞ্জিত জ্ঞান হয়; আর সমস্তটাই আত্মম্ভরিতার পরিচয়—এইরূপ পাঠকের মনে ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। এরূপ হইবার কারণ বিস্তর। অনেক সময় আপনি আপনার দোষ দেখা যায় না এবং আত্মদোষ বর্ণনাও অনেক সময়ে উকীলের বিচারপতির সম্মুখে নিজ মক্কেলের দোষ স্বীকারের ন্যায় ওকালতী ভাবেই হইয়া থাকে। তাহার পর ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র আন্দোলনে ফল কি? এই সকল চিন্তায় এ পর্য্যন্ত বিরত আছি, কিন্তু অমৃতবাবুও সময়ে সময়ে আসিয়া অনুরোধ করিতে ক্রটি করেন না।

এক্ষণে ভূতপূর্ব প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী তাহার নিজ জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাকে দেখাইয়া একটি ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করে। যাঁহারা থিয়েটাবে "চৈতন্য লীলা"র নাম শুনিয়াছেন, তিনিই বিনোদিনীব নাম জানেন। "চৈতন্যলীলা" যে কেবলমাত্র নাট্যামোদীরা জানেন, এরূপ নয়, একটি বিশেষ কারণে "চৈতন্যলীলা" অনেক সাধু সঙ্গের নিকটও পরিচিত। পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রঙ্গালয়ের পতিতগণকে তাঁহার মুক্তিপ্রদ পদধূলি প্রদানার্থ "চৈতন্যলীলা" দর্শনচ্ছলে পদার্পণে রঙ্গালয়কে পবিত্র করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যলীলায় বিনোদিনী 'চৈতন্যের' ভূমিকা গ্রহণ করে।

বহুপূর্ব্বে আমি বিনোদিনীকে বলিয়াছিলাম যে, যদি তোমার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করো, এবং সেই সকল ঘটনা আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের পথ মার্জ্জিত করিতে পারো, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে। এই কথার উল্লেখ করিয়া এক রকম আমার উপর দাবী রাখিয়া বিনোদিনী তাহার জীবন-আখ্যায়িকার একটি ভূমিকা লিখিতে বলে। আমি নানা কারণে ইতঃস্তত করিয়াছিলাম, আমি বিনোদিনীকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, অবশ্য তুমি ইহা তোমার পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য ভূমিকা লিখিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? তুমি লিখিয়াছ যে, তোমার হৃদয়ব্যথা প্রকাশ করা—তোমার মন্তব্য। কিন্তু তুমি সংসারে ব্যথার ব্যথী কাহাকে পাইলে যে, হৃদয়ব্যথা জানাইতে ব্যাকুল হইয়াছ? আত্মজীবনী লেখা যেরূপ কঠিন আমার ধারণা, তাহাও বুঝাইলাম,—আত্মজীবনী লিখিতে অনেককে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, তাহাও বুঝাইলাম। জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক ডিকেন্স গল্পচ্ছলে

আপনার নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। অনেকে বন্ধুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে, কেহ বা পুত্রের প্রতি লিপির ছলে আত্মজীবনী প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, অতি উচ্চ ব্যক্তি প্রভৃতিও নিজ জীবনী লিখিতে ব্যঙ্গের ভয় করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনীতে আমি যে ভূমিকা লিখিব, তৎ-সম্বন্ধে সাধারণকে কি কৈফিয়ৎ দিব? আমিও কৈফিয়তের ভয়ে লিখিতে চাহি না, বিনোদিনীও ছাড়িবে না। কিন্তু সহসা আমার মনে উদয় হইল যে, এই সামান্য বনিতার ক্ষুদ্র জীবনে যে মহান্ শিক্ষাপ্রদ উপাদান রহিয়াছে! লোকে পরস্পর বলাবলি করে,—এ হীন—ও ঘৃণিত, কিন্তু পতিতপাবন ঘৃণা না করিয়া পতিতকে শ্রীচরণে স্থান দেন। বিনোদিনীর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অনেকে আজীবন তপস্যা করিযা যে মহাফল লাভে অসমর্থ হন, সেই চতুর্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছে। এই চরণ-মাহাত্ম্য যাঁহার হৃদয়ে আংশিক স্পর্শ করিয়াছে, তিনিই বিভোল হইয়া ভাবিলেন যে, ভগবান্ অতি হীন অবস্থাগত ব্যক্তিরও সঙ্গে থাকিয়া সুযোগপ্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এরূপ পাপী-তাপী সংসারে কেহই নাই, যাহাকে দয়াময় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনী যদি সমাজকে এ শিক্ষা প্রদান করে, তাহা হইলে বিনোদিনীর জীবন বিফল নয়। এ জীবনী পাঠে ধর্ম্মাভিমানীর দম্ভ খর্ব্ব হইবে, চরিত্রাভিমানী দীনভাব গ্রহণ করিবে এবং পাপী-তাপী আশ্বাসিত হইবে।

যাহারা বিনোদিনীর ন্যায় অভাগিনী, কুৎসিত পন্থা ভিন্ন যাহাদের জীবনোপায় নাই, মধুর বাক্যে যাহাদিগকে ব্যভিচারীরা প্রলোভিত করিতেছে, তাহারাও মনে মনে আশ্বাসিত হইবে যে, যদি বিনোদিনীর মত কায়মনে রঙ্গালয়কে আশ্রয় করি, তাহা হইলে এই ঘৃণিত জন্ম জন-সমাজের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে পারিব। যাহারা অভিনেত্রী, তাহারা বুঝিবে—কিরূপ মনোনিবেশের সহিত নিজ ভূমিকার প্রতি যত্ন করিলে জনসমাজে প্রশংসাভাজন হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি দোষ হইয়া থাকে, অনেক দোষেই মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতেও মার্জ্জনা পাইব—ভরসা করি।

বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী একস্রোতে লিপিবদ্ধ হইলে, উত্তম হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া অবস্থাভেদে সময়ভেদে লেখা হইয়াছে, তাহা পড়িবামাত্র বোঝা যায়। বিনোদিনী মনের কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়া সহানুভূতি চাহিয়াছে, কিন্তু দেখা যায়, কোথাও কোথাও সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। যে যে ভূমিকা

বিনোদিনী অভিনয় করিয়াছিল, প্রতি অভিনয়ই সুন্দর, কিরূপে তাহা অভ্যাস করিয়াছে, তাহাও বর্ণিত আছে,—কিন্তু সে বর্ণনা অনেকটা কবিতা। কিরূপ চেষ্টায় কিরূপ কার্য্য হইয়াছে, কিরূপ কঠোর অভ্যাসের প্রয়োজন, কিরূপ কণ্ঠস্বর ও হাব-ভাবের প্রতি আধিপত্য আবশ্যক—এ সকল শিক্ষাপযোগীরূপে বর্ণিত না হইয়া আপনার কথাই বলা হইয়াছে। যে অবস্থা গোপন রাখা আত্মজীবনী লেখার কৌশল, সে কৌশল ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমি তাহার প্রধান প্রধান ভূমিকাভিনয়ে, যতদূর স্মরণ আছে, সে চিত্র পাঠককে দিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিনোদিনী যথার্থ বলিয়াছে যে, তাহার ভূমিকা উপযোগী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইবার বিশেষ কৌশল ছিল। একটি দৃষ্টান্তে তাহার কতক প্রকাশ পাইবে। বুদ্ধদেবের অভিনয়ে বিনোদিনী গোপার ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিন ভক্ত-চূড়ামণি স্বর্গীয় বলরাম বসু "বুদ্ধদেব" দেখিতে যান। তিনি এক অঙ্ক দর্শনের পর সহসা সজ্জাগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা না করিয়া, কন্সার্টের সময়, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাইলাম। তিনি এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কন্সার্ট বাজিতে বাজিতেই ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর গোপাকে প্রথমে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী থিয়েটারওয়ালারা কোথায় পাইল? তিনি সেই সুন্দরীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সাজঘরে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রঙ্গমঞ্চে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেরূপ সুন্দরী নয় সত্য, কিন্তু সুন্দরী বটে। তৎপরে একদিন অসজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া, সেই স্ত্রীলোক যে 'গোপা' সাজিয়াছিল, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সাজসজ্জার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। সজ্জিত হইতে শেখা অভিনয়কার্য্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিল। বিনোদিনী ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়, সজ্জা দ্বারা আপনাকে এরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত যে, তাহাকে এক ভূমিকায় দেখিয়া অপর ভূমিকায় যে সেই আসিয়াছে, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিতেন না। সাজসজ্জার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে অনেক সময়ে অভিনেতার হৃদয়ে নিজ ভূমিকার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। দর্পণ অভিনেতার সামান্য শিক্ষক নয়। সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যিনি ভূমিকা (part) অভ্যাস করেন, তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। কিন্তু এরূপ অভ্যাস করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষাজনিত ভাবভঙ্গী স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর ন্যায় অভ্যস্ত করা

এবং স্বেচ্ছায় তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ—শ্রম ও চিন্তা-সাধ্য। এ শ্রম ও চিন্তা-ব্যয়ে বিনোদিনী কখন কুণ্ঠিত ছিল না। বিনোদিনীর স্মরণ নাই, মেঘনাদের সাতটি ভূমিকা বিনোদিনীকে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করিতে হয়, বেঙ্গল থিয়েটারে নয়। যাহা হউক, সাতটি ভূমিকাই অতি সুন্দর হইয়াছিল। সাতটি ভূমিকা এক জনের দ্বারা অভিনীত হওয়া কঠিন ; দুইটি বৈষম্যপুর্ণ ভূমিকা এক নাটকে অভিনয় করা সাধারণ নাট্যশক্তির বিকাশ নয়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা এক ভূমিকায় চরমোৎকর্ষ লাভ করা বিশেষ নাট্যশক্তির কার্য্য। চরমোৎকর্ষ লাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকার কিরূপ অবয়ব হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে কি কি পারিচ্ছদিক পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকা-কল্পিত আকার গঠিত হইবে, তাহা মনঃক্ষেত্রে চিত্রকরের ন্যায় সেই আভাস আনা প্রয়োজন। অভিনয়কালীন ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী হইবে এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসঙ্গত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিবে, কি আপনার কথা কহিতে, কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনিতে, সেইক্ষণেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইবে। এ সমস্ত লক্ষ্য রাখিতে পারেন, এরূপ দর্শক বিনোদিনীর সময় বিস্তর আসিতেন , এবং সে সময়ে অভিনয় সম্বন্ধে অতি তীব্র সমালোচনা হইত। যথা—পলাশীর যুদ্ধ দেখিয়া সাধারণীতে সমালোচন,—"ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতারা সকলে সুপাঠক , যিনি ক্লাইভের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্গভঙ্গীও জানেন।" এইটুকু এক প্রকার সুখ্যাতি ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার পর সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী সঞ্চালন যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌলা যেরূপ পলাশী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা সিরাজদ্দৌলা সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই।" কিন্তু তাৎকালিক সমালোচক যেরূপ কঠোরতার সহিত নিন্দা করিতেন, অতি উচ্চ প্রশংসা দানেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল সমালোচকশ্রেণী তাৎকালিক বঙ্গীয় সাহিত্যজগতের চালক ছিলেন। বহু ভূমিকায় বিনোদিনী ঐ সকল সমালোচকের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচয়। সতীর মুখে একটি কথা আছে, "বিয়ে কি মা ?"—এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যোগ-কথা কহিবে, এইরূপবয়স্কা স্ত্রীলোকের

মুখে "বিয়ে কি মা ?" শুনিলে ন্যাকাম মনে হয়। সাজসজ্জায় হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে, অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যান-মগ্ন বালিকা সংসার-জ্ঞান-শূন্য অবস্থায় মাতাকে "বিয়ে কি মা ?" প্রশ্ন করিয়াছে। পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত অতি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কহ, নাথ !
কি হেতু কহিলে—
'ধন্য, ধন্য কলিযুগ' ?
ক্ষুদ্র নর অন্নগত প্রাণ,
রিপুর অধীন সবে ;
রোগশোক সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানব মণ্ডল
ভীম ভবার্ণব মাঝে ;—
কেন কহ বিশ্বনাথ,—ধন্য কলিযুগ ?"

যোগিনীবেশে যোগীশ্বরের পার্শ্বে জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন,—ইহা বিনোদিনীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হইত। তেজস্বিনীর মহাদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান,—

"শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর ;
প্রজারক্ষা কেমনে গো হবে ?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর ?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ওমা, পতি নিন্দা কেন সব ?"

এ কথায় যেন সতীত্বের দীপ্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ; অথচ দৃঢ়বাক্যে পুজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতি নিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।

"বুদ্ধদেব" নাটকে পতিবিরহ-ব্যাকুলা গোপার ছন্দকের নিকট

"দাও, দাও ছন্দক আমায়,
পতির বসনভূষা মম অধিকার !

স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পুজিব বিরলে"

বলিয়া পতির পরিচ্ছদ যাজ্রা একপ্রকার অতুলনীয় হইত। সে অর্দ্ধোন্মাদিনী বেশ — আগ্রহের সহিত স্বামীর পরিচ্ছদ হৃদয়ে স্থাপন এখনও আমার চক্ষে জাগরিত। যাহাকে পুর্ব্বাঙ্কে অপ্সরীনিন্দিত সুন্দরী দেখা যাইত, পরিচ্ছদ-যাজ্রার সময় তাপশুষ্ক পদ্মের ন্যায় মলিনা বোধ হইত। "Light of Asia"-রচয়িতা Edwin Arnold সাহেব এই গোপার অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার Travels in the East নামক গ্রন্থে বঙ্গনাট্যশালা অতি প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি রঙ্গালয় দর্শনে বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নত, নচেৎ বুদ্ধদেব চরিত্রেব ন্যায় দার্শনিক অভিনয় স্থিবভাবে হিন্দু দর্শকমণ্ডলী দেখিতেন না। বিদেশীর চক্ষে এইরূপ হিন্দুর হৃদয়ের অবস্থাব পরিচয় দেওয়া রঙ্গালয়ের পক্ষে সামান্য গৌরবেব বিষয় নহে। রঙ্গালয়ের পরম বিদ্বেষী ব্যক্তিকেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বলা হইয়াছে যে, সকল ভূমিকাতেই বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু "চৈতন্যলীলা"য় চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক কবে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুক-চিত্ত-বিনোদন। প্রথমে বাল-গৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকের বাৎসল্যের উদয় হইত। চঞ্চলতায় ভগবানের বাল্য-লীলার আভাস পাইতেন। উপনয়নের সময় রাধাপ্রেম-মাতোয়ারা বিভোর দণ্ডী দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। গৌরাঙ্গমূর্ত্তির ব্যাখ্যা "অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা" — পুরুষ প্রকৃতি এক অঙ্গে জড়িত। এই পুরুষ প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতি-ফলিত হইত। বিনোদিনী যখন "কৃষ্ণ কই — কৃষ্ণ কই?" বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহ বিধুবা বমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তমভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। এই অভিনয় পরমহংসদেব দেখিতে যান। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন, পরমহংসদেব স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন ; পদধূলিলাভে কেহই বঞ্চিত হইল না। সকলেই পতিত, কিন্তু পতিতপাবন যে পতিতকে কৃপা করেন, একথা সে পতিতমণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মিল। তাহাদের মনে তর্ক উঠে নাই, সেই জন্য তাহাদের পতিত জন্ম ধন্য। বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া

শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,—"চৈতন্য হোক।" অনেক পর্ব্বত-গহ্বরবাসী এ আশীর্ব্বাদের প্রার্থী। যে সাধনায় বিনোদিনীর ভাগ্য এরূপ প্রসন্ন হইল, সেই সাধনাই, অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইলে, অভিনেতাকে অবলম্বন করিতে হয়। বিনোদিনীর সাধন—যথাজ্ঞান কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। যে ব্যক্তি যে অবস্থায়ই হোক, এই মহা ছবি ধ্যান করিবে, সেই ব্যক্তি এই ধ্যান প্রভাবে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। অষ্টপ্রহর গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।

গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (serious part) বিনোদিনীর যেরূপ দক্ষতা, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে ফতীর ভূমিকায়, এবং "বিবাহ-বিভ্রাটে" বিলাসিনী কারফর্ম্মার ভূমিকায়, "চোরের উপর বাটপাড়ি"তে গিন্নী, "সধবার একাদশী"তে কাঞ্চন প্রভৃতি হাল্‌কা ভূমিকায়ও বিনোদিনীর অভিনয় অতি সুন্দর হইত। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং, নক্‌সা প্রভৃতিতে সে সময় বিনোদিনীই নায়িকা ছিল। প্রত্যেক নায়িকাই অন্য নায়িকা হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রশংসনীয় হইত। এক্ষণে যাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখিতে যান, তাঁহাদের ধারণা যে, মতিবিবির অংশই নায়িকার অংশ। কিন্তু যাঁহারা বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ধারণা যে, কপালকুণ্ডলার নায়িকা কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি নয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এই যে, বাল্যাবধি স্নেহপালিত না হওয়ায়, নবকুমারের বহু যত্নেও হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় নাই। অবশ্য অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় গৃহকার্য্য করিত, কিন্তু যখন তাহার ননদিনীর স্বামী বশ করিবার ঔষধের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল, তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী যেরূপ পিঞ্জরমুক্তা হইয়া বনে প্রবেশ মাত্র বন্যবিহঙ্গিনী হইয়া যায়, সেইরূপ গৃহবদ্ধা কপালকুণ্ডলা-অংশ-অভিনয়কারিণী বিনোদিনী বনপ্রবেশ মাত্রেই পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া বন্য কপালকুণ্ডলা হইয়া যাইল—এই পরিবর্ত্তন বিনোদিনীর অভিনয়ে অতি সুন্দররূপ প্রস্ফুটিত হইত। তখন কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাই নায়িকা ছিল। এখন হীরার ফুলের অভিনয়েও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে অভিনয় দর্শনে দর্শকের ধারণা হয় যে, রতি হীরার ফুল গীতিনাট্যের নায়িকা ; কিন্তু যিনি 'হীরার ফুলে' বিনোদিনীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার ধারণা যে 'হীরার ফুলে' গ্রন্থকার-রচিত নায়িকাই নায়িকা, রতি নায়িকা নয়। অনেক সময়েই আমি বিনোদিনীর সহযোগী অভিনেতা ছিলাম। "মৃণালিনীতে"তে আমি পশুপতি সাজিতাম, বিনোদ মনোরমা সাজিত। অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা নায়ক-

নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছি, সমস্ত বলিতে গেলে অনেক কথা, প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়, কেবল 'মনোরমা'র কথাই বলিব। মনোরমার কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, আমি প্রতি অভিনয়েই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবুবর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী আবার পরক্ষণেই "পশুপতি, তুমি কাঁদ্ছ কেন?" বলিয়াই প্রেমবিহ্বলা বালিকা। হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগ্নী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই "পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়া" অসাধারণ অভিনয়- চাতুর্য্যে প্রদর্শিত হইত। বেঙ্গল থিয়েটারে আসিয়া বঙ্কিমবাবু কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না, কিন্তু যিনি মনোরমার অভিনয় দেখিতেন, তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে যে, এ প্রকৃত 'মৃণালিনী'র মনোরমা। বালিকাভাব দেখিয়া এক ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছিল, বুঝি বালিকা অভিনয় করিতেছে। অভিনয় কৌশলে বিনোদিনীর এই উভয় ভাবের পরিবর্ত্তন, উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীব সকল ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত – যুবক যুবতী, বালক বালিকা, রাজরাণী হইতে ক্ষতী পর্য্যন্ত সকল ভূমিকার উপযুক্ত। বঙ্গরঙ্গভূমির যদি অনুরূপ অবস্থা হইত, তাহা হইলে বিনোদিনীর অভিনয়-জীবনের আত্মবর্ণনা অনাদৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু এ কথা বলিতে সাহস করা যায়, যদি বঙ্গরঙ্গালয় স্থায়ী হয়, বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী আগ্রহের সহিত অন্বেষিত ও পঠিত হইবে।

বিনোদিনী আপনার শৈশব-অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে। সে সমস্ত আমি অবগত নই। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ চাঁদনীর উপর আমার সহিত তাহার প্রথম দেখা। তখন বিনোদিনী বালিকা। বিনোদিনী সত্য বলিয়াছে, সে সময় তাহাকে নায়িকা সাজাইতে সজ্জাকরকে যাত্রার দলের ছোক্‌রা সাজাইবার প্রথা অবলম্বন করিতে হইত। কিন্তু সে সময় তাহার শিক্ষাগ্রহণের ঔৎসুক্য ও তীব্র মেধা দেখিয়া, ভবিষ্যতে যে বিনোদ রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেত্রী হইবে, তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আমিও কিছুদিন থিয়েটার ছাড়িয়াছিলাম, বিনোদিনীও সেই সময় বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে বাধ্য হইয়া যখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নারী অভিনেত্রী লইয়া, ৺মদনমোহন বর্ম্মণের কৃতিত্বে জাঁকজমকের সহিত "সতী কি কলঙ্কিনী?" অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়, তখন আমার সহিত থিয়েটারের কোন সম্বন্ধ ছিল না। থিয়েটারের নানাদেশ ভ্রমণবৃত্তান্ত যাহা বিনোদিনী বর্ণনা করিয়াছে, তাহা আমি নিজে কিছু জানি না। পরে যখন ৺কেদারনাথ চৌধুরীর

সহিত একত্র হইয়া থিয়েটার আরম্ভ করি, সেই অবধি বিনোদিনীর থিয়েটারে অবসর লওয়া পর্য্যন্ত আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনোদিনীর অনেক কথাই অবগত আছি। বিনোদিনী হয়তো কেদারবাবু বা অন্য কাহারও নিকট শুনিয়া থাকিবে যে, আমি শরৎবাবুর নিকট হইতে বিনোদিনীকে যাজ্ঞা করিয়া লইয়াছি। বিনোদিনীর প্রশংসার জন্য এ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বিনোদিনী আমাদের থিয়েটারে আসার পর এক মাসের বেতন যাহা বেঙ্গল থিয়েটারে বাকী ছিল, তাহা বহুবার তাগাদা করিয়াও বিনোদিনীর মাতা প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার হইতে চলিয়া আসায় তখনকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিনোদিনীর উপর ক্রুদ্ধই হইয়াছিল। ইহার পর আমাদের থিয়েটার একস্রোতে চলে নাই, মাঝে মাঝে হইয়াছে ও আবার বন্ধ হইয়াছে। ৺প্রতাপচাঁদ জহুরীর থিয়েটারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণের পর হইতে আমি থিয়েটারে প্রথম বেতনভোগী হইয়া যোগদান করি এবং সেই সময় হইতে বিনোদিনী আমার নিকট বিশেষরূপে শিক্ষিতা হয়। বিনোদিনী তাহার জীবনীতে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষের প্রতি তাহার শিক্ষক বলিয়া গাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, আমারও শিক্ষাদানের কথা অতি সম্মানের সহিত আছে , কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে, বঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক।

উল্লেখ করিয়াছি, সমাজের প্রতি বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষ আছে। বিনোদিনীর নিকট শুনিয়াছি, তাহার একটি কন্যাসন্তান হয়, সেই কন্যাটিকে শিক্ষাদান করিবে, বিনোদিনীর বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কন্যা নীচকুলোদ্ভবা—এই আপত্তিতে কোন বিদ্যালয়ে গৃহীত হয় নাই। যাহাদিগকে বিনোদিনী বন্ধু বলিয়া জানিত, কন্যার শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু তাহারা সাহায্য না করিয়া বরং সে কন্যার বিদ্যালয়-প্রবেশের বাধা প্রদান করিয়াছিল—শুনিতে পাই। এই বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষের কারণ। কিন্তু নিজ জীবনীতে উক্তরূপ কঠোর লেখনীচালন না হইলেই ভাল ছিল। যে পাঠক এই জীবনী পাঠ করিবেন, শেষোক্ত লেখনীর কঠোরতায়, প্রারম্ভে যে সহানুভূতি প্রার্থনা আছে, তাহা ভুলিয়া যাইবে।

এই ক্ষুদ্র জীবনীতে অনেক স্থলে রচনাচাতুর্য্য ও ভাবমাধুর্য্যের পরিচয় আছে। সাধারণের নিকট কিরূপ গৃহীত হইবে—জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিপথে অনেক ঘটনাবলী হর্ষশোকবিজড়িত হইয়া বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় উদয় হইয়াছিল।

উপসংহারে আমার সাধারণের নিকট নিবেদন যে, যিনি বঙ্গরঙ্গালয়ের

আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ জানিতে চাহেন, তিনি সে সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন ও ইচ্ছা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনপ্রবাহ সুখদুঃখে জড়িত হইয়া সাধারণের কৃপাপ্রার্থনায় অতিবাহিত হয় এবং সাধারণের আনন্দের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, এই সর্ত্তে সাধারণকে তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র দুই একটি কথা শুনাইবার দাবি রাখে। যে সহৃদয় ব্যক্তি এ দাবী স্বীকার করিবেন, তিনি এ ক্ষুদ্র কাহিনীপাঠে কৃপাপ্রার্থিনী অভিনেত্রীর নাট্যজীবন বর্ণনার প্রথম উদ্যম কৃপাচক্ষে দৃষ্টি করিবেন।

পরিশিষ্ট : চ *

বিনোদিনীর অভিনয়

ক. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

[৬ বিডন স্ট্রীট – বর্তমান মিনার্ভার জমি]

১৮৭৪	
১. শত্রুসংহার – ২ বা ১২ ডিসেম্বর	দ্রৌপদীর সখী
১৮৭৫	
২. হেমলতা – ৬ মার্চ	হেমলতা
পশ্চিমে ভ্রমণ (মার্চ-মে)	
৩. নবীন তপস্বিনী – লাহোর, মার্চ-এপ্রিল	কামিনী
৪. সধবার একাদশী – " "	কাঞ্চন
৫. বিয়ে পাগলা বুড়ো – " "	রতা (?)
৬. সতী কি কলঙ্কিনী ? – "	রাধিকা
৭. লীলাবতী – লক্ষ্ণৌ, মে	লীলাবতী
৮. নীলদর্পণ - " "	সরলতা
প্রত্যাবর্তনের পর	
নীলদর্পণ – ২১ আগস্ট	(পূর্ববৎ)
৯. সরোজিনী – ২৬ ডিসেম্বর বা ১৫ জানু '৭৬	সরোজিনী
১৮৭৬	
১০. প্রকৃত বন্ধু – ৮ জানুয়ারি	বনবালা

* বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবন মাত্র ১২ বছর (১৮৭৪ ডিসেম্বর – ১৮৮৬ ডিসেম্বর)। এই সময়ের মধ্যে তিনি চারটি রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন : ক. গ্রেট ন্যাশনাল (১৮৭৪ ডিসেম্বর – ১৮৭৬ ডিসেম্বর), খ. বেঙ্গল (১৮৭৬ ডিসেম্বর – ১৮৭৭ জুলাই), গ. ন্যাশনাল (১৮৭৭ জুলাই – ১৮৮৩ জুলাই); এবং ঘ. ষ্টার (১৮৮৩ জুলাই – ১৮৮৬ ডিসেম্বর)। উক্ত রঙ্গালয়গুলি নানা হস্তান্তর ও

খ. বেঙ্গল থিয়েটার

[৯/৩ বিডন স্ট্রীট – বর্তমান ডাকঘরের জমি]

১৮৭৭

১১. দুর্গেশনন্দিনী – ১২ এপ্রিল	আয়েষা, তিলোত্তমা, আসমানি
সতী কি কলঙ্কিনী ? – ১৬ এপ্রিল	(পূর্ববৎ)
১২. কপালকুণ্ডলা – ১৮ এপ্রিল	কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি
১৩. মৃণালিনী – ২৮ এপ্রিল	মনোরমা
১৪. মেঘনাদ বধ – ৯ মে	প্রমীলা

উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে চলেছিল। কখনো কখনো সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণও করতে হতো। এই তালিকায় বিনোদিনী-অভিনীত নাটকের ও চরিত্রের নাম দেওয়া হল ; সেই সঙ্গে অভিনয়ের তারিখও। অবশ্য এ সব তারিখ সকলেই সাময়িকপত্র থেকে গ্রহণ ক'রে থাকেন। কিন্তু সব অভিনয়ের কথা নিশ্চয়ই সাময়িকপত্রে প্রকাশের কারণ ছিল না। এই তারিখগুলিতে মোটামুটি প্রথম অভিনয়ের কথাই সূচিত হচ্ছে। এ সব নাটকের অভিনয় যে আরো অনেকবার হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। একটি রঙ্গালয়ে অভিনীত একটি নাটকের নাম তালিকায় একবারই উল্লিখিত হয়েছে। ডানপাশে অভিনীত চরিত্রের একাধিক নাম থাকলে বুঝতে হবে বিনোদিনী কখনো একসঙ্গেই ঐ অভিনয়গুলি একই নাটকে করেছেন, কখনো আবার ঐগুলির কোনো একটি করেছেন। দেখা যাচ্ছে বিনোদিনী প্রায় ৫০টি নাটকে ৬০টির অধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই তালিকার পরিশেষে 'সংযোজন' অংশে ও (?)-চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলিতে সুনির্দিষ্ট তথ্যের সন্ধান পাই নি। গ্রেট ন্যাশনালের পশ্চিমে ভ্রমণ-কালীন এবং বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় সম্পর্কে সাময়িকপত্রের সহায়তায় কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তালিকাটি নানাদিকে অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য, উপযুক্ত তথ্যের অভাবই তার কারণ। এ ক্ষেত্রে প্রধানত নির্ভর করেছি বিনোদিনীর নিজের রচনা ছাড়া অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' (১৩৩৪), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (৩য় সং, ১৩৫৩), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' ২ খণ্ড (১৯৪৫, ১৯৪৭) এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার উপর। শেষোক্ত পত্রিকাটির জন্য শ্রীশিশির বসুর শ্রম কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করি। সম্পাদক।

গ. ন্যাশনাল থিয়েটার

[৬ বিডন স্ট্রীট – বর্তমান মিনার্ভার জমি]

১৮৭৭

১৫. আগমনী – ৬ অক্টোবর	উমা
মেঘনাদ বধ – ১ ডিসেম্বর	প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা, রতি, বারুণী. মায়া, সীতা ও মহামায়া

১৮৭৮

১৬. পলাশীর যুদ্ধ – ৫ জানুয়ারি	ব্রিটেনিয়া
১৭. দোললীলা – ৪ মার্চ	নায়িকা
১৮. বিষবৃক্ষ – ৯ মার্চ	কুন্দনন্দিনী
দুর্গেশনন্দিনী – ২২ জুন	(পূর্ববৎ)

১৮৮১

১৯. হামির – ১ জানুয়ারি	লীলা
২০. মায়াতরু – ২২ জানুয়ারি	ফুলহাসি
২১. মোহিনী প্রতিমা – ১৬ এপ্রিল	সাহানা
২২. আলাদিন – ”	বাদসাহ্-কন্যা, পরী
২৩. আনন্দ রহো – ২১ মে	লহনা
২৪. রাবণ বধ – ৩০ জুলাই	সীতা
২৫. সীতার বনবাস – ১৭ সেপ্টেম্বর	লব, উর্মিলা
২৬. অভিমন্যু বধ – ২৬ নভেম্বর	উত্তরা
২৭. লক্ষ্মণ বর্জন – ৩১ ডিসেম্বর	লব

১৮৮২

২৮. রামের বনবাস – ১৫ এপ্রিল	কৈকেয়ী
২৯. সীতা হরণ – ২২ জুলাই	সীতা
৩০. মাধবীকঙ্কণ – ডিসেম্বর	হেমলতা

১৮৮৩

৩১. পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস – ৩ ফেব্রুয়ারি	দ্রৌপদী

ঘ. ষ্টার থিয়েটার

[৬৮ বিডন ষ্ট্রীট – বর্তমানে বিলুপ্ত]

স্বত্বাধিকারী : গুর্মুখ রায়

১৮৮৩

৩২. দক্ষযজ্ঞ – ২১ জুলাই	সতী
৩৩. ধ্রুবচরিত্র – ১১ আগস্ট	সুরুচি
৩৪. নলদময়ন্তী – ১৫ ডিসেম্বর	দময়ন্তী

১৮৮৪

স্বত্বাধিকারী : অমৃত মিত্র, অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু, দাশু নিয়োগী

৩৫. কমলে কামিনী – ২৯ মার্চ	খুল্লনা, চণ্ডী
৩৬. বৃষকেতু – ২৬ এপ্রিল	পদ্মাবতী
৩৭. হীরার ফুল – „	শশীকলা
৩৮. শ্রীবৎস-চিন্তা – ৭ জুন	চিন্তা
৩৯. চৈতন্যলীলা – ২ আগস্ট	চৈতন্য
৪০. প্রহ্লাদ চরিত্র – ২২ নভেম্বর	প্রহ্লাদ
৪১. বিবাহ বিভ্রাট – „ (?)	বিলাসিনী কারফরমা

১৮৮৫

৪২. নিমাই সন্ন্যাস (বা চৈতন্যলীলা ২য় খণ্ড) – ১০ জানুয়ারি	নিমাই
৪৩. প্রভাস যজ্ঞ – ৯ মে	সত্যভামা
৪৪. বুদ্ধদেব চরিত – ১৯ সেপ্টেম্বর	গোপা

১৮৮৬

৪৫. বিল্বমঙ্গল ঠাকুর – ১২ জুন	চিন্তামণি
৪৬. বেল্লিক বাজার – ২৫ ডিসেম্বর	রঙ্গিনী (শেষ অভিনয়)

॥ সংযোজন ॥

চোরের উপর বাটপাড়ি	গিন্নি

কিঞ্চিৎ জলযোগ	(?)
মুস্তফি সাহেব কা পাক্কা তামাসা	মুস্তফির স্ত্রী
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	ফতি
শরৎ-সরোজিনী	সরোজিনী
আদর্শ সতী	(?)
কনক কানন (?)	(?)
আনন্দলীলা (?)	(?)

প রি শি ষ্ট : ছ *

বিনোদিনীর রচনাবলি

১. 'ভারতবাসী' পত্রিকায় রঙ্গালয় বিষয়ক ধারাবাহিক পত্রাবলি। ১২৯২ সাল, ইং ১৮৮৫ খ্রী।

২. 'সৌরভ' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি কবিতা। ১৩০২ সাল। প্রথম সংখ্যায় 'হৃদয়রত্ন' (দ্র. বর্তমান সংস্করণ, পৃ ১২৩), দ্বিতীয় সংখ্যায় 'অবসাদ' এবং তৃতীয় সংখ্যায় ২০ পৃষ্ঠা দীর্ঘ কাহিনীকাব্য 'আভা'। কবিতাগুলি পরে 'বাসনা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত।

---

* এখন পর্যন্ত যতটা সন্ধান পাওয়া গেছে তার বিবরণ দেওয়া হল। 'ভারতবাসী' পত্রিকাটি কোথাও পাই নি। পত্রিকাটির পরিচয় : 'ভারতবাসী' (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯২ সাল, ইং ১৮৮৫ খ্রী। কলিকাতা পি. এম. সুর কোম্পানীর যন্ত্রে প্রকাশিত। সম্পাদক : হরিদাস গড়গড়ী ॥ সৌভাগ্যবশত 'সৌরভ' মাসিকপত্রটি আমরা দেখেছি শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে। পত্রিকাটির পরিচয় : 'সৌরভ' (মাসিক পত্রিকা)। শ্রাবণ, ১৩০২ থেকে মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশের স্থান : ২/৭ নং শোভাবাজার রাজবাটী ॥ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিনোদিনী ছাড়া অভিনেত্রী তারাসুন্দরী দাসীর দুটি কবিতাও ('প্রবাহের রূপান্তর' ও 'কুসুম ও ভ্রমর') এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর কবিতা প্রকাশ উপলক্ষে গিরিশচন্দ্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ : "সভ্য সমাজে আমার স্থান আছে কিনা, জানি না, জানিতেও চাহি না, কারণ যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে, রঙ্গভূমির উন্নতি উদ্দেশ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া, জনসাধারণের উপেক্ষার পাত্র হইয়া আছি ; সে যাহা হউক, অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে, আমার পুত্রকন্যার মত সন্দেহ নাই ! তাহাদের গুণগ্রাম, অপ্রকাশিত থাকে, আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত কবিতা দুইটী পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।" উল্লিখিত কবিতা দুটি ছিল 'হৃদয়রত্ন' (বিনোদিনী) ও 'প্রবাহের রূপান্তর' (তারাসুন্দরী)। সম্পাদক।

৩. 'বাসনা'। "শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রণীত।" ৪১টি কবিতার সংকলন। কলিকাতা ১৩০৩ সাল। মোট ৮৪ পৃ। মূল্য ॥০। উৎসর্গ নিজ জননীকে।

৪. 'কনক ও নলিনী'। "ন্যাসানাল ও ষ্টার থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রণীত।" কাহিনীকাব্য বা কাব্যোপন্যাস। কলিকাতা ১৩১২ সাল। মোট ৪৫ পৃ। মূল্য ।০। উৎসর্গ: "আমার স্বর্গগতা ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলা দাসীর উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তক অর্পিত হইল।" দ্র. বর্তমান সংস্করণ, পৃ ১৩২-১৩৬।

৫. 'অভিনেত্রীর আত্মকথা'। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় আত্মকথা রচনার সূত্রপাত। ভাদ্র ১৩১৭ ও আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৭। অসম্পূর্ণ। বর্তমান সংস্করণের ৩৪ পৃ পর্যন্ত অংশের সংক্ষেপিত রূপ।

৬. 'আমার কথা'। প্রথম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ, ১৩১৯ সাল। মোট পৃ ॥৴০+১২৪। মূল্য ॥৵০।

৭. 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা'। নব সংস্করণ, ১৩২০ সাল। মোট পৃ ১।৶০+১২৪। মূল্য ॥৵০।

৮. 'আমার অভিনেত্রী জীবন'। 'রূপ ও রঙ্গ' (সম্পাদক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র) সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত স্মৃতিকথা। কোনো কোনো সংখ্যায় রচনাটির নাম 'অভিনেত্রীর আত্মকথা'। ১৩৩১ সালের ৪ঠা মাঘ থেকে (মধ্যে দুই-এক সংখ্যা বাদে) ১৩৩২ সালের ২৬শে বৈশাখ পর্যন্ত মোট ১১টি কিস্তিতে মুদ্রিত। অসম্পূর্ণ। দ্র. বর্তমান সংস্করণ, পৃ ৭৯-১০৯।

প রি শি ষ্ট : জ *

স্থান-কাল-পাত্র

¶ "মহাশয়[১]। বহু দিবস গত হইল, সে বহুদিনের কথা, তখন মহাশয়ের নিকট হইতে এরূপ অজ্ঞাতভাবে জীবন লুক্কায়িত ছিল না[২]। পৃ ১

১. নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

২. নবপর্যায়ে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৮৭৭) সময় থেকে ষ্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রীট) বিলুপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পুর্ব (১৮৮৬) পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর অভিনয়-জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল।

¶ "আমার 'চৈতন্যলীলায়'[৩] চৈতন্য সাজিয়া বহুলোকের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়াছ ও অনেক বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ।" পৃ ২

৩. গিরিশচন্দ্র রচিত ভক্তিমূলক নাটক। বিডন স্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারে ১৮৮৪, ২ আগস্ট প্রথম অভিনীত হয়। 'চৈতন্যলীলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ ১৮৮৬, ১০ আগস্ট।

¶ "অবশেষে উক্ত গঙ্গা বাইজী[৪] ষ্টার থিয়েটারে একজন প্রসিদ্ধা গায়িকা হইয়াছিলেন।" পৃ ১০

৪. সুগায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি ১৮৮৩-তে বিডন স্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের শুরু থেকেই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ষ্টার থিয়েটার হাতিবাগানে উঠে গেলে (১৮৮৮) তিনি সেখানে যোগ দেন। দুই ষ্টারে গঙ্গামণি অভিনীত কয়েকটি ভূমিকা: ভৃগুপত্নী (দক্ষযজ্ঞ – ১৮৮৩), রাজমাতা (নলদময়ন্তী – ১৮৮৩), শচী (নিমাই সন্ন্যাস – ১৮৮৫), পাগলিনী (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর – ১৮৮৬), সোনা (নসীরাম – ১৮৮৮), ঠান্‌দিদি (তরুবালা – ১৮৯০),

---

* এই মূল্যবান অংশটি সংকলন ক'রে দিয়েছেন শ্রীশিশির বসু। এতে বিনোদিনীর আত্মকথার অভ্যন্তরে নাটক, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, রঙ্গালয় ও রঙ্গালয়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থান-কাল সম্পর্কিত যে সব উল্লেখ আছে সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ সংক্ষেপে সংকলিত হয়েছে। সম্পাদক।

পান্নাধাত্রী (বনবীর – ১৮৯২) ও মুরলা (কালাপাহাড – ১৮৯৬)। মুরলার ভূমিকায় এঁর ধ্রুপদ গান বিশেষ প্রশংসিত হয়।

¶ "তখন সবে মাত্র দুইটী থিয়েটার ছিল, একটী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর "ন্যাশনাল থিয়েটার"[৫] দ্বিতীয় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "বেঙ্গল থিয়েটার"[৬]।" পৃ ১১-১২

৫. এখানে বিনোদিনী একটু ভুল করেছেন। তখন ভুবনমোহন নিয়োগীর থিয়েটারের নাম ছিল 'গ্রেট ন্যাশনাল' – 'ন্যাশনাল' নয়। আর এই 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটারেই বিনোদিনীর প্রথম মঞ্চাবতরণ। আজ যেখানে 'মিনার্ভা' থিয়েটার, ১৮৭৩, ৩১ ডিসেম্বর সেখানে ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু প্রমুখের প্রচেষ্টায় 'গ্রেট ন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থায়ী নাট্যশালা। 'গ্রেট ন্যাশনালে'র নাম 'ন্যাশনাল' হয় ১৮৭৭-এর জুলাই মাসে – ভুবনমোহন নিয়োগীর কাছ থেকে তিন বছরের জন্য থিয়েটার বাড়ি লিজ নিয়ে গিরিশচন্দ্র এই নামকরণ করেন।

৬. বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার' এখনকার বিডন স্ট্রীট ডাকঘরের জমিতে ১৮৭৩, ১৬ আগস্ট বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগ হয় প্রথম এইখানে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরামর্শে কর্তৃপক্ষ জগত্তারিণী, এলোকেশী, শ্যামা ও গোলাপ নামে চারিজন স্ত্রীলোককে এই কাজে নিযুক্ত করেন। মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় এবং সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নট, নাট্যকার ও পরিচালক বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪০-১৯০১) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির অবলুপ্তি ঘটে।

¶ "তখন সবে মাত্র চারিজন অভিনেত্রী ন্যাশনাল থিয়েটারে ছিলেন। রাজা[৭], ক্ষেত্রমণি[৮], লক্ষ্মী[৯] ও নারায়ণী[১০]।" পৃ ১২

৭, ৮. 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র দৃষ্টান্তে ১৮৭৪, ১৯ সেপ্টেম্বর যে পাঁচজন অভিনেত্রীকে নিয়ে 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী?' অভিনয় হয় রাজা (রাজকুমারী) ও ক্ষেত্রমণি তাঁদের মধ্যে ছিলেন। 'গ্রেট ন্যাশনালে' রাজকুমারী অভিনীত কয়েকটি ভূমিকা: রাধিকা (সতী কি কলঙ্কিনী? – ১৮৭৪), কবিতা (আনন্দকানন – ১৮৭৪) ও সরোজিনী (শরৎ-সরোজিনী –

১৮৭৫)। 'গ্রেট ন্যাশনালে' ক্ষেত্রমণি অভিনীত কয়েকটি ভূমিকা : বৃন্দা (সতী কি কলঙ্কিনী ?– ১৮৭৪), রানী ঐলবিলা (পুরুবিক্রম– ১৮৭৪) ও অহমিকা (আনন্দকানন– ১৮৭৪)।

৯, ১০. গ্রেট ন্যাশনালের প্রথম দলের পাঁচজন অভিনেত্রীর মধ্যে লক্ষ্মী ও নারায়ণী ছিলেন না। বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনালে যোগদানের অব্যবহিত পূর্বে সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অভিনেতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী দলত্যাগ করেন। সম্ভবত সেই সময়েই লক্ষ্মী ও নারায়ণীকে নিযুক্ত করা হয়। গ্রেট ন্যাশনাল ও ন্যাশনালে লক্ষ্মী অভিনীত কয়েকটি চরিত্র : ক্ষেত্রমণি (নীলদর্পণ– ১৮৭৫), লক্ষ্মীবাঈ (হীরকচূর্ণ নাটক– ১৮৭৫) ও বেগম (পলাশীর যুদ্ধ– ১৮৭৮)। গ্রেট ন্যাশনালে আদুরী (নীলদর্পণ– ১৮৭৫) ও ন্যাশনালে হীরা (বিষবৃক্ষ– ১৮৭৮) নারায়ণীর বিখ্যাত ভূমিকা।

¶ "তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর[১১] মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৺অবিনাশচন্দ্র কর[১২] মহাশয় আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। আর বোধ হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু[১৩] শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু[১৪], মহেন্দ্রবাবু[১৫], অর্দ্ধেন্দুবাবু[১৬] ও গোপালবাবু[১৭], ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব করও[১৮] উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর[১৯] মহাশয়ও উক্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় 'বেণীসংহার'[২০] পুস্তকে একটি ছোট পার্ট দিলেন. সেটি দ্রৌপদীর একটি সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা।" পৃ ১৫

১১. বাংলা থিয়েটারের প্রথম স্টেজ ম্যানেজার। ১৮৫২-তে জন্ম। পিতা– রাধানাথ সুর। ১৮৬৭, ২ নভেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসনে প্রথম স্টেজ ম্যানেজার রূপে যোগদান। ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, কোহিনূর প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের পরিকল্পনা ও নির্মাণের মূলে ছিলেন ধর্মদাস। তাঁর শেষ কৃতিত্ব মিনার্ভার 'শঙ্করাচার্য্য' (১৯১০)। ৫৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু (১৯১০)।

১২. সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম দিনের (৭ ডিসেম্বর, ১৮৭২) অভিনেতাদের

একজন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র রূপায়ণে দক্ষতার পরিচয় দেন। 'নীলদর্পণ' নাটকে রোগ সাহেবের ভূমিকায় প্রথম ও প্রধান অভিনয়। "এই একটি পার্ট সে প্লে করিল, তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ্ সাহেবের পার্ট প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।" (অমৃতলাল বসু)।

১৩. মহেন্দ্রলাল বসু, মহেন্দ্রনাথ নামেও পরিচিত। বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য-শিক্ষক। ১৭৭৫ শকাব্দ, ১১ কার্তিক জন্ম। পিতা — ব্রজেন্দ্র বসু। বাল্যে পিতৃ-বিয়োগ। হিন্দু স্কুলে প্রথম পাঠ। অল্প বয়সেই অভিনয়ে অনুরাগ। গিরিশ পরিচালিত 'লীলাবতী' নাটকে ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ (১৮৭২, ১১ মে)। মহেন্দ্রলাল-অভিনীত বিখ্যাত কয়েকটি ভূমিকা : পদী (নীলদর্পণ), নবকুমার (কপালকুণ্ডলা), শরৎ (শরৎ-সরোজিনী), সিবাজ (পলাশীব যুদ্ধ), লক্ষ্মণ (সীতাব বনবাস), অলর্ক (বিষাদ) ও ভীম (পাণ্ডব গৌবব)। ১৯০০, ৩০ জুন ক্লাসিক থিয়েটারে 'সীতারাম' নাটকে গঙ্গারামেব ভূমিকায শেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয়। ১৩০৭, ২৪ ফাল্গুন মৃত্যু।

১৪. অদ্বিতীয় প্যান্টোমাইম অভিনেতা ও নৃত্যগীতনিপুণ নট অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বেলবাবু বা 'কাপ্তেন বেল' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম দিকে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। হাল্কা এবং গম্ভীর উভয় শ্রেণীর চরিত্রাভিনয়ে এঁর দক্ষতা ছিল। ভজহরি (প্রফুল্ল), গদাধরচন্দ্র (সরলা), সেলিম (আনন্দরহো), চৈতন্য (রূপ-সনাতন) প্রভৃতি বেলবাবু-অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকা। ১৮৯০, ১১ মার্চ তিনি আত্মহত্যা করেন।

১৫. পূর্বোক্ত মহেন্দ্রলাল বসু।

১৬. অমৃতলাল বসুর ভাষায় — "অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী বিধাতার হাতে গড়া এ্যাকটার ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক।" জন্ম ১২৫৮, ১০ মাঘ। পিতা — শ্যামাচরণ মুস্তফী। প্রথম অভিনয় ১৮৬৭, ২ নভেম্বর 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে দন্তবক্র, মুরাদ আলী ও চন্দনবিলাসের ভূমিকায। ১৯০৮, ৯ আগস্ট কোহিনুর থিয়েটারে 'নবীন তপস্বিনী' ও 'প্রফুল্ল' নাটকে যথাক্রমে জলধর ও যোগেশ রূপে শেষ অভিনয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর-অভিনীত কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকা : জলধর (নবীন তপস্বিনী), ধনদাস (কৃষ্ণকুমারী নাটক), গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ (দুর্গেশ-নন্দিনী) ও আবুহোসেন (আবুহোসেন)। মৃত্যু — ১৩১৫ , ৩১ ভাদ্র।

১৭. এই সময় তিনজন 'গোপাল' নামধারী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম, গোপালচন্দ্র দাস (১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের আদুরী এবং জনৈক রায়তের চরিত্রাভিনেতা), দ্বিতীয়, গোপালচন্দ্র মজুমদার (১৮৭৫, ৩ জুলাই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'পদ্মিনী' নাটকে আলাউদ্দিনের ভূমিকাভিনেতা) এবং তৃতীয়, গোপালচন্দ্র মল্লিক (১৮৮২, ২২ জুলাই ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সীতাহরণ' নাটকের মহাদেব)। বিনোদিনী কার কথা বলেছেন তা বলা কঠিন।

১৮. ১৮৬৮ সপ্তমী পূজার রাত্রে বাগবাজারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে 'সধবার একাদশী' নাটকে রামমাণিক্যের ভূমিকায় প্রথম মঞ্চে আবির্ভাব। 'সধবার একাদশী'র পর 'লীলাবতী' নাটকে ক্ষীরোদবাসিনী চরিত্রের রূপারোপে দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্রজেন্দ্রকুমার রায়-রচিত 'প্রকৃত বন্ধু' নাটকেও তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। শকুনি (ছত্রভঙ্গ – ১৮৮৩), বসন্ত রায় (রাজা বসন্ত রায় – ১৮৮৬), শকুনি (পাণ্ডব নির্বাসন – ১৮৮৭), বটুকচাঁদ (বিজয় বসন্ত – ১৮৯৩), ফস্টার (চন্দ্রশেখর – ১৯১০) প্রভৃতি রাধামাধব কর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তাঁর লেখা 'বসন্তকুমারী নাটক' ১৮৭৮, ১২ মে প্রকাশিত হয়।

১৯. লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও শৌখিন নাট্যাভিনেতা। কলকাতার আর. জি. কর কলেজ ও হাসপাতাল এঁর নামে প্রতিষ্ঠিত।

২০. নাটকটির নাম 'বেণীসংহার' নয় – 'শত্রুসংহার নাটক'। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে হরলাল রায় এটি রচনা করেন। নাটকখানি প্রকাশের তারিখ ১৮৭৪, ১৫ আগস্ট।

¶ "কিন্তু যে দিন[২১] পার্ট লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে বাহির হইতে হইল, সে দিন হৃদয়ভাব ও মনের ব্যাকুলতা কেমন করিয়া বলিব।" পৃ ১৫

২১. 'শত্রুসংহার নাটকে'র প্রথম অভিনয় রাত্রেই বিনোদিনী মঞ্চে দেখা দেন। নাটকটি ২ অথবা ১২ ডিসেম্বর, ১৮৭৪ প্রথম অভিনীত হয়।

¶ "ইহার কিছুদিন পরেই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় হরলাল রায়ের "হেমলতা"[২২] নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।" পৃ ১৬

২২. 'হেমলতা' এর আগে অনেকবার সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। ১৮৭৩, ১৩ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার জোড়াসাঁকোর সান্যালবাড়ির

রঙ্গমঞ্চে এটি অভিনয় করেন। নাটকখানির প্রকাশ তারিখ ১৮৭৩, ১৫ অক্টোবর।

"এই সময় আর একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেইসঙ্গে মদনমোহন বর্ম্মণ[২৩] অপেরা মাষ্টার হইয়া থিয়েটারে যোগ দিলেন। উক্ত অভিনেত্রীর নাম কাদম্বিনী দাসী[২৪]।" পৃ ১৬

২৩, ২৪. মদনমোহন বর্মণ ও কাদম্বিনী দাসী ১৮৭৪, নভেম্বর মাসে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল ত্যাগ করেন। এঁরা আবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ফিরে আসেন ১৮৭৫, মে মাসে। মদনমোহন বর্মণ সেকালেব বিখ্যাত অর্কেস্ট্রা পবিচালক। এঁরই কৃতিত্বে গ্রেট ন্যাশনালেব অপেবা 'সতী কি কলঙ্কিনী?' প্রভৃত যশ অর্জন করে। এই 'সতী কি কলঙ্কিনী?'-তেই কাদম্বিনীর প্রথম মঞ্চাবতরণ (১৮৭৪, ১৯ সেপ্টেম্বর)। কাদম্বিনী-অভিনীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভূমিকা: লীলা (আনন্দ-কানন, গ্রেট ন্যাশনাল, ১৮৭৪), সাবিত্রী (আদর্শ সতী, গ্রেট ন্যাশনাল, ১৮৭৬), মন্দোদরী (মেঘনাদ বধ, ন্যাশনাল, ১৮৭৭), বানীভবানী (পলাশীর যুদ্ধ, ন্যাশনাল, ১৮৭৮), প্রসূতি (দক্ষযজ্ঞ, ষ্টার, ১৮৮৩) ও সুনীতি (ধ্রুবচবিত্র, ষ্টার, ১৮৮৩)।

¶ "ইহাব কযেক মাস পবেই[২৫] "গ্রেট ন্যাশনাল" থিয়েটার কোম্পানী পশ্চিম অঞ্চলে থিযেটাব কবিতে বাহির হন,…" পৃ ১৭

২৫. ১৮৭৫, মার্চ মাসের শেষে 'গ্রেট ন্যাশনাল' পশ্চিমভ্রমণে বেরোয়।

¶ "একরাত্রি লক্ষ্ণৌ নগবে ছত্রমণ্ডিতে আমাদের "নীলদর্পণ"[২৬] অভিনয় হইতে-ছিল,…" পৃ ১৭

২৬. দীনবন্ধু মিত্র-রচিত সামাজিক নাটক। প্রকৃত নাম 'নীলদর্পণং নাটকং'। এই নাটক দিয়েই ১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর সাধারণ রঙ্গালয় খোলা হয়। 'নীল-দর্পণ' নাটকের প্রকাশ তারিখ ১৭৮২ শকাব্দা, ২ আশ্বিন (১৮৬০ খ্রী)।

¶ "একে তো "নীলদর্পণ" পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় হইতেছিল, তাহাতে বাবু মতিলাল সুর[২৭] – তোরাপ,…" পৃ ১৭

২৭. ১৮৭২, ১১ মে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' অভিনীত 'লীলাবতী' নাটকে প্রথম অভিনয়। সাধারণ রঙ্গালয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম রজনীর বিখ্যাত 'তোরাপ'। অমৃতলাল বসু লিখেছেন: "মতিলালের মত 'তোরাপ' আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।" ১৮৭৩-এ কিছুদিনের জন্য

ন্যাশনাল থিয়েটারের সেক্রেটারি হন। ন্যাশনালে সত্যদাস (কৃষ্ণকুমারী নাটক – ১৮৭৩), বিভীষণ (মেঘনাদ বধ – ১৮৭৭), রাবণ (তরণীসেন বধ – ১৮৮৩), সত্যানন্দ (আনন্দমঠ – ১৮৮৩) ও প্রতাপ (রাজা বসন্ত রায় – ১৮৮৬) এবং এমারেল্ডে যুধিষ্ঠির (পাণ্ডবনির্বাসন – ১৮৮৭), দামোদর (পুর্ণচন্দ্র – ১৮৮৮) ও মাধব (বিষাদ – ১৮৮৮) বিখ্যাত ভূমিকা। ১৮৮৮-র শেষে এমারেল্ডের অন্যতম অংশীদার হন। পরবর্তী কালে এমারেল্ড থিয়েটারে রাজা (রাজা ও রানী – ১৮৮৯), গোবর্দ্ধন (অনুপমা – ১৮৯০), হরলাল (কৃষ্ণকান্তের উইল – ১৮৯২) প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় ক'রে খ্যাতি অর্জন করেন।

¶ "'সতী কি কলঙ্কিনী'[২৮]তে রাধিকা, 'নবীন তপস্বিনী'[২৯]তে কামিনী, 'সধবার একাদশী'[৩০]তে কাঞ্চন, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'[৩১]তে ফতি – কত বলিব।" পৃ ১৮

২৮. নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায (১২৫৭-১২৮৯) রচিত অপেরা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৪, ১৯ সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনীত হয। গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ ১৮৭৪, ১০ সেপ্টেম্বর।

২৯. দীনবন্ধু মিত্র-রচিত সামাজিক নাটক। ১৮৭০, ১৭ জুলাই কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১২৭০ সাল (ইং ১৮৬৩ খ্রী)।

৩০. দীনবন্ধু-রচিত এই সামাজিক নাটকখানি ১৮৬৮-তে প্রথম বাগবাজারের সখের দল অভিনয করে। দলে পরবর্তীকালের সাধারণ রঙ্গালয়ের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রমুখ দিকপাল অভিনেতৃবৃন্দ ছিলেন। 'সধবার একাদশী'র প্রকাশ-কাল ১৮৬৬।

৩১. পুর্বোক্ত নাট্যকারের লেখা আর একটি সামাজিক নাটক। ১৮৭৩, ১৫ জানুয়ারি, বুধবার ন্যাশনাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয়দ্বারা সাধারণ রঙ্গালয়ে বুধবারে অভিনয়ের রেওয়াজ শুরু হয়। এর পূর্বে কেবলমাত্র শনিবারেই অভিনয়ের প্রচলন ছিল। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ১৮৬৬-তে প্রকাশিত হয়।

¶ "ঐ কথা লইয়া নীলমাধববাবু[৩২] আমায় দেখা হইলেই এখনও তামাসা করিয়া বলিতেন যে '৺ বৃন্দাবনে গিয়া বাঁদর ভোজন করাবি বিনোদ !'" পৃ ২০

৩২. বিখ্যাত নট ও পরিচালক নীলমাধব চক্রবর্তী বিভিন্ন সময়ে ন্যাশনাল,

ষ্টার, সিটি, অরোরা, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'সিটি' (বীণা – ১৮৯১) ও 'অরোরা' (বেঙ্গল – ১৯০১) নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। নীলমাধব-অভিনীত কয়েকটি ভূমিকা: ন্যাশনালে বশিষ্ঠ (সীতার বনবাস – ১৮৮১), রামচন্দ্র (রাজা বসন্ত রায় ১৮৮৬); ষ্টারে ব্রহ্মা (দক্ষযজ্ঞ – ১৮৮৩), জগন্নাথ মিশ্র (চৈতন্যলীলা – ১৮৮৪), মদন (প্রফুল্ল – ১৮৮৯), অরোরায় ভবানী (দেবী চৌধুরাণী – ১৯০১) ও জগদীশ (কালপরিণয় – ১৯০২)।

¶ "ইহার পর আমরা কলিকাতা চলিয়া আসি। তার পর বোধহয় পাঁচ ছয় মাস "গ্রেট ন্যাশনাল" থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়[৩৩]।" পৃ ২০

৩৩. এখানে বিনোদিনীর স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে। ১৮৭৫, মে মাসে তাঁরা কলকাতায় ফেরেন, আর মামলা-মকর্দমা এবং Dramatic Performances Control Bill পাশ হবার ফলে ১৮৭৬, ডিসেম্বরের শেষে গ্রেট ন্যাশনাল সাময়িক-ভাবে বন্ধ হয়।

¶ "তৎপরে[৩৪] আমি মাননীয় ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ[৩৫] মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে ২৫৲ পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই।" পৃ ২০

৩৪ পূর্বোক্ত সময়ে বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন।

৩৫. ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র, বেঙ্গলে থিয়েটারের (১৮৭৩) প্রতিষ্ঠাতা। সুদক্ষ অভিনেতা, অদ্বিতীয় অশ্বচালক ও পাখোয়াজ-বাদক। এঁর নেতৃত্বেই বাংলা থিয়েটারে সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়। মুদ্রিত বাংলা নাটকের মধ্যে প্রথম অভিনীত নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'য় নাম-ভূমিকায় প্রথম অভিনয় (১৮৫৭, ৩০ জানুয়ারি)। শরৎচন্দ্র-অভিনীত বিশিষ্ট কয়েকটি ভূমিকা: জগৎ সিংহ (দুর্গেশ-নন্দিনী – ১৮৭৩) পুরু (পুরুবিক্রম – ১৮৭৪) ও ভীষ্মাচার্য্য (পাষাণ প্রতিমা – ১৮৭৯)।

¶ "তবে বেঙ্গল থিয়েটারে যে কয়েক বৎসর[৩৬] অভিনয় কার্য্য করিয়া ছিলাম, সেই সময়ের ঘটনাগুলি বিবৃত করি।" পৃ ২০

৩৬. এখানেও কাল-বিভ্রাট। বিনোদিনী পূর্বেই বলেছেন গ্রেট ন্যাশনাল বন্ধ হলে তিনি বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৬, ডিসেম্বর মাসের শেষে গ্রেট ন্যাশনাল বন্ধ হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ১৮৭৬, ডিসেম্বর থেকে কতদিন বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে ছিলেন? তিনি বলছেন 'কয়েক বৎসর'।

কিন্তু অন্যত্র তাঁর কথা থেকে আমরা জানতে পারি কেদার চৌধুরী ও গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার খোলার শুরু থেকেই বিনোদিনী তাঁদের সঙ্গে জড়িত। ১৮৭৭, জুলাই মাসে ন্যাশনাল থিয়েটাব খোলা হয়। তাহলে বেঙ্গল থিয়েটারে তাঁর অভিনয় কাল দাঁড়ায় ১৮৭৬, ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৭, জুলাই – যে সময়টাকে কোনোক্রমেই 'কয়েক বৎসর' বলা চলে না। অথচ বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনী-অভিনীত নাটকেব তালিকা ও শরৎচন্দ্র ঘোষের প্রতি ভক্তি দেখে মনে হয় ঐ থিয়েটারে তাঁব অবস্থান-কাল নিতান্ত সামান্য নয়। ব্যাপারটা সত্যিই খুব গোলমেলে।

¶ "প্রসিদ্ধা গায়িকা বনবিহারিণী (ভুনি)[৩৫], সুকুমারী দত্ত (গোলাপী)[৩৬] ও এলোকেশী[৩৭] সেই সময় "বেঙ্গলে" অভিনেত্রী ছিলেন। তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের[৩৮] "মেঘনাদবধ"[৩৯] কাব্য নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয়ার্থে প্রস্তুত হইতে ছিল।" পৃ ২১

৩৫. সংগীতবহুল চরিত্রাভিনয়ে খ্যাতি ছিল। ১৮৭৯-তে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'কামিনীকুঞ্জ' (অপেরা) নাটকে নায়িকার ভূমিকা প্রসিদ্ধ। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'তে বিনোদিনী (বেঙ্গল – ১৮৭৫), 'বিল্বমঙ্গলে' অহল্যা (ষ্টার – ১৮৮৬), 'পাণ্ডবনির্বাসনে' দ্রৌপদী (এমারেল্ড – ১৮৮৭), 'প্রফুল্ল'-তে ইতর স্ত্রী (ষ্টার – ১৮৮৯), বনবিহারিণী (ভুনি)- অভিনীত কয়েকটি ভূমিকা।

৩৬. সুকুমারী দত্ত 'গোলাপী' নয়, 'গোলাপ' নামেই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম কর্মস্থল। গ্রেট ন্যাশনালে 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকে সুকুমারীর ভূমিকায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করায় 'সুকুমারী' নামকরণ হয়। উক্ত থিয়েটারের তদানীন্তন ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রচেষ্টায় সম্প্রদায়ের অন্যতম অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিবাহের পর সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিতা হন। অভিনেত্রী জীবনের বিভিন্ন সময়ে বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল, এমারেল্ড প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আশুতোষ দাসের সহযোগিতায় 'অপূর্ব সতী' নামে নাটক লেখেন। নাটকখানি ১৮৭৫, ২৩ আগস্ট গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়। সুকুমারী দত্ত (গোলাপ) -অভিনীত বিশিষ্ট কয়েকটি ভূমিকা : 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে বিমলা (বেঙ্গল – ১৮৭৩), 'শরৎ-সরোজিনী'তে সুকুমারী (গ্রেট ন্যাশনাল – ১৮৭৫), 'অশ্রুমতী'তে মলিনা (বেঙ্গল – ১৮৮০) ও 'পূর্ণচন্দ্র'তে পূর্ণচন্দ্র (এমারেল্ড – ১৮৮৮)।

৩৭. বেঙ্গল থিয়েটারে এলোকেশীর অভিনেত্রী জীবনের শুরু। ১৮৭৩-এ এখানকার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে খ্যাতি অর্জন করেন। 'ঋষ্যশৃঙ্গ' নাটকেও (ষ্টার—১৮৯২) তাঁর অভিনয় স্মরণীয়।

৩৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩): বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। ১৮৫৮-তে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্ন-অনূদিত 'রত্নাবলী নাটকে'র অভিনয় দেখে নাট্যরচনায় উদ্বুদ্ধ হন। মধুসূদন-রচিত প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' শৌখিন রঙ্গমঞ্চে (বেলগাছিয়া নাট্যশালায়) ১৮৫৯, ৬ সেপ্টেম্বর এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে (বেঙ্গল থিয়েটারে) ১৮৭৩, ১৬ আগস্ট প্রথম অভিনীত হয়। বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয় 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল মধুসূদনের প্রেরণা। বাংলা থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রী নিয়োগ তাঁর পরামর্শেই ঘটে। মধুসূদন দত্ত-রচিত প্রায় সব ক-টি নাটকই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। বস্তুত দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এই তিন দিকপালের রচনা-সাহায্য না পেলে প্রথম যুগের বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে উঠতে পারতো না।

৩৯. বেঙ্গল থিয়েটারে 'মেঘনাদ বধ' প্রথম অভিনীত হয় ১৮৭৫, ৬ মার্চ তারিখে। সেই সময় বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনালে। গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী ও বেঙ্গল থিয়েটার সম্মিলিতভাবে এই অভিনয় করে।

¶ "বঙ্কিমবাবুর[৪০] 'মৃণালিনী'তে[৪১] মনোরমা অভিনয়ই করিতাম এবং 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে[৪২] আয়েষা ও তিলোত্তমা এই দুইটি ভূমিকা প্রয়োজন হইলে দুইটিই একরাত্রি একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছি।" পৃ ২১

৪০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪): প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত প্রায় সমস্ত উপন্যাসই নাটকাকারে অভিনীত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয় গঠনে সহায়তা করে।

৪১. সাধারণ রঙ্গালয়ে 'মৃণালিনী'র প্রথম অভিনয়-তারিখ, ১৮৭৪, ১৪ ফেব্রুয়ারি (ন্যাশনাল থিয়েটার)।

৪২. বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৩, ২০ ডিসেম্বর 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রথম অভিনীত হয়।

¶ "এমন সময় বাবু অমৃতলাল বসু[৪৩] আসিয়া অতি আদর করিয়া বলিলেন, 'বিনোদ! লক্ষ্মী ভগ্নিটী আমার'!" পৃ ২২

৪৩. অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯): নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য। সাধারণ

রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম নাটক 'মডেল স্কুল' ১৮৭৩, ৮ মার্চ ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' নাটকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম আবির্ভাব। অমৃতলাল-রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক—'হীরকচূর্ণ নাটক' (১৮৭৫), 'চাটুজ্জে ও বাঁডুয্যে' (১৮৮৪), 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'খাসদখল' (১৯১২) ও 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮)। মিঃ স্কোবল (হীরকচূর্ণ নাটক), তুকড়ি সেন (বেল্লিকাজার), কৃষ্ণকান্ত (কৃষ্ণকান্তের উইল), নীলকমল (সরলা), নিতাই (খাসদখল), রমেশ (প্রফুল্ল), বিহারী খুড়ো (তরুবালা) প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় প্রসিদ্ধ। রঙ্গালয়ে তিনি 'ভুনীবাবু' নামে পবিচিত ছিলেন।

¶ "এই মৃণালিনীতে হবি বৈষ্ণব[৪৪]—হেমচন্দ্র, কিরণ বাঁডুয্যে[৪৫]—পশুপতি, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত)—গিরিজায়া, ভুনী—মৃণালিনী এবং আমি—মনোরমা!" পৃ ২২

৪৪. বেঙ্গল থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা। প্রকৃত নাম হরিদাস দাস। হবি বৈষ্ণব-অভিনীত বিশিষ্ট কয়েকটি ভূমিকা: ওসমান (দুর্গেশনন্দিনী—১৮৭৩), আলেকজাণ্ডার (পুরুবিক্রম—১৮৭৪), লক্ষ্মণ (মেঘনাদ বধ—১৮৭৫), সেলিম (অশ্রুমতী নাটক—১৮৮০) ও অমরনাথ (রজনী—১৮৯৫)।

৪৫. সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অভিনেতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে (১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর) বিন্দুমাধবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' জগৎসিংহের চরিত্রাভিনয়ও প্রশংসিত হয়। বেঙ্গল থিয়েটাব ও গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর সম্মিলিত অভিনয় 'মেঘনাদ বধ' নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয় দ্বাবা দর্শকদের মুগ্ধ করেন। 'ভাবতমাতা' (১৮৭৩ ২৮ আগস্ট) ও 'ভারতে যবন' (১৮৭৪, ২০ অক্টোবর) কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত দুটি নাটক সমকালীন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

¶ "আমার অবস্থা দেখিয়া চারুবাবু[৪৬] মহাশয় ছোটবাবুকে বলিলেন, ·" পৃ ২৩।

৪৬. বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চারুচন্দ্র ঘোষ। নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইনি শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করেন। চারুচন্দ্র ইংরাজিতে সুপণ্ডিত ছিলেন ও সংগীতবিদ্যায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

¶ "এই সময় মাননীয় ৺কেদারনাথ চৌধুরী[৪৭] ও শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ[৪৮] মহাশয় প্রায়ই বেঙ্গল থিয়েটারে যাইতেন।" পৃ ২৫

৪৭. বিশিষ্ট নট, নাট্যকার ও থিয়েটার-ম্যানেজার। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ সখ্যতা ছিল। গিরিশচন্দ্র-রচিত প্রথম নাটিকা 'আগমনী' কেদার চৌধুরীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। দুজনের সম্মিলিত প্রয়াসে ১৮৭৭-এর মধ্যভাগে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 'লিজ' নেওয়া হয়। জীবনের বিভিন্ন সময়ে একাধিক নাট্যশালার অধ্যক্ষতা করেন। 'আগমনী'তে মহাদেব, 'অভিমন্যুবধ'-এ কৃষ্ণ ও দ্রোণ, 'আনন্দমঠ'-এ জীবানন্দ, 'ছত্রভঙ্গ'-তে দুর্যোধন কেদার চৌধুরী-অভিনীত বিশিষ্ট ভূমিকা। রচিত নাটকসমূহের মধ্যে 'ছত্রভঙ্গ' অন্যতম। নাটকটি ১৮৮৩-তে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

৪৮. গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪–১৯১২): নট, নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক। সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম জীবনে এ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে ন্যাশনাল, ষ্টার, মিনার্ভা, এমারেল্ড, ক্লাসিক প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৮৪-তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই সূত্রে সাধারণ রঙ্গালয়ে পরমহংসদেবের পাদস্পর্শ ঘটে। 'সধবার একাদশী'-তে নিমচাঁদ (এ্যামেচার–১৮৬৮), 'কৃষ্ণকুমারী'-তে ভীমসিংহ (ন্যাশনাল–১৮৭৩) 'মৃণালিনী'-তে পশুপতি (গ্রেট ন্যাশনাল–১৮৭৪), 'মেঘনাদ বধে' রাম ও মেঘনাদ (ন্যাশনাল–১৮৭৭), 'ম্যাকবেথে' ম্যাকবেথ (মিনার্ভা–১৮৯৩), 'প্রফুল্ল'-তে যোগেশ (মিনার্ভা–১৮৯৫), 'সীতারাম'-এ সীতারাম (মিনার্ভা–১৯০০) ও 'বলিদান'-এ করুণাময় (মিনার্ভা–১৯০৫) গিরিশচন্দ্র-অভিনীত বিখ্যাত ভূমিকা। তাঁর রচিত প্রায় ৯০টি নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়।

¶ "আমি বেঙ্গল থিয়েটার ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ন্যাশনাল থিয়েটারে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হই[৪৯]। মাসকয়েক 'মেঘনাদ বধ', 'মৃণালিনী' ইত্যাদি পুরাতন নাটকে এবং 'আগমনী',[৫০] 'দোললীলা'[৫১] প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্যে ও অনেক প্রহসন ও প্যাণ্টোমাইমে প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করি।" পৃ ২৭

৪৯. ১৮৭৭-এর মাঝামাঝি সময়ে বিনোদিনী যখন ন্যাশনালে যোগ দেন তখন ঐ থিয়েটারের 'লিজ' কেদারনাথ চৌধুরীর নামে ছিল না। ১৮৭৭, জুলাইতে গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে একাই

'লিজ' নেন। কেদার চৌধুরী ম্যানেজার হন। ভ্রাতার আপত্তিতে 'আগমনী' ও 'অকাল বোধনে'র পর গিরিশচন্দ্র স্বত্ব ত্যাগ করলে শ্যালক দ্বারকানাথ দেব ন্যাশনালের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। এঁর আমলে 'মেঘনাদ বধ' অভিনীত হয়। কেদারনাথ চৌধুরীর মালিকানা শুরু হয় ১৮৭৮-এর প্রথম থেকে। উপরোক্ত চারটি নাটকের মধ্যে কেবল 'দোললীলা'ই কেদারনাথের আমলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৫০. ন্যাশনালে প্রথম অভিনযেব তারিখ ১৮৭৭, ৬ অক্টোবর।

৫১. ১৮৭৮, ৪ মার্চ 'দোললীলা' ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হয়।

¶ "ইহার পর গিরিশবাবুর ও আমার থিয়েটারের সহিত সংস্রব শিথিল হইয়া আসে[৫২]।" পৃ ২৭

৫২. ন্যাশনাল থিয়েটারে 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়কালে (১৮৭৮) গিরিশচন্দ্রের হাত ভেঙে যাওযায় তিনি কিছুকালের জন্য রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর নেন। তাঁব অনুপস্থিতিতে সম্প্রদায় ভেঙে যায়।

¶ "অল্পদিনের মধ্যেই থিয়েটার নীলামে বিক্রয হওয়াষ প্রতাপচাঁদ জহুরী[৫৩] নামক জনৈক মাড়োয়ারী অধিকারী হইলেন।·· গিরিশবাবু পুনর্ব্বার ম্যানেজার হইলেন[৫৪]।" পৃ ২৭

৫৩. বাংলা থিয়েটারে প্রথম অবাঙালি স্বত্বাধিকারী।

৫৪. গিরিশচন্দ্রের মাসিক বেতন একশত টাকা ধার্য হয়।

¶ "এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয়, স্বর্গীয় কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিরচিত 'হামীর'[৫৫]।" পৃ ২৭

৫৫. টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে 'মহিলাকাব্য' প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত প্রথম ও শেষ নাটক। অভিনয়কালে নাট্যকার জীবিত ছিলেন না। নাটকের জন্য গিরিশচন্দ্র চারখানি গান রচনা ক'রে দেন।

¶ "কিন্তু তখন ন্যাশনালের দুর্নাম রটিয়াছে[৫৬], অতি ধূমধামের সহিত সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া অভিনয় হইলেও অধিক দর্শক আকর্ষিত হইল না।" পৃ ২৭

৫৬. গিরিশচন্দ্র সাময়িকভাবে অবসর নেওয়ার পর থেকেই ন্যাশনালের দুর্নাম শুরু হয়। ১৮৭৯, ১৯ এপ্রিল তারিখের 'সুলভ সমাচারে' কেশবচন্দ্র সেন লিখেছেন : "ন্যাশনাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আসিতেছে··· থিয়েটারের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করে, মদ খায়, অভিনয়-স্থলে মারামারি হুড়াহুড়ি করিয়া দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার করিতেছে দেখিয়াও

শিক্ষিত ভদ্রলোক তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমোদ করেন, তখন আর এ দুরাচার কে নিবারণ করিবে? এখন আবার বাবুরা নিজের পরিবার লইয়া এই থিয়েটার করিয়া না বসেন, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।"

¶ "'মায়াতরু'[৫৭] নামে একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য গিরিশবাবু রচনা করিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধে'[৫৮] সহিত একত্রিত হইয়া এই গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়।" পৃ ২৭

৫৭. প্রথম অভিনয় রজনী – ১৮৮১, ২২ জানুয়ারি (ন্যাশনাল)।

৫৮. প্রথম অভিনয় রজনী – ১৮৭৮, ৫ জানুয়ারি (ন্যাশনাল)।

¶ "এই গীতিনাট্যে আমার 'ফুলহাসির' ভূমিকা দেখিয়া 'রিজ এণ্ড রায়তের' সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন, "বিনোদিনী *was simply charming*"। ক্রমে গিরিশবাবুর 'মোহিনী প্রতিমা'[৫৯] 'আনন্দ রহো'[৬০] দর্শক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর 'রাবণ বধে'র[৬১] পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত না।" পৃ ২৭

৫৯. স্যার ডব্লিউ. এস. গিলবার্টের *Pygmalion and Galatea* অবলম্বনে রচিত গীতিনাট্য। ন্যাশনালে প্রথম অভিনয় ১৮৮১, ১৬ এপ্রিল।

৬০. গিরিশচন্দ্র-রচিত প্রথম মৌলিক নাটক। ১৮৮১, ২১ মে ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হয়।

৬১. গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক। ন্যাশনালে প্রথম অভিনয় ১৮৮১, ৩০ জুলাই।

¶ "ক্রমে 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি[৬২] নাটক চলিল।" পৃ ২৮

৬২. গিরিশচন্দ্রের লেখা পৌরাণিক নাটক। ন্যাশনালে প্রথম অভিনয়-রজনী ১৮৮১, ১৭ সেপ্টেম্বর।

¶ "যে সময় কেদারবাবু থিয়েটার করেন, সেইসময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র[৬৩] মহাশয় আসিয়া অভিনয় কার্য্যে যোগ দেন।" পৃ ২৮

৬৩. গিরিশ-সখা গোপাল মিত্রের পুত্র। ন্যাশনাল থিয়েটারে (১৮৭৩) 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে নবকুমারের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল বসুর অভিনয় দেখে নাট্যকলায় অনুরক্ত হন। গিরিশচন্দ্রের যৌবনকালে রচিত প্রায় প্রতিটি বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক অমৃতলাল। ১৮৭৭, ১ ডিসেম্বর ন্যাশনালে 'মেঘনাদবধ' নাটকে রাবণ চরিত্রে প্রথম আবির্ভাব। ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। আমৃত্যু এইখানে অভিনয়

করেন। অমৃতলাল মিত্র-অভিনীত বিখ্যাত ভূমিকা : মহাদেব (দক্ষযজ্ঞ), নল (নলদময়ন্তী), বুদ্ধ (বুদ্ধদেব চরিত), বিল্বমঙ্গল (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর), চন্দ্রশেখর (চন্দ্রশেখর) ও যোগেশ (প্রফুল্ল)। ক্যানসার রোগে ১৯০৮, ২৭ জুন মারা যান।

¶ "উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে 'মেঘনাদ বধ', 'বিষবৃক্ষ'[৬৪], 'সধবার একাদশী'[৬৫], 'মৃণালিনী', 'পলাশীর যুদ্ধ' ও নানা রকম বড় অথরের বই নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছিল।" পৃ ২৮

৬৪. ন্যাশনালে প্রথম অভিনয় তারিখ ১৮৭৮, ৯ মার্চ।

৬৫. ১৮৭২, ২৮ ডিসেম্বর ন্যাশনালে প্রথম অভিনয়।

¶ "ইহার পর কৃষ্ণধন[৬৬] ও রাধাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া দুই ভাই কয়েকমাস থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব করেন।" পৃ ২৯

৬৬. সম্ভবত শ্যামপুকুর নিবাসী এই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ই ১৮৭৫, আগস্ট মাসে ভুবনমোহন নিয়োগীর কাছে থেকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 'লিজ' নেন।

¶ "এই স্থানে যে যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছেন, কেবল প্রতাপবাবুই ঋণগ্রস্ত হন নাই[৬৭]।" পৃ ৩৩

৬৭. পরবর্তীকালে 'এই স্থানে' থিয়েটার ব্যবসা ক'রে আর একজন লাভবান হন, তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের এককালের স্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে।

¶ "আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখনই ঐ 'ষ্টার থিয়েটার' করিবার জন্য গুর্ম্মুখ রায় বাস্ত[৬৮]।" পৃ ৩৫

৬৮. ধনী মাড়োয়াড়ি যুবক। পিতা হোর মিলার কোম্পানির প্রধান দালাল ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর ইনিও সেই পদে অধিষ্ঠিত হন।

¶ "এদিকে আমরা যে কয়জন একত্র হইয়াছিলাম সকলে প্রতাপবাবুর থিয়েটার ত্যাগ করিলাম[৬৯]।" পৃ ৩৯

৬৯ ১৮৮৩-র ফেব্রুয়ারিতে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, অমৃতলাল মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্তী, অমৃতলাল বসু, অঘোর পাঠক, প্রবোধ ঘোষ প্রমুখসহ ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করেন।

¶ "পরে যখন আমাদের নূতন থিয়েটার হইল[৭০], তখন ভুনীবাবু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দেন।" পৃ ৪০

৭০. ১৮৮৩-তে ৬৮নং বিডন স্ট্রীটে 'ষ্টার থিয়েটার' খোলা হয়।

¶ "সেই সময় প্রফেসর জহরলাল ধর[৭১] আমাদের স্টেজ ম্যানেজার হন! দাসুবাবু[৭২] যদিও ছেলেমানুষ…হরিপ্রসাদ বসু[৭৩] মহাশয়কে আনিয়া·· " পৃ ৪০

৭১. জহরলাল ধর সে যুগের বিখ্যাত স্টেজ ম্যানেজার। এঁর পরিকল্পনা অনুসারেই বিডন স্ট্রীটের 'ষ্টার থিয়েটার' তৈরি হয়।

৭২. দাসু নিয়োগী পববর্তীকালে স্টেজ ম্যানেজাব ও ষ্টাব থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হন।

৭৩. বাগবাজাব চিৎপুব রোডের উপব হবিপ্রসাদ বসুব একটি ডাক্তাবখানা ছিল। গিবিশচন্দ্র থিযেটারের পথে প্রাযই সেখানে যেতেন। তিনিও গিরিশচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। হিসাবপত্র বক্ষায় তাঁব সুপ্রণালী দেখে গিবিশচন্দ্র গুর্মুখ রায়ের থিয়েটাব-নির্মাণ সমযে তাঁকে হিসাবরক্ষক পদে নিযুক্ত কবেন এবং পরে ষ্টার থিযেটারেব কোষাধ্যক্ষের পদ দেন। [দ্র. গিবিশচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৩৪, পৃ ২৮২-৮৩]। হবিপ্রসাদ বসু ষ্টাবেব অন্যতম অংশীদাবও ছিলেন। মালিকানা চলে যাওয়াব পবও মমতাবশত আর্ট থিয়েটাবেব আমলে (১৯২৩) তিনি নিযমিত ষ্টাবে যাওযা-আসা করতেন।

¶ "এইরূপ নানাবিধ টাল-বেটালের পর নূতন 'ষ্টাবে' নূতন পুস্তক 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয় আবম্ভ হইল[৭৪]·· " পৃ ৪২

৭৪. গিবিশচন্দ্র প্রণীত পৌবাণিক নাটক। ষ্টাবে প্রথম অভিনয়ের তাবিখ ১৮৮৩, ২১ জুলাই।

¶ "…গুর্মুখবাবু থিয়েটারেব স্বত্ব ত্যাগ করিলেন[৭৫]।" পৃ ৪৩

৭৫. ১৮৮৩-র শেষে।

¶ "…তখন এক্‌জিবিসনের সময় প্রত্যহ অভিনয় চালাইয়া[৭৬] সেই টাকাব দ্বারা 'ষ্টার থিয়েটার' নিজেরা ক্রয় করিলেন।" পৃ ৪৩

৭৬. ১৮৮৩-র ৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার জুলস্ জুবার্টের কর্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

¶ "এই সময় সুবিখ্যাত 'নলদময়ন্তী'[৭৭], 'ধ্রুবচরিত্র'[৭৮], 'শ্রীবৎস-চিন্তা'[৭৯] ও 'প্রহ্লাদচরিত্র'[৮০] নাটক প্রস্তুত হয।" পৃ ৪৪

৭৭. ষ্টারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৮৩, ১৫ ডিসেম্বর।

৭৮. " ১৮৮৩, ১১ আগস্ট।

৭৯. " ১৮৮৪, ৭ জুন।

৮০. ষ্টারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৮৪, ২২ নভেম্বর।

¶ "…শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু[৮১] মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন…" পৃ ৪৪

৮১. শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১): বৈষ্ণবভক্ত ও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। প্রথম যুগের সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁর রচিত দুটি নাটক 'নযশো রূপেয়া' (১৮৭৩) ও 'বাজারের লড়াই' (১৮৭৪) ন্যাশনাল থিযেটারে অভিনীত হয়।

¶ "যেদিন প্রথম চৈতন্যলীলা অভিনয় করি[৮২]. " পৃ ৪৪

৮২. ১৮৮৪, ২ আগস্ট।

¶ "মাননীয় ফাদার লাফোঁ[৮৩] সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন…" পৃ ৪৬

৮৩. "ফাদার লাফোঁ (Fr. Lafont) সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কিছুকাল এঁর ছাত্র ছিলেন। লাফোঁ সাহেব সেকালে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিলেন—বাঙালীর আনন্দানুষ্ঠান ও সভাসমিতিতে সেকালে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গনটী বিনোদিনী দাসী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪)।

¶ "· ৺পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন!"[৮৪] … পৃ ৪৭

৮৪. ১৮৮৪, ২১ সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ষ্টারে 'চৈতন্যলীলা' দর্শনে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় দর্শনান্তে প্রীত হয়ে তিনি বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন।

¶ "আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই[৮৫] তখনও সেই রোগক্লান্ত প্রসন্নবদনে আমায় বলিলেন,…" পৃ ৪৭

৮৫. ১৮৮৫-তে পরমহংসদেব অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুরে অবস্থান করেন। শ্যামপুকুরের কালীপদ ঘোষ (দানাকালী) তখন বিনোদিনীর 'বাবু' (?); [দ্র. রত্নাকর গিরিশচন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]। তাঁর সহায়তায় সাহেবের ছদ্মবেশে বিনোদিনী ঠাকুর-দর্শন করেন।

¶ "এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন, মনে নাই।[৮৬]…" পৃ ৪৭

৮৬. 'চৈতন্যলীলা' দেখার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৪, ১৪ ডিসেম্বর 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' ও ১৮৮৫, ২৫ ফেব্রুয়ারি 'বৃষকেতু' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' দর্শনে উপস্থিত ছিলেন।

¶ "ইহার পর 'দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা' অভিনয় হয়।[৮৭]..." পৃ ৪৮

৮৭. বা 'নিমাই সন্ন্যাস'। প্রথম অভিনয়-রজনী—১৮৮৫, ১০ জানুয়ারি।

¶ "এই সময় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রস্তুত হয়।[৮৮]" পৃ ৪৮

৮৮. ১৮৮৪-র শেষে অভিনয়।

¶ "··আমি যখন 'সরোজিনী'তে 'সরোজিনী'র অংশ অভিনয় করিতাম, তখন এখনকার 'ষ্টারে'র সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয় ঐ নাটকে বিজয়সিংহের অংশ অভিনয় করিতেন[৮৯, ৯০]।·" পৃ ৫০

৮৯. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' ১৮৭৫, ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত হয়।

৯০. ১৮৭৫, ২৬ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয়। বিজয় সিংহ—অমৃতলাল বসু।

¶ "আমার কনিষ্ঠা কন্যার যখন মৃত্যু হয়[৯১]·" পৃ ৬৫

৯১. নাম শকুন্তলা। ১৩১০, ২৭ ফাল্গুন তের বছর বয়সে মৃত্যু।

¶ "··বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়[৯২] ছাপাইবার জন্য কল্পনা করেন।" পৃ ৭০

৯২. গিরিশচন্দ্রের জীবনীলেখক ও শেষজীবনের নিত্যসহচর।

¶ "সেই সময়···উপেনবাবু[৯৩], কাশীবাবু[৯৪]· সকলেই একথা জানিত।" পৃ ৭১

৯৩, ৯৪. উপেন্দ্র মিত্র-অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা : ষ্টার থিয়েটারে বিষ্ণু (দক্ষযজ্ঞ—১৮৮৩), যোগেশনাথ (নসীরাম—১৮৮৮), রাজা (বিজয়-বসন্ত—১৮৯৩)। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়-অভিনীত কয়েকটি ভূমিকা : ন্যাশনালে লক্ষ্মণ (সীতার বিবাহ—১৮৮২) এবং ষ্টার থিয়েটারে সুরেশ (প্রফুল্ল—১৮৮৯), গোবিন্দদাস (প্রতাপাদিত্য—১৯০৩)।

¶ "৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়[৯৫]···মথুরবাবু[৯৬] প্রভৃতি।" পৃ ৮২

৯৫. জন্ম—১৮৪০, ৭ জুন। পিতা—ঝাপ্পালাল চট্টোপাধ্যায়। কৃতী ছাত্র। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বন্ধু ও সহপাঠী। নট, নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে অবলুপ্তি পর্যন্ত ইনি তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মাধবাচার্য (মৃণালিনী), মহাদেব (মেঘনাদ বধ) ও ভীষ্ম (ভীষ্মের

(শরশয্যা) বিহারীলাল-অভিনীত তিনটি ভূমিকা বিখ্যাত। মৃত্যু—১৯০১, ২০ এপ্রিল।

৯৬. মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল থিয়েটারে 'দুর্বাসার পারণ' নাটকে (১৮৮৫) বিদূষকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

¶ "বীডন ষ্ট্রীটে, যেখানে মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ী ছিল, সেইখানে এই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল[৯৭]।" পৃ ৮২

৯৭. ১৮৭৩, ৩১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা।

¶ "শুনেছি, কলিকাতা গড়ের মাঠে লুইস থিয়েটার ব'লে একটা ইংরাজী থিয়েটার কোম্পানী আসে[৯৮]।" পৃ ৮৩

৯৮. "৭৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি চৌরঙ্গীর রাস্তার উপর লুইস সাহেব লুইস থিয়েটার নাম দিয়ে একখানি বাড়ী তৈরী করেন, ৭৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস রূপে ঐ থিয়েটারে প্রবেশ করবার পর ঐ থিয়েটারের নাম হয় লুইসেস থিয়েটার রয়েল। তারপর শুধু থিয়েটার রয়েল।" (অমৃতলাল বসু, মাসিক বসুমতী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ)।

¶ "হেমলতার পর আমাদের যে নতুন নাটকের অভিনয় হ'ল, তার নাম 'প্রকৃত বন্ধু'[৯৯]।" পৃ ৮৫

৯৯. ১৮৭৬, ৮ জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয়।

¶ "যিনি নাটক লিখেছেন, তাঁর নাম ৺ দেবেনবাবু[১০০], কি পদবী আমার মনে নেই।" পৃ ৮৬

১০০. প্রকৃত নাম ব্রজেন্দ্রকুমার রায়।

¶ "এবার দীনবন্ধুবাবুর[১০১] সাহিত্য-বৃক্ষের সুন্দর ফুল সেই লীলাবতীর[১০২] অভিনয় হ'ল।" পৃ ৮৭

১০১. দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩): কবি ও নাট্যকার। এঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের যাত্রা শুরু হয়। রচিত নাটক : নীলদর্পণং নাটকং (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী নাটক (১৮৬৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২) ও কমলে কামিনী নাটক (১৮৭৩)।

১০২. ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৩, ১১ জানুয়ারি প্রথম অভিনীত।

¶ "সে সময় শুধু যে নাটক প্লে হ'ত…'আদর্শ সতী'[১০৩], 'কনক-কানন'[১০৪],

'আনন্দলীলা'[১০৫], 'কামিনীকুঞ্জ'[১০৬],...'কিঞ্চিৎ জলযোগ'[১০৭], 'চোরের উপর বাটপাড়ি'[১০৮], এমনি ধারা কত প্রহসন।" পৃ ৮৭

১০৩. অতুলকৃষ্ণ মিত্র-রচিত প্রথম নাটক ও ১৮৭৬-এ প্রকাশিত।

১০৪, ১০৫. পরিচয় জানা নেই।

১০৬. ১৮৭৯, ১৮ জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-রচিত 'কামিনীকুঞ্জ' বাংলাদেশেব সাধারণ রঙ্গালয়ে ইটালিযান অপেরাব অনুকরণে প্রথম গীতিনাট্য। উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্ত সংগীতের মাধ্যমে উচ্চারিত। "১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে অভিনীত এই নাটকটি বাংলার নাট্য ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার একটি কারণ হল, এই প্রকাবের গীত-নাটক বাংলাদেশেব রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। আর দ্বিতীয় কারণ হল যে, এই নাটকই পুজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার পথ সহজ করেছিল।" (বাঙ্গালী জীবনে বিলাতি সংস্কৃতির প্রভাব—শান্তিদেব ঘোষ, দেশ, ৬ আষাঢ় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ২১ জুন ১৯৬৯)।

১০৭. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত প্রথম নাটক ও ১৮৭২-এ প্রকাশিত।

১০৮. অমৃতলাল বসু-রচিত ও ১৮৭৬-এ প্রকাশিত।

¶ "প্রহসনেব নাম হ'ল "মুস্তফি সাহেব কা পাক্কা তামাসা"[১০৯]।" পৃ ৮৮

১০৯. ১৮৭৩, ১৫ জানুয়াবি ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকের সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'মুস্তফি সাহেব কা পাক্কা তামাসা'ব প্রথম প্রচলন শুরু হয। "এই সময়ে দেবকার্সন নামে একজন ইংরেজ অপেরা হাউসে "Bengalı Baboo" লইয়া ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি 'ইংলিশম্যান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন: 'Dave Carson Sahıb Ka Pucka Tumasha'। 'মুস্তফি সাহেব-কা পাক্কা তামাশা' ইহারই পাল্টা জবাব।" (দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)।

গানের কয়েকটি লাইন:

হাম বডা সাব হ্যায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামাবা সাট—
Mr. Mastfee name হামারা
চাট্গাঁও মেরা আছে বিলাট—
Rom-ti-tom-ti-tom & c.

¶ "মাইকেল মধুসূদনেব শর্মিষ্ঠা[১১০], কৃষ্ণকুমারী[১১১] ও বুড় শালিকের ঘাড়ে

বৌ[১১২], একেই কি বলে সভ্যতা[১১৩], ৺উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী[১১৪], সুরেন্দ্র বিনোদিনী[১১৫], ৺মনোমোহন বসুর প্রণয় পরীক্ষা[১১৬] ও জেনানা যুদ্ধ বলে আর একখানি প্রহসন।" পৃ ৯০

১১০-১১৩. যথাক্রমে ১৮৫৯, ১৮৬১, ১৮৬০ ও ১৮৬০-এ প্রকাশিত।

১১৪, ১১৫. দুখানি নাটক 'দুর্গাদাস দাস' ছদ্মনামে যথাক্রমে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫-এ প্রকাশিত।

১১৬. 'প্রণয় পরীক্ষা নাটক' ১৮৬৯-এ প্রকাশিত হয়।

¶ "আমার থিয়েটারে প্রবেশ করবার কতদিন পরে ঠিক মনে নেই, আমাদের থিয়েটার পশ্চিমে অভিনয় করতে বেরুল।"[১১৭] পৃ ৯০

১১৭. ১৮৭৫, মার্চের শেষে।

¶ "কল্‌কাতার নামজাদা ন্যাশনাল থিয়েটার[১১৮] অভিনয় করতে এসেছে··" পৃ ৯৭

১১৮. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

¶ "ডিরেক্টারদের মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী[১১৯] ·ভূষণবাবু[১২০]। পৃ ১০২

১১৯ ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য—বেদজ্ঞ পণ্ডিত। নবদ্বীপ হরিসভা থেকে 'আর্য্যবিদ্যাসুধানিধিঃ' (১২৮৫) মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১২০. চন্দ্রভূষণ চৌধুরী, প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর পিতা ও তদানীন্তন বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টার।

¶ "কলকাতা থেকে ছেড়ে · ছোটবাবু (স্বর্গীয় চারুবাবু)[১২১]·· ।" পৃ ১০২

১২১ চারুচন্দ্র ছিলেন বড়। কনিষ্ঠ শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন 'ছোটবাবু'।

¶ "বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী এই বেঙ্গল থিয়েটারেই প্রথম খোলা হয়[১২২]।" পৃ ১০৪

১২২ 'মৃণালিনী' প্রথম অভিনয় করে ন্যাশনাল থিয়েটার। জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়িতে ১৮৭৪, ১৩ ফেব্রুয়ারি এই অভিনয় হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় ১৮৭৭-এ বেঙ্গল থিয়েটারে 'মৃণালিনী'র অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। 'দুর্গেশনন্দিনী' অবশ্য বেঙ্গলেই প্রথম অভিনীত হয়েছিল, তারিখ—১৮৭৩, ২০শে ডিসেম্বর।

¶ "এখনও আমি প্রায়ই থিয়েটার দেখতে যাই[১২৩],·· " পৃ ১০৫

১২৩. বাংলা ১৩৩১-এ বিনোদিনীর এই স্মৃতিকথা 'রূপ ও রঙ্গ'-তে প্রকাশিত হয়। সেই সময় ষ্টারে তিনি নিয়মিত অভিনয় দেখতেন। পরবর্তীকালের

কৃতী নট শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী তখন ষ্টার থিয়েটারে সন্থ যোগ দিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় বিনোদিনীর শেষ জীবনের অভিনয় দেখাব একটি সুন্দর ছবি আছে। কৌতূহলী পাঠকের জন্য সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। শ্রীচৌধুরী লিখেছেন: "বিনোদিনী তখন প্রায়ই থিয়েটার দেখতে আসতেন। যথেষ্ট বৃদ্ধা হয়েছেন (তখন ওঁব বয়স ৬২ – শি. ব), কিন্তু থিয়েটাব দেখবার আগ্রহটা যায় নি। নতুন বই হলে ত উনি আসতেনই, এক কর্ণার্জুন (ষ্টাবে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডেব প্রযোজনায় ১৯২৩, ৩০ জুন, বাংলা ১৩৩০ প্রথম অভিনীত হয় – শি. ব) যে কতবাব দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। মুখে-হাতে তখন তাঁব শ্বেতী বেবিযেছে, একটা চাদর গায়ে দিযে আসতেন। এসে উইঙ্গসের ধারে বসে পড়তেন। অমনি, আমাদেব মেয়েবা, যে যেখানে থাকতো সবাই আসতো ছুটে, একটা মোড়া এনে পেতে দিতো, আব 'দিদিমা' বলে ওঁকে একেবাবে ঘিরে ধরত। কথা বলতেন খুব কম। থিয়েটারের সবাই খুব সম্ভ্রম করতেন ওঁকে।··· বাড়িতে ওঁব নাতি-নাতনী, শুনেছি, বাড়িতে পূজো-অর্চনা লেগেই আছে, তবু থিয়েটার দেখতে ওঁব ঠিক আসা চাই।" (নিজেবে হাবাযে খুঁজি – ১ম পর্ব, ১৮৮৪ শকাব্দ)।

¶ "সে সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতিবিন্দ্র ঠাকুর[১২৪] মহাশয়ের অশ্রুমতী[১২৫] ও সরোজিনী[১২৬] নাটকের অভিনয় হ'য়েছিল।" পৃ ১০৫

১২৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫): নাট্যকার. সঙ্গীতজ্ঞ, সম্পাদক ও স্বরবিজ্ঞান (phonology) এবং করোটীবিজ্ঞান (phrenology) বিশেষজ্ঞ। প্রথম নাটক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ !' (প্রহসন) ১৮৭২-এ প্রকাশিত হয়। এঁব রচিত 'পুরুবিক্রম নাটক' (১৮৭৪) ও 'সরোজিনী বা চিতোব আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫) সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ থেকে দর্শকদের মনে জাতীযতাব বীজ বপন করে। জ্যোতিবিন্দ্রনাথের মধ্যে অভিনয়-প্রতিভাও ছিল। ১৯ শতকের নবম দশকে কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়েব উদ্যোগে 'ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ' নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয তিনি ছিলেন তার সম্পাদক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব 'অশ্রুমতী নাটক' (১৮৭৯) ও 'অলীকবাবু' (১৯০০) এখানে অভিনীত হয়। তিনি বহু সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদও করেন। তাদের মধ্যে রত্নাবলী নাটক (১৯০০), মৃচ্ছকটিক (১৯০১), মুদ্রা-রাক্ষস (১৯০১), বিক্রমোর্ব্বশী (১৯০১), মালবিকাগ্নিমিত্র (১৯০১) উল্লেখযোগ্য।

১২৫. ১৮৮০-র সেপ্টেম্বরে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।

১২৬. ১৮৭৫, ২৬ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয় হয়

¶ "এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই

'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'[১২৭]...

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে,..." পৃ ১০৬

১২৭. গানটি রবীন্দ্রনাথের ১৩ বৎসব বয়সের লেখা।

সংযোজন

অভিনেত্রী এলোকেশীর (দ্র. পৃ ২১) মৃত্যু হয ১৩০৪ সালে। তথ্যটি মিনার্ভা থিয়েটাবেব একটি পুবনো হ্যাণ্ডবিলে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ থেকে জানা যায়:

"নাট্য-জগতের শোক-সংবাদ।

১লা কার্ত্তিক ববিবার বেলা ১০টাব সময় রঙ্গালয়ের প্রথম প্রবর্ত্তিত সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী এলোকেশী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে।

দেশীয় রঙ্গভূমিতে যখন অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হয়, তখন বঙ্গ রঙ্গভূমে চারিটি অভিনেত্রী ভর্ত্তি হন। ইনি সর্ব্বপ্রথমেই কার্য্য আবস্ত করেন, সর্ব্বপ্রথমেই কায্য শেষ করিলেন। বর্ত্তমানে ইনি ষ্টার রঙ্গালয়ে ছিলেন।"—'পুরোহিত ও অনুশীলন' (সম্পাঃ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি), ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩০৫।

গ্রন্থপঞ্জি

[স্থান-কাল-পাত্র সংকলনে নিম্নলিখিত রচনাসমূহের সহায়তা নেওয়া হয়েছে]

অথ নটঘটিত : সূত্রধার, ১৩৬৭

গিরিশচন্দ্র : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৩৪

গিরিশ-প্রতিভা : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৩৩৫

জীবনী-অভিধান : সুধীরচন্দ্র সরকার-সংকলিত, ১৩৭৭

দেশ (পত্রিকা), ৬ আষাঢ়, ১৩৭৬

নিজেরে হারায়ে খুঁজি (প্রথম পর্ব) : অহীন্দ্র চৌধুরী, ১৮৮৪ শকাব্দ

পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত (বিশু মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত), ১৩৭৩

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, ১৩৬৮

বাংলা থিয়েটারে অভিনয় · শংকর ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা, ১৩৭৩

ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (দুই খণ্ড) : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৪৫, ১৯৪৭

মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ ও আষাঢ় ১৩৩৬

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ২য় সং, ১৩৭২

রঙ্গনটী বিনোদিনী দাসী : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র), ১৩৭৪

রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ · রমাপতি দত্ত, ১৩৪৮

রূপমঞ্চ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীম কথিত

সমাচারচন্দ্রিকা, এপ্রিল ১৮৭৭ – ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯

সাধারণী (পত্রিকা), ১৮৭৭-১৮৮৪

সাজঘর : ইন্দ্রমিত্র, ২য় সং, ১৩৭১

সাহিত্যসাধক চরিতমালা : ষষ্ঠ ও অষ্টম খণ্ড

The Indian Stage . Hemendranath Dasgupta, vols. I-III, 1938-1944

—

বিষয়-সূচি

[পৃষ্ঠা ক থেকে পৃষ্ঠা ১৫০ পর্যন্ত]

অ

'অধীনার নিবেদন' (ভূমিকা) ছ, ১৪০

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ১৫, ১৮, ১৯, ৮৭-৮৯, ৯১-৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১৫০

'অনুতাপ' (কবিতা) ১১৬

অবিনাশচন্দ্র কর ১৫, ১৭, ৯৫, ৯৮, ৯৯

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় জ, ৭০

'অভিনেত্রীর আত্মকথা' ১৩৭

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৭

'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৪৪

অমৃতলাল বসু (ভুনীবাবু) ২২, ২৬, ২৮, ৩২, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৫৪, ৭১, ৯০, ১৪০

অমৃতলাল মিত্র ২৮, ৩৪, ৪২, ৪৩, ৫৪

'অশ্রুমতী' ১০৫

আ

'আগমনী' ২৭

আদর্শ সতী' ৮৭

'আনন্দ রহো' ২৭

'আনন্দ লীলা' ৮৭

'আবার চাঁদ' (কবিতা) ১২৬

'আমার অভিনেত্রী জীবন' (স্মৃতিকথা) ৭৯

'আর একবার' (কবিতা) ১২৪

ই

'ইংলিশম্যান' (পত্রিকা) ২২

উ

উপেন্দ্রনাথ দাস ৯০

উপেন্দ্র মিত্র ৭১, ১০৭

উমিচাঁদ ২২, ২৩, ১০২-১০৪

এ

'একটি গোলাপ' (কবিতা) ১১২

'একেই কি বলে সভ্যতা' ৯০

এলেণ্টারি ৩১

এলোকেশী ২১, ৮২, ১০২, ১০৪

Edwin Arnold ১৪৬

ও

ওফেলিয়া ৩১

'ওরে আমার খুকি মানিক' (কবিতা ১২৮

ক

'কনক ও নলিনী' (কাব্যোপন্যাস ১১০, ১৩২

'কনক কানন' ৮৭

'কপালকুণ্ডলা' ২৫, ১০৫, ১৪৭

কার্তিক পাল (ড্রেসার) ৮৪, ৯৯
কাদম্বিনী ১৬, ১৮, ২৮, ৪২, ৮১, ৮৭, ৯০, ৯৫, ৯৮
'কামিনীকুঞ্জ' ৮৭, ৯৭
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ৭১
'কি কথাটি তার' (কবিতা) ১২০
'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ৮৭
'কি যেন' (কবিতা) ১১৫
কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ', ১০৫
কুমার বাহাদুর ১০২
'কৃষ্ণকুমারী' ৯০
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
কেদারনাথ চৌধুরী ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ১৪৮
'কেন যে এমন হ'ল' (কবিতা) ১১৯
'কে বা গায়' (কবিতা) ১২৫
'কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়' (ভূমিকা) ১৩৭
'কোথা গেলি' (কবিতা) ১২৯

গ

গঙ্গামণি ১০, ১১, ৮০
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছ, ভ, ২৫-৩৭, ৩৯-৪৫, ৫১, ৫৪, ৭০, ৭২, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১৩৭, ১৪০
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ল্যাদাড়ু) ৮২, ১০২, ১০৫
গুর্মুখ রায় ৩৫-৪০, ৪৩, ৫৫
গোপাল বাবু ১৫
গোলাপ (সুকুমারী দত্ত) ২১, ২২, ২৪, ৮২, ১০২, ১০৪, ১০৫
গ্যারিক জ, ৪২
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৭, ২০, ২১, ৮১-৮৩, ৯৭, ১০১, ১০৭, ১৪৮

চ

চারুচন্দ্র ঘোষ ২৩, ২৫, ৮১, ১০১, ১০২
'চৈতন্যলীলা' ২, ৪৪-৪৭, ৪৮, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ১৪৬
'চৈতন্যলীলা' (২য় ভাগ) ৪৮
'চোরের উপর বাটপাড়ি' ৮৭, ১৪৭

জ

জগত্তারিণী ৮২
জহরলাল ধর ৪০, ১০৮
'জামাই বারিক' ৯০
'জেনানা যুদ্ধ' ৯০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৫

ট

টমসন (ছোটলাট) ১২
Travels in the East ১৪৬

ড

ডিকেন্স ১৪১

দ

'দক্ষযজ্ঞ' ৪২, ১৪৪
দাসুচরণ নিয়োগী ৪০, ৪১, ৪২
দীনবন্ধু মিত্র ৮৭, ৯০

'দুর্গেশনন্দিনী' ২১, ২৬, ২৮, ১০৪
দেবেনবাবু (ব্রজেন্দ্রকুমার রায়) ৮৬
'দোললীলা' ২৭

ধ

ধর্মদাস সুর ১৫, ১৭, ১৮, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৯৩-৯৫, ৯৯, ১০০, ১০৭
'ধ্রুবচরিত্র' ৪৪

ন

'নবীন তপস্বিনী' ১৮, ৮৭
নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) ৪৭
'নলদময়ন্তী' ৪৪, ৫৪, ১০৭, ১৩৭
'নাট্যমন্দির' (পত্রিকা) ১৩৭, ১৩৯
নারায়ণী ১২, ৮১, ৮৭, ৯৫, ৯৮
'নীলদর্পণ' ১৭, ৯০, ৯৮
নীলমাধব চক্রবর্তী ২০, ৮৭, ৯৩, ৯৮, ১০০
ন্যাশনাল থিয়েটার ১১, ১২, ১৫, ২৭, ৮১, ১০০, ১৪৪

প

'পলাশীর যুদ্ধ' ২৭, ২৮, ১৪৪
'প্রণয় পরীক্ষা' ৯০
প্রতাপচাঁদ জহুরী ২৭, ২৮, ৩২-৩৫, ৩৯, ৪০, ১৪৯
'প্রকৃত বন্ধু' ৮৫
'প্রহ্লাদ চরিত্র' ৪৪
পিক্‌মেলিয়নের গেলেটিয়া গ
'পিপাসা' (কবিতা) ১১৩
পুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১, ১২, ৮০, ৮১
পোপ ২৯
প্রাণনাথ চৌধুরী ২৯
প্রিয় মিত্র ৩৯

ব

বনবিহারিণী (ভুনি) ২১-২৩, ৫৪, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫
বনমালী চক্রবর্তী ৪০
বলরাম বসু ১৪৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায গ, ২১, ২২, ৩১, ৩২, ৫২, ১০৪, ১৪৮
'বঙ্গরঙ্গালযে শ্রীমতী বিনোদিনী' (ভূমিকা) ১৪০
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ ৯৯
'বারাঙ্গনা' (কবিতা) ৩৭
'বাসনা' (কাব্য) ১১০
বায়রন ২৯
'বি' থিয়েটাব ৪১
বিনোদিনীর মা ৭-১০, ১৫, ১৮-১৯, ২৪, ৩২, ৪৩-৪৪, ৫৬, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১১০, ১৪৯
'বিবাহ বিভ্রাট' ১২, ৪৮, ১৪৭
'বিল্বমঙ্গল' ১৩৭
'বিষবৃক্ষ' ২৮, ৫১
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায ৮২, ১০২, ১০৪, ১০৫
'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ১৮
'বুদ্ধদেব চরিত' ১৩৭, ১৪৩, ১৪৫-১৪৬
'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ৯০, ১৪৭

'বেণীসংহার' (শত্রুসংহার) ১৫, ৮২, ৮৫
বেঙ্গল থিয়েটার ১২, ২০-২৬, ২৭, ৪০, ৮১-৮৩, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯
বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) ১৫, ৮৭, ৮৯
ব্যাণ্ডম্যান ৩১
ব্রজনাথ শেঠ ১১, ৮০, ৮১
ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ১০২

ভ
'ভারতবাসী' (পত্রিকা) ১৩৮
ভুবনমোহন নিয়োগী ১১, ৮০, ৮৩, ১৪৮
ভূষণবাবু ১০২
ভোলানাথ ৯৮

ম
মতিলাল সুর ১৭, ৯৮
মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় ৮২, ১০২
মথুরানাথ পদরত্ন ৪৬
মদনমোহন বর্মণ ১৬, ১৪৮
মধুসূদন দত্ত ২১, ২৬, ৯০, ১০৪
মনোমোহন বসু ৯০
মহেন্দ্রলাল বসু ১৫, ৮৭, ৯৮
'মায়াতরু' ২৭
মিনার্ভা থিয়েটার ৮২
মিলটন ২৯
'মুস্তফী সাহেব কা পাক্কা তামাসা' ৮৮
'মৃণালিনী' ২১, ২২, ২৭, ২৮, ৩১, ৫১, ১০৪, ১০৫, ১৪৭-১৪৮
'মেঘনাদ বধ' (নাট্যরূপ) ২১, ২৭, ২৮, ১০৪, ১৪৪
'মোহিনী প্রতিমা' ২৭

য
যাদুমণি ৮১

র
'রজনী' ৩১
রাজকুমারী (রাজা) ১২, ১৪, ৮১
রাধাগোবিন্দ কর (ডাঃ আর. জি. কর) ১৫, ২০, ৮৫
রাধামাধব কর ১৫, ৮৫-৮৬
'রাবণ বধ' ২৭
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৪৭, ১৪১, ১৪২, ১৪৬
'রিজ অ্যাণ্ড রায়ত' (পত্রিকা) ২৭, ৫২
'রূপ ও রঙ্গ' (পত্রিকা) ৭৯

ল
লক্ষ্মীমণি ১২, ৮১, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৮
লাফোঁ (ফাদার) ৪৬
'লীলাবতী' ৮৭, ৯৭
লুইস থিয়েটার ৮৩
Light of Asia ১৪৬

শ
'শকুন্তলা' (কবিতা) ১৩০
শকুন্তলা দাসী (কন্যা) ৬৫, ১১০, ১৩২, ১৪৯

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৭, ৫২
শরৎচন্দ্র ঘোষ (ছোটবাবু) ১২, ২০-২৬, ৮১, ১০১-১০৩, ১০৪, ১০৫, ১৪৯
'শরৎ-সরোজিনী' ৯০
'শর্মিষ্ঠা' ৯০
'শিখাও আমায়' (কবিতা) ১১৮
শিবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৯
শিশিরকুমার ঘোষ ৪৪
শ্যাম ৮২
'শ্রীবৎস চিন্তা' ৪৪

ষ

'ষ্টেটস্‌ম্যান' (পত্রিকা) ২২
ষ্টার থিয়েটার ১০, ২৮, ৩২-৩৫, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৬৫-৬৬, ১০৭, ১৩৭, ১৪০

স

'সতী কি কলঙ্কিনী ?' ১৮, ৮৭, ৯৪, ৯৭, ১৪৮
সত্যব্রত সামাশ্রমী ১০২
'সধবার একাদশী' ১৮, ২৮, ৫১, ৮৭, ১৪৭
'সরোজিনী' ৫০, ১০৫-১০৬
সাইনোরা ২২, ৯৩
সাতুবাবু (আশুতোষ দেব) ১০১
'সাধনা' (কবিতা) ১১০
সাধারণী' (পত্রিকা) ১৪৪
'সারাদিন' (কবিতা) ১১৪
সিডনিস ৩০
'সীতার বনবাস' ২৮
'সীতার বিবাহ' ১১, ৮০
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৭
'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ৯০
সেক্সপীয়ার ২৯
'সোহাগ' (কবিতা) ১১১
'স্বপ্নে আশা' (কবিতা) ১২৭
'স্মৃতি' (কবিতা) ১১১

হ

হরলাল রায় ১৬, ৮৫
হরিধন দত্ত ৭৩
হরিপ্রসাদ বসু ৪০, ৪৩
হরি বৈষ্ণব (হরিদাস দাস) ২২, ৮১, ১০২, ১০৪, ১০৫
'হামীর' ২৭
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
হালদার মহাশয় ১০২
'হীরার ফুল' ১৪৭
'হেমলতা' ১৬, ৮৫
'হৃদয়রত্ন' (কবিতা) ১২৩
'হ্যামলেট' ৩১

ক্ষ

ক্ষেত্রমণি ১২, ৮১, ৮৭-৮৯, ৯৫-৯৬, ৯৮